

# হিন্দুধর্ম ও নেতৃত্বক শিক্ষা

## নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকবূপে নির্ধারিত

---

# হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

## নবম-দশম শ্রেণি

### রচনা

অফিসের ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল  
অফিসের ড. দুলাল কাণ্ডি ভৌমিক  
বিজু দাশ  
ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার  
ড. শিশির মলিক  
শিখা দাস

### সম্পাদনা

অফিসের নিরাঙ্গন অধিকারী

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২  
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪  
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৭

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

## প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্ভুক্ত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্প্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামূল্ক করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির হিন্দু ধর্ম পাঠ্যপুস্তকটির নামকরণ করা হয়েছে “হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা”। এ পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু ধর্মের তাত্ত্বিক বিষয় ও বিধান সমূহ এবং এ ধর্মের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবন ও কর্মে প্রতিফলিত করার প্রতি বিশেষভাবে শুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া হিন্দু ধর্মের বিধানসমূহ, হিন্দু ধর্মসংস্কৃত সমূহে বর্ণিত কিছু জীবনাদর্শ, উপাখ্যান, অবতার, মহাপুরুষ মহীয়সী নারীদের জীবনচরিত ও বাণী সম্পর্কে এ বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায় এ সকল বিষয় শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিক শুগাবলি যেমন-সততা, উদারতা, কর্তব্যনির্ণয়, সৎ সাহস, সংযম, সহনশীলতা, নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ, অসাম্প্রদায়িকতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, সাম্য ও ভাস্তৃত্যবোধ জাগ্রত করবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদান প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

## সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	স্নাত্তা ও সৃষ্টি	
	প্রথম পরিচেদ : স্নাত্তার স্বরূপ ও উপাসনা	১-১১
	দ্বিতীয় পরিচেদ : স্নাত্তা, সৃষ্টি ও সেবা	১২-১৬
দ্বিতীয়	হিন্দুধর্মের বিশ্বাস, উৎপত্তি ও বিকাশ	
	প্রথম পরিচেদ : হিন্দুধর্মের বিশ্বাস	১৭-২৯
	দ্বিতীয় পরিচেদ : হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৩০-৩৭
তৃতীয়	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান	৩৮-৪৪
চতুর্থ	হিন্দুধর্মে সংক্ষার	৪৫-৫৩
পঞ্চম	দেব-দেবী ও পূজা	৫৪-৬৭
ষষ্ঠি	যোগসাধনা	৬৮-৭৮
সপ্তম	ধর্মগ্রন্থে নৈতিক শিক্ষা	৭৯-৮৭
অষ্টম	ধর্মীয় উপাখ্যান ও নৈতিক শিক্ষা	৮৮-৯৩
নবম	ধর্মপথ ও আদর্শ জীবন	৯৪-১০৬
দশম	অবতার ও আদর্শ জীবনচরিত	১০৭-১৩২

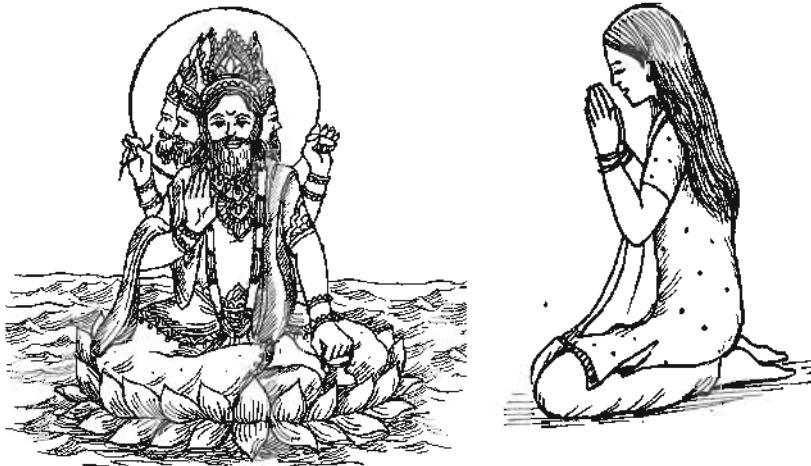
## প্রথম অধ্যায়

### স্তো ও সৃষ্টি

#### প্রথম পরিচ্ছেদ : স্তোর স্বরূপ ও উপাসনা

যিনি পরমপিতা, নিজেই নিজের স্তো, সর্বশক্তির উৎস যিনি, যাঁর উপরে কেউ নেই, তিনি পরম স্তো-বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, বিশ্বনিয়ন্তা । সনাতন ধর্ম তথা হিন্দুধর্মের চেতনায় তাঁকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে । তাঁকে নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে । তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আত্মা, ঈশ্বর, ভগবান ।

৩



স্তোকে উপাসনার মাধ্যমে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি ও সামুদ্ধিক লাভ করতে পারি । আমাদের সকল কাজে গভীর শুদ্ধার সাথে স্তোকে স্মরণ এবং তাঁর উপাসনা করা উচিত । এ অধ্যায়ে আমরা স্তোর স্বরূপ, সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় স্তোর ভূমিকা, ঈশ্বরের শুণ ও শক্তিরপে দেব-দেবীর পরিচয়, ঈশ্বর উপাসনার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা এবং ঈশ্বর উপাসনার একটি মন্ত্র বা শ্লোক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব ।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- নিরাকার ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান, আত্মা ও অবতারনামে স্তোর স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব
- স্তোর সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক ও সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় স্তোর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব
- দেব-দেবী ঈশ্বরের বিভিন্ন শুণ ও শক্তির প্রকাশ- এ ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বর উপাসনার ধারণা, ধরন (নিরাকার ও সাকার) ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বর ও দেব-দেবীর প্রতি প্রার্থনার একটি মন্ত্র বা শ্লোক আবৃত্তি করতে পারব এবং এর অর্থ ও শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বর ও দেব-দেবীর প্রতি প্রার্থনার একটি মন্ত্র বা শ্লোক আবৃত্তি করতে পারব এবং অর্থ বলতে ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বরের প্রতি অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করতে পারব এবং ঈশ্বরের উপাসনায় উদ্বৃদ্ধ হব
- ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপাসনা ও প্রার্থনা মন্ত্র অনুশীলন করতে পারব ।

## পাঠ ১ ও ২ : স্তোর স্বরূপ—ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও অবতার

সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্ম অনুসারে স্তোরকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও অবতার নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর স্বরূপ বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ রেখে তাঁর এসকল নাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

### ১.১. ব্রহ্ম ও ঈশ্বর

#### ব্রহ্মরূপে স্তোর স্বরূপ

ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সর্ববৃহৎ, ‘বৃহত্ত্বাত্ম ব্রহ্ম’। যাঁর থেকে বড় কেউ নেই, যিনি সকল কিছুর স্তোর এবং যাঁর মধ্যে সকল কিছুর অবস্থান ও বিলয় তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শুধু প্রকৃতি ও মহাবিশ্বকেই সৃষ্টি করেননি, বরং তিনি প্রকৃতি ও মহাবিশ্বকে তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির মাধ্যমে রক্ষাও করে থাকেন। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ব্রহ্ম নিয়ত, শুন্দ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ, জ্যোতির্ময়, নিরাকার, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী বলে তাঁকে কেউ দেখতে পায় না। আমরা জানি, ব্রহ্মকে পরমাত্মাও বলা হয়। তিনি যখন জীবের মধ্যে আজ্ঞারপে অবস্থান করেন, তখন তাঁকে জীবাত্মা বলে। আজ্ঞা যখন নিজের মধ্যে অবস্থান করে তখন তাকে পরমাত্মা বলা হয়।



ব্রহ্ম নিরাকার ও নির্গুণ এবং তিনি নিশ্চল অবস্থায় অবস্থান করেন। ব্রহ্ম বা পরমাত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। তিনি অজ, অনাদি, অনন্ত এবং শাশ্঵ত। ব্রহ্মকে ‘শুঙ্কার’ বলা হয়। শুঙ্কার সংক্ষেপে ওঁ। এর পূর্ণরূপ অ-উ-ঘ। এর অর্থ হচ্ছে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারী ব্রহ্ম।

#### ঈশ্বররূপে স্তোর স্বরূপ

ব্রহ্ম যখন জীব ও জগতের উপর প্রভৃতি করেন, তখন তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়। ঈশ্বরকে পরমেশ্বর নামেও ডাকা হয়। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। ঈশ্বরের রূপের শেষ নেই। তিনি অনন্তরূপী। জ্ঞানীর কাছে তিনি ব্রহ্ম, যৌগীর কাছে তিনি পরমাত্মা এবং ভক্তের কাছে ভগবান।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি শ্লোকে ঈশ্বর সম্পর্কে বলা হয়েছে—

তুমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-  
স্মস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।  
বেভাসি বেদ্যঃ পরঞ্চ ধাম  
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরপ । (১১/৩৮)

অর্থাৎ ‘তুমি আদিদেব, তুমি অনাদি পুরুষ, তুমি বিশ্বের পরম আশ্রয় স্বরূপ, তুমি একমাত্র জ্ঞাতব্য এবং জ্ঞাতা। তুমি একমাত্র পরম স্থান। হে অনন্তরূপ, তুমি বিশ্বব্রহ্মাঙ্গে প্রসারিত’ একমাত্র প্রভু। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই শ্লোক থেকে সহজেই ঈশ্বরের মহিমা ও শক্তি প্রতীয়মান হয়। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ঈশ্বর অনন্ত অসীম, তাঁর কোনো পরিবর্তন নেই। তিনি শাশ্঵ত। তিনি জগতের আদি কারণ, তিনি বিধাতা। তাঁর কোনো স্তোর নেই। তিনি স্বয়ম্ভু অর্থাৎ নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছেন। তিনি নিয়ত, শুন্দ ও পরম পরিব্রত। তিনি সকল

কর্মের ফলদাতা। যে যেরকম কর্ম করে, তিনি তাকে সেরকম ফল দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর নিরাকার। প্রয়োজনে তিনি সাকার হতে পারেন। কারণ অনন্ত তাঁর শক্তি। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজ করেন। খগ্বেদ অনুসারে তিনি পরম পুরুষ, তাঁর সহস্র মন্ত্র, সহস্র চক্র, সহস্র চরণ। এ কথার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতাই বোঝানো হয়েছে। তিনি অদ্বীতীয়। তিনি জ্যোতিঃস্তুরূপ, তিনি সকলের মধ্যে বিরাজ করেন।

## ১.২. শ্রষ্টার স্বরূপ : ভগবান ও অবতার

### ভগবানরূপে শ্রষ্টার স্বরূপ

হিন্দুধর্ম দর্শন অনুসারে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভগ বলে। ভগ যাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে আছে তিনিই ভগবান। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে— যিনি ভূতগণের উৎপত্তি, বিনাশ, পরলোকে গতি, ইহলোকে আগমন এবং বিদ্যা-অবিদ্যা জানেন, তিনিই ভগবান। ঈশ্বরকে যখন এই ছয়টি গুণের অধীশ্বররূপে কঞ্জনা ও আরাধনা করা হয় তখন ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয় (শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, ৬। ৫। ৭৯)। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ভগবান গুণময় এবং অশেষরূপের আধাৰ। তিনি রসময়, আনন্দময় ও দয়াময়। তিনি তাঁর ভক্তদের বিভিন্নভাবে কৃপা করে থাকেন। ভগবানের মধ্যে ভক্ত তাঁর অভীষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারেন। ভগবান যে-কোনো রূপ ধারণ করে ভক্তকে দেখা দেন, লীলা করেন। তিনি প্রয়োজনে জীবের ন্যায় দেহধারী হয়ে তপস্যা, ধ্যান, প্রার্থনা ও সকল সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। আবার ঈশ্বরাবেশে অপ্রাকৃত লীলা, দাবানল পান, একহাতে গোবর্ধন পর্বত ধারণ, পাষণ্ড-দলন এবং কঠোর তপস্যা করে সকলকে মুক্ত করেন এবং সকলের মঙ্গল করেন। সামান্য দেহধারী হয়ে ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে ভগবান তাঁর কাছে আসেন। প্রয়োজনে ভক্তের বোঝা তিনি বহন করেন। মোট কথা ঈশ্বর যখন জীবকে দয়া করেন তখন তাঁকে বলা হয় ভগবান।

### অবতাররূপে শ্রষ্টার স্বরূপ

হিন্দুধর্মে অবতার বলতে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে স্বেচ্ছায় নিরাকার ঈশ্বরের জীব বা সাকার রূপে পৃথিবীতে অবিরুত্ত হওয়াকে বোঝানো হয়। এই সকল অবতার সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও অতিলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। অবতার শব্দটি তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জীবরূপে মর্ত্যে ঈশ্বরের অবতরণ।

দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার জন্য ঈশ্বর নানারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন বা নেমে আসেন। যেমন নৃসিংহ, রাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ঈশ্বরের অবতার। ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে পরম সন্তা বা পরমেশ্বর থেকে উত্তৃত সকল অবতারই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, ভগবান বিষ্ণু অনেকবার অবতার হিসেবে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছেন। বিভিন্ন যুগে ভগবান বিষ্ণু নয়বার অবতার হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন। কলিযুগের শেষে তিনি কক্ষিক্রপে দশম অবতার হিসেবে অবতীর্ণ হবেন।

বিষ্ণুর দশ অবতার হচ্ছে -

১. মৎস্য
২. কূর্ম
৩. বরাহ
৪. নৃসিংহ
৫. বামন
৬. পরশুরাম
৭. রাম
৮. বলরাম
৯. বৃদ্ধ
১০. কঙ্কি

কঙ্কি সর্বশেষ অবতার। হিন্দুধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী কলিযুগের শেষের দিকে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে।

স্রষ্টার স্বরূপ সম্পর্কে সবশেষে আমরা বলতে পারি; ব্রহ্মরূপে স্রষ্টা নিরাকার, নির্গুণ। ব্রহ্ম যখন জীব ও জগতের ওপর প্রভুত্ব করেন, তখন তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বর নিরাকার, তবে প্রয়োজনে সাকার রূপ ধারণ করতে পারেন। ঈশ্বর যখন ভক্তের ডাকে সাড়া দেন, তাঁর কাছে আসেন, নানা রকম লীলা করেন, তখন তাঁকে বলা হয় ভগবান। আবার মঙ্গলকর কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বর যখন জীবরূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতরণ করেন তখন তাঁকে বলে অবতার। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও অবতার আলাদা নয়, এ হচ্ছে একই সর্বশক্তিমান স্রষ্টা বা ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ।



### **ପାଠ ୩ : ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟେ ଶୃଜଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟ ସ୍ରଷ୍ଟାର**

#### **ଭୂମିକା**

ସ୍ରଷ୍ଟାକେ ଆମରା ବ୍ରକ୍ଷ, ଈଶ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱର, ଆଆ, ପରମାଆ, ଭଗବାନ ପ୍ରଭୃତି ନାମେ ଡାକି । ତିନି ମହାବିଶ୍ୱେର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅପ୍ରାଣୀ ସବକିଛୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏ ମହାବିଶ୍ୱେ ଯା କିଛୁ ଆହେ ସବକିଛୁଇ ସ୍ରଷ୍ଟାର ସୃଷ୍ଟି । ତିନି ତା'ର ସୃଷ୍ଟିକେ ଭାଲୋବାସେନ, ପ୍ରତିପାଳନ କରେନ, ବିପଦ-ଆପଦେ ରଙ୍ଗା କରେନ, ପ୍ରଯୋଜନେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଧ୍ୱଂସ କରେନ, ଦୁଟୀର ହାତ ଥେକେ ସୃଷ୍ଟିକେ ରଙ୍ଗା କରେନ । ତିନି ତା'ର ସୃଷ୍ଟିକେ ସଂଗ୍ରଥେ ଚଲତେ ସହାୟତା କରେନ । ଯାରୀ ସଂଗ୍ରଥେ ଚଲେନ ଈଶ୍ୱର ତାଁଦେର ଭାଲୋବାସେନ । ତାଁଦେର ଉତ୍ସତିର ପଥ ଦେଖାନ ଏବଂ ସର୍ବଦା ତାଁଦେର ମାବେ ବିରାଜ କରେନ । ଅସଂ ବ୍ୟକ୍ତିଦେର ଈଶ୍ୱର ପଛନ୍ଦ କରେନ ନା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦିଯେ ଥାକେନ । କିନ୍ତୁ ସଂ ବ୍ୟକ୍ତିଦେର ରଙ୍ଗା କରେନ । ତିନି ତା'ର ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟେଇ ଅବହୁନ କରେନ । ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବେର ମଧ୍ୟେ ଏକ ଈଶ୍ୱର ବହୁରୂପେ ବିରାଜ କରେନ । ଏ କାରଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ବିରାଜ କରଇଛେ । ସ୍ରଷ୍ଟା ହିସେବେ ଈଶ୍ୱର ଜୀବକୁଳେର ଉପର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରେନ । ଜୀବ, ବଞ୍ଚ - ସକଳ କିଛୁର ତିନିଇ ନିୟନ୍ତ୍ରକ । ସ୍ରଷ୍ଟା ଛାଡ଼ା ସୃଷ୍ଟିକେ ଯେମନ କଲ୍ପନା କରା ଯାଇ ନା, ତେମନି ସୃଷ୍ଟି ଛାଡ଼ା ସ୍ରଷ୍ଟାକେଓ ଭାବା ଯାଇ ନା । ନିଚେ ସୃଷ୍ଟିର ଶୃଜଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଭୂମିକା ବିଶେଷତାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହଲୋ ।

#### **୧. ଅଭିଭାବକ ହିସେବେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର ଭୂମିକା**

ସ୍ରଷ୍ଟା ଛାଡ଼ା କୋନୋ କିଛୁଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଯ ନା । ଏ ମହାବିଶ୍ୱେର ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରହ, ତାରା, ଜୀବ-ଜ୍ଞନ ସବକିଛୁର ଏକଜଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆହେନ । ତିନି ଈଶ୍ୱର । ତିନି ଅବିନଶ୍ୱର ଏବଂ ଅସୀମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ । ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହିସେବେ ତିନି ତା'ର ସୃଷ୍ଟିକେ ପରିଚାଳନା କରାହେନ ଏବଂ ରଙ୍ଗା କରାହେନ । ତିନି ତା'ର ସୃଷ୍ଟିର ଜନ୍ୟ ଜନ୍ୟ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ନିର୍ଧାରଣ କରାହେନ ।

ଭାଲୋ କାଜେର ଜନ୍ୟ ତିନି ତା'ର ଭକ୍ତଦେର ଭାଲୋ ଫଳ ଦିଯେ ଥାକେନ ଏବଂ ଧାରାପ କାଜେର ଜନ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେନ । ଆବାର ମହାକାଶେର ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଯେ କକ୍ଷ୍ୟୁତ ହଚେ ନା, ତାର ମୂଲେଓ ରଯେଛେ ଈଶ୍ୱରେର ଶୃଜଳା ବିଧାନେର ଶକ୍ତି । ଏ ସବ କିଛୁଇ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର ଆଦେଶେ ପରିଚାଳିତ ହଚେ । ଈଶ୍ୱର ବ୍ରକ୍ଷା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ ଏଇ ତ୍ୟାଗୀ ଶକ୍ତିରୂପେ ବିରାଜିତ । ବ୍ରକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟିର ଦେବତା, ବିଷ୍ଣୁ ରଙ୍ଗା ଓ ପ୍ରତିପାଳନକାରୀ ଦେବତା ଏବଂ ଶିବ ଧ୍ୱଂସେର ଦେବତା । ଏ ଥେକେ ବୋବା ଯାଇ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତା'ର ସୃଷ୍ଟିକେ ଶୃଜଳାବନ୍ଧ କରାର ଜନ୍ୟ ତା'ର ନିର୍ଧାରିତ ଭୂମିକା ପାଲନ କରାହେନ ।

#### **୨. ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହିସେବେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଭୂମିକା**

ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଏକଜଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ଏକଜଳ ଅସୀମ କ୍ଷମତାଧର ପରମପୁରୁଷ । ତା'ର ରଯେଛେ ଅସଂଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରକ, ଅନନ୍ତ ଚକ୍ର, ଅଗଣିତ ଚରଣ । ତିନି ସମ୍ପଦ ବିଶେ ସର୍ବଜୀବେ ପରିବ୍ୟାଙ୍ଗ । ଲକ୍ଷକୋଟି ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ ଏ ମହାକାଶେ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିପଥେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହଚେ । ଜୀବ ଓ ଜଡ଼ ବଞ୍ଚ ସବକିଛୁଇ ଏକଟି ଶୃଜଳାର ମଧ୍ୟେ ଆବନ୍ଦ । ପରମ କାରଣବାଦେର ଯୌକ୍ଷିକତା ଥେକେ ବିଚାର କରଲେ ଦେଖା ଯାଇ ଯେ ଏକ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବ୍ରକ୍ଷାଗୁରୁକେ ବିଶ୍ୱଵକର ଶୃଜଳାର ମାଧ୍ୟମେ ପରିଚାଳିତ କରାହେନ । କେନନା, ଏକାଧିକ ଈଶ୍ୱରେର ନିୟମ-କାନୁନଗୁଲୋ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହତୋ ଯା ସଂଘାତେର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତ । ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ଏ ମହାବିଶ୍ୱେ ଏକଜଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ହିସେବେ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ପାଲନ କରାହେନ ।

ଅନେକ ଧର୍ମଭାବିକେର ମତେ, ବିଶ୍ୱ କୋନୋ କାରଣେର ଫଳାଫଳ । ପୃଥିବୀ ମାଟି, ଜଳ, ଆଲୋ ବାତାସ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ଯା କୋନୋ ପରମ ଏକକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାରଣର ପକ୍ଷେ ତା କରା ଅସ୍ତ୍ରବ ।

### ୩. ଦୁଷ୍ଟେର ଦମନେ ଶ୍ରଷ୍ଟାର ଭୂମିକା

ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ପ୍ଲାନିଭର୍ତ୍ତବତି ଭାରତ ।

ଅଭ୍ୟାନମଧ୍ୟ ତଦାଆନଂ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍ ॥ (୪/୭)

ପବିତ୍ର ଗୀତାର ଏ ଶୋକ ଥେକେ ପ୍ରତୀଯମାନ ହୟ ଯେ ଯଥନ ଏ ବିଶେ ଧର୍ମ କମେ ଯାଇ, ଅଧର୍ମ ବେଡ଼େ ଯାଇ ତଥନଙ୍କ ଶ୍ରଷ୍ଟା ଜଗତେ ଅବତାରକାରୀଙ୍କେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହନ । ଏ ସମୟ ତିନି ଦୁଷ୍ଟେର ଶକ୍ତିହାତେ ଦମନ କରେନ ।

### ୪. ଶାସକ ହିସେବେ ଭୂମିକା

ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭାଲୋ କାଜେର ଫଳାଫଳ ଶୁଭ ଏବଂ ମନ୍ଦ କାଜେର ଫଳାଫଳ ଅଶୁଭ । ଭାଲୋ ଓ ଖାରାପ ଅବଚେତନଭାବେ ହୃଦୟେ ବିରାଜ କରେ । ଏହି ଚେତନା ପରିଚାଳନା କରାର ଜଣ୍ଯ ପ୍ରୟୋଜନ ଏକଜଳ ଶାସକେର । ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଜ୍ଞ । ତିନି ଭାଲୋ ମାନୁଷକେ ସ୍ଵର୍ଗୀ କରେନ, ଅପରାଧୀଦେର ଶାନ୍ତି ଦେନ ଏବଂ ସବକିଛୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେନ । ଅନ୍ତରକେ ପରିଚାଳିତ କରା, ନ୍ୟାୟ-ଅନ୍ୟାୟକେ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ କରା ଈଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୋନୋ ଶକ୍ତିର ପକ୍ଷେ ସତ୍ତ୍ଵବ ନନ୍ଦ ।

ଈଶ୍ୱର ସକଳେର ହୃଦୟେ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ, ସକଳକେ ପରିଚାଳନା କରେନ । ଈଶ୍ୱର ସକଳେର ପ୍ରଭୁ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ବିଶେର କାରଣ, ଶ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଧ୍ୱନ୍ସକାରୀ ।

### ୫. ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଭାଲୋ କାଜେର ଫଳଦାତା

ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅପ୍ରାଣୀ ଯେ କୋନୋ ବିଷୟ ବା ପଦାର୍ଥ ଯେ-ହାନ ଥେକେ ଜନ୍ମାନ୍ତ କରେ, ମୃତ୍ୟୁ ବା ଧ୍ୱନ୍ସର ମାଧ୍ୟମେ ଯାଇ କାହେ ଫିରେ ଯାଇ, ତିନିଇ ବ୍ରକ୍ଷ ବା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱର । ବେଦାନ୍ତର ଏହି ଉତ୍କି ଥେକେ ପ୍ରତୀଯମାନ ହୟ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଜୀବକୁଲେର ସୃଷ୍ଟି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଉଭୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ଯାତେ ଏ ଜଗତେର ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଏକଟା ନିୟମେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ ପରିଚାଳିତ ହୟ । ତିନି ସ୍ଵର୍ଗ ଓ ନରକ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ, ଯାତେ ମାନୁଷ ସଂ ପଥେ ଓ ସଂ କର୍ମେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ସ୍ଵର୍ଗଲାଭ କରତେ ପାରେ । ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଲେ ନରକେ ଯେତେ ହୟ ।

### ପାଠ ୪ : ଈଶ୍ୱରେର ଶୁଣ ଓ ଶକ୍ତି : ଦେବଦେବୀ

ଈଶ୍ୱର ଏ ମହାବିଶେର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଲନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଧ୍ୱନ୍ସକର୍ତ୍ତା । ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତିନଟି ପ୍ରଧାନ ତ୍ରିତ୍ୟା ସାଧନ କରେ ଥାକେନ, ତା ହଲୋ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ଲୟ । ତିନି ନିରାକାର, ଆବାର ପ୍ରୟୋଜନେ ସାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରେନ ।

ଦେବଦେବୀ ଈଶ୍ୱରେର ସାକାର ରୂପ । ଈଶ୍ୱର ନିଜେର କୋନୋ ଶୁଣ ବା କ୍ଷମତାକେ କୋନୋ ବିଶେଷ ଆକାର ବା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରେନ - ଯେମନ ବ୍ରକ୍ଷା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା, ସରସ୍ଵତୀ ଇତ୍ୟାଦି । ଏହା ସକଳେଇ ଈଶ୍ୱରେର ବିଶେଷ ଶୁଣ ବା କ୍ଷମତା ଧାରଣ କରେ ରହେନ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ବଲା ଯାଇ : ବ୍ରକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟିର ଦେବତା, ବିଷ୍ଣୁ ପାଲନକର୍ତ୍ତା, ସରସ୍ଵତୀ ବିଦ୍ୟାର ଦେଵୀ, ଶିବ ପ୍ରଳୟର ଦେବତା ଇତ୍ୟାଦି । ଆମରା ଈଶ୍ୱରେର ବିଭିନ୍ନ ଶୁଣ ଓ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନେର ଜଣ୍ଯ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରଭାବେ ଦେବଦେବୀର ପୂଜା କରି, ଭକ୍ତି କରି, ତାଁଦେର କାହେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ।



ଆଗେଇ ବଲା ହେବେ, ଈଶ୍ଵର ବା ଭଗବାନ ପ୍ରଥାନତ ଛୟଟି ଶୁଣେ ଶୁଣାଯିତ - ଐଶ୍ଵର, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ସଶ, ଶ୍ରୀ, ଜାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ।

ଦେବଦେବୀଗଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ଵର ନା ହଲେଓ ମହାନ ଈଶ୍ଵରେର ବିଭିନ୍ନ ଶୁଣେ ଶୁଣାଯିତ । କେନନା, ତୋରା ଈଶ୍ଵରେର ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶୁଣ ବା ଶକ୍ତି ଖାରଥ କରେ ଆଛେନ । ଏ କାରଣେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କପେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀକେ ପୂଜା କରା ହୁଏ । ପୂଜାର ମଧ୍ୟମେ ଦେବତାରୀ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ପୂଜାରୀର ଅଭିଷ୍ଟ ପୂରଣ କରେନ ।

ସୁତରାଂ ବ୍ରନ୍ଦା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଦୂର୍ଗା, କାଳୀ ପ୍ରଭୃତି ଦେବଦେବୀ ଏକ ଈଶ୍ଵରେର ବିଭିନ୍ନ ସାକାର ରୂପ । ଉଦ୍ଦାହରଣସବୁପ ନିଚେ କରେକଜଳ ଦେବଦେବୀର ଐଶ୍ଵରିକ ଶୁଣ ଓ ଶକ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହଲେ-

**ବ୍ରନ୍ଦା :** ଈଶ୍ଵର ଯେ-ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କରେନ ତୋ ତାର ନାମ ବ୍ରନ୍ଦା । ତିନି ବିଶ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱର ସବକିଛୁ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେନ । ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରା ଛାଡ଼ାଏ ବ୍ରନ୍ଦା ମାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ବାନ୍ଧୁଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଶାନ୍ତର ଉତ୍ସାହକ । ତିନି କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାଜ କରେ ଥାକେନ ।

**ବିଷ୍ଣୁ :** ତିନି ସୃଷ୍ଟିର ହିଁତି ଓ ପ୍ରତିପାଳନେର ଦେବତା । ଏ ବିଶ୍ୱେ ଯା କିଛୁ ଆଛେ ବିଷ୍ଣୁ ତା ପାଳନ ଓ ରଙ୍ଗା କରେନ । ଦେବତାରୀ ବିପଦେ ପଡ଼ିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ତାଦେର ଉଦ୍ଧାର କରେନ । ଦୁଷ୍ଟକେ ଦମନ ଓ ଶିଷ୍ଠକେ ପାଳନ କରାର ଜନ୍ୟ ତିନି ବହରଙ୍କପେ ଏ ପୃଥିବୀତେ ଅବତାରଙ୍କପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହନ । ବିଷ୍ଣୁକେ ନ୍ୟାରଣ କରିଲେ ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ, ହୁଦଯ ପରିତ୍ର ହୁଏ ଓ ଘନେ ଶାନ୍ତି ଆସେ ।

**ଶିବ ବା ମହେଶ୍ୱର :** ତିନି ଧ୍ୱନି ବା ପ୍ରମାଣେର ଦେବତା । ତିନି ଧ୍ୱନି କରେ ସମତା ରଙ୍ଗା କରେନ । ଏ ଛାଡ଼ାଏ ତିନି ଦେବତାଦେର ବିପଦ ଆପଦ ଥେକେ ରଙ୍ଗା ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନେ ଅସୁରଦେର ବିଲାଶ କରେନ । ତିନି ଚିକିଂସାଶାସ୍ତ୍ର ଓ ନୃତ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ବହୁ ବିଦ୍ୟାଯ ପାରଦଶୀୟ । ନାଟ୍ୟ ଓ ମୃତ୍ୟେ ଏ ପାରଦର୍ଶିତାର କାରଣେ ତାକେ ନଟରାଜ ବଲା ହୁଏ ।

**দেবী দুর্গা :** দেবী দুর্গা ঈশ্বরের শক্তিরূপ। আদ্য শক্তি মহামায়াই বিভিন্ন দেবীরূপে প্রকাশিত হয়েছেন যেমন - দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, কাভ্যায়নী প্রভৃতি। দেবী দুর্গা অসীম শক্তির দেবী, যিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার সাথে সম্পূর্ণ। দেবী দুর্গাকে এ মহাবিশ্বের মহাশক্তি হিসেবে বিশ্বাস এবং পূজা করা হয়।

**দেবী কালী :** দেবী কালী শাশ্঵ত ক্ষমতা ও শক্তির আধার। তিনি একদিকে অন্যায় ও অগুরকে ধ্বংস করেন। অপরদিকে ঘমতাময়ী মা রূপে দেন বরাভয়।

**লক্ষ্মী :** লক্ষ্মী সৌভাগ্য, ধন-সম্পদ এবং সৌন্দর্যের দেবী। তিনি আমাদের বিভিন্ন সম্পদ দান করে থাকেন।

**সরস্বতী :** তিনি বিদ্যা, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির দেবী। সরস্বতী পূজার মাধ্যমে আমরা বিদ্যাশক্তি অর্জন করতে পারি।



**গণেশ :** সিদ্ধি বা সফলতার দেবতা। যে-কোনো শুভকাজে বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সিদ্ধিদাতা হিসেবে গণেশের পূজা করা হয়।

**কার্তিক :** কার্তিক যুদ্ধের দেবতা, তিনি দেবসেনাপতি। তিনি অন্যায়, অভ্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আদর্শ ও সুন্দর সন্তান লাভের জন্য দেবতা কার্তিকের পূজা করা হয়।

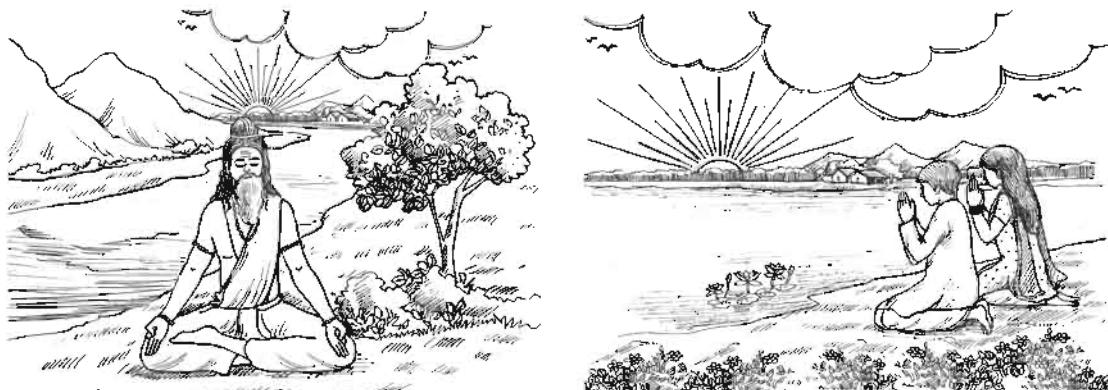
**শীতলা :** তিনি রোগ প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দেবী। দেবী শীতলাকে স্বাস্থ্যবিধি পালন বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দেবীও বলা হয়। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি। তিনি মহামায়ী প্রতিরোধ ও প্রাণিকূলকে বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা করে থাকেন।

## পাঠ ৫ : উপাসনা

### উপাসনার ধারণা

হিন্দুধর্মের মূলে রয়েছেন ভগবান স্বয়ং। ‘ধর্মমূলো হি ভগবান्, সর্ববেদময়ো হরিঃ।’ ঈশ্বর আছেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সকল জীবের অন্তরাত্মা। সবকিছুই তাঁর থেকে সৃষ্টি। সৃতরাং ঈশ্বরই ধর্মের মূল উৎস। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের পালন করেন। তিনি সর্বশক্তিমান। আমাদের মঙ্গল-অমঙ্গল সব তাঁর হাতে। তাই আমাদের মঙ্গলের জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই। তাঁর শুণগান করি। বিশেষ পদ্ধতিতে ঈশ্বরের শুণগান করার বীতিকে বলা হয় উপাসনা। আক্ষরিকভাবে উপাসনা বলতে ঈশ্বরের পাশে অবস্থান করাকে বোঝানো হয়।

প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির হৃদয় ঈশ্বরের অনুকম্পা লাভের জন্য উন্মুখ থাকে। সে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে। হিন্দুধর্ম অনুসারে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করাই



হলো পরম তৃষ্ণি ও মুক্তির একমাত্র পথ। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের বিভিন্ন পথের কথা উল্লেখ রয়েছে। উপাসনা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের একটি মাধ্যম বা পথ।

### উপাসনার ধরন

উপাসনা সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা—

- ক. সাকার উপাসনা বা প্রতীক উপাসনা
- খ. নিরাকার উপাসনা বা নির্গুণ উপাসনা

**সাকার উপাসনা বা প্রতীক উপাসনা :** প্রতীক শব্দের অর্থ চিহ্ন বা আকার। মূলত এ ধরনের উপাসনা বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমাকে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা প্রভৃতি) উদ্দেশ্য করে করা হয়। প্রতীক উপাসনা সঙ্গ উপাসনা বা ভক্তিযোগ নামে পরিচিত। সঙ্গরূপে ঈশ্বর সাকাররূপে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি প্রতিকৃতিতে প্রকাশিত। পূজা করাকে সঙ্গ উপাসনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

**নিরাকার উপাসনা :** ‘নিরাকার’ শব্দের অর্থ যার কোনো আকার নেই। মূলত এ ধরনের উপাসনা ধ্যান সাধনার মাধ্যমে করা হয়। জ্ঞানযোগ নিরাকার উপাসনার একটি অংশ। এ উপাসনা ঈশ্বরের কোনো প্রতিকৃতিকে উদ্দেশ করে করা হয় না। নিরাকাররূপ ঈশ্বর অদৃশ্য অবস্থায় অবস্থান করেন। তাঁকে উপলক্ষ্য করে তাঁর উপাসনা করা হয়।

হিন্দুধর্মাবলম্বী কেউ নিরাকার, কেউবা সাকার উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পূজা বা আরাধনা করেন। এ সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করেছেন :

যে যথা মাং প্রপদ্যত্বে তাংস্তথৈব ভজাম্যহ্ম ।  
মম বর্জানুবর্তন্তে মনুষ্যাং পার্থ সর্বশঃ । (গীতা ৪/১১)

অর্থাৎ যারা যেভাবে আমাকে ভজনা করে তাদের সেভাবেই আমি কৃপা করে থাকি। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করে। দেবদেবীগণ একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ। তাই হিন্দুধর্মে একের মধ্যে বহু সমাবেশ বা বহুর মধ্যে একের অভিব্যক্তি ঘটেছে।

## উপাসনার উপায়

উপাসনা করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। এ উপায়গুলোর মধ্যে আছে পূজা করা, জপ ধ্যান বা যোগ সাধনা, তত্ত্ব সাধনা প্রভৃতি। এ ছাড়াও দেব-দেবীর উদ্দেশে মন্ত্র পাঠ, প্রার্থনা মন্ত্র, পুস্পাঙ্গলি প্রদান, প্রণাম মন্ত্র পাঠ, আরতিগান, কীর্তন প্রভৃতি উপাসনার উপায় হিসেবে ধরা হয়। এ বাহ্য আচরণের মাধ্যমে মূলত অন্তরের ভঙ্গি, শুন্দা ও ভালোবাসা ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে প্রকাশ করা হয়। উপাসনা ও প্রার্থনার জন্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থে অনেক মন্ত্র বা শ্লোক রয়েছে। সেগুলো আবৃত্তি করে উপাসনা করা হয় বা প্রার্থনা জানানো হয়।

## উপাসনার প্রয়োজনীয়তা

১. হৃদয় পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করা : ঈশ্বরের উপাসনা হৃদয়কে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে এবং সুন্দর অনুভূতির সৃষ্টি করে।
২. মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করা : উপাসনা মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে, মনের আবেগকে পরিশুদ্ধ, উন্নত ও নিয়ন্ত্রণ করে।
৩. ভক্তদের মনে ঈশ্বরের উপস্থিতি সৃষ্টি করা : উপাসনা ভক্তদের ঈশ্বরের কাছাকাছি অবস্থানের সুযোগ করে দেয় এবং ধর্মীয় বিষয়ে গভীর চেতনার সৃষ্টি করে।
৪. মানসিক অবস্থার উন্নতি করা : উপাসনা মানুষের মানসিক অবস্থার উন্নতি করে, মনের কৃটিলতা দূর করে এবং মনকে শুক্র করে সত্ত্বের পথে পরিচালিত করে। উপাসনা মনের কামনা, বাসনা, তৃষ্ণা, অহমিকা, আমিত্তি, হিংসা বিদ্যম দূর করে।
৫. ভক্ত ও ঈশ্বরকে মুখোমুখি করা : উপাসনার মাধ্যমে ভক্ত তার ইষ্ট দেবতাকে উপলক্ষ্য করতে পারে এবং গভীর ভালোবাসার মাধ্যমে সে তাকে নিজের চোখে অবলোকন করতে পারে।
৬. মোক্ষ লাভ : মোক্ষ অর্থ চিরমুক্তি। দেহান্তরের মধ্য দিয়ে জীবাত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে যায়। কিন্তু পুণ্যবলে এক সময় আর দেহান্তর হয় না। তখন জীবাত্মাকে আর অন্যদেহে যেতে হয় না। জীবাত্মা পরমাত্মায় সীন হয়ে যায়। তখন আর পুনর্জন্ম হয় না। একে বলে মোক্ষ, মোক্ষলাভ। উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরের সাম্রাজ্যলাভ, শেষে মোক্ষলাভ।

## পাঠ ৬ : ঈশ্বর উপাসনার একটি মন্ত্র বা শ্লোকের অর্থ ও শিক্ষা

উপাসনার একটি মন্ত্র :

যশ্মাং পরং নাপরমতি কিঞ্চিদ্  
যশ্মান্নাশীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিত্।  
বৃক্ষ ইব স্তোৱ দিবি তিষ্ঠত্যেক-  
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম् ॥ (শ্লেষ্মাশতর উপনিষদ্ ৩/১)

**সরলার্থ :** যা থেকে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট আর কিছু নেই, যা থেকে স্ফুদ্রতর বা বৃহত্তর কিছুই নেই, যে অধিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে স্থানিমায় বিরাজিত, সেই পুরুষের দ্বারাই সমস্ত জগৎ পরিব্যাঙ্গ ।

**উপাসনার শিক্ষা :** এ প্রোক্ত থেকে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তা হলো—  
ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নেই । তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি নিজ গুণে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এ বিশ্ব জগতে বিরাজ করছেন । তিনি ছাড়া এ জগতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই অর্থাৎ ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় । আমাদের উচিত সবসময় ঈশ্বরের নাম জপ করা বা প্রতিদিন একবার ঈশ্বরের মন্ত্র বা প্রোক্ত পাঠ করা, যাতে আমাদের মনে ঈশ্বরের মহসুস সর্বদাই পরিব্যাঙ্গ থাকে ।

#### প্রার্থনা মন্ত্র

কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দন ।  
গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্র মাধব ॥

**সরলার্থ :** হে কেশব, হে দুঃখদূরকারী, হে নারায়ণ, হে জনার্দন, হে গোবিন্দ-পরমানন্দ, হে মাধব আমাকে উদ্ধার কর ।

#### শিক্ষা

ভগবান বিষ্ণুই শ্রীকৃষ্ণ । তিনি জীব ও জগতের মঙ্গলের জন্য অনেক লীলা করেছেন । দুষ্টের দমন করে ধর্ম ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন, শান্তি স্থাপন করেছেন । তাঁর অনেক নাম : কেশব, নারায়ণ, জনার্দন, গোবিন্দ, মাধব ইত্যাদি । তিনি সবসময় আনন্দময় থাকেন, সুখ বা দুঃখে তিনি বিচলিত হন না । তাই তিনি পরমানন্দ । তিনি জীব ও জগতের দুঃখ হরণ করেন, অর্থাৎ দূর করেন । আমরা জীবেরা অনেক সময় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এমন কাজ করি, যাতে পাপ হয় । তাই আমাদের পাপ ক্ষমা করে উদ্ধার করার জন্য আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই । এ প্রার্থনা মন্ত্র থেকে আরও শিক্ষা পাই যে, ঈশ্বরের কাছে পাপমুক্তির জন্যও প্রার্থনা করতে হয় ।

#### অনুশীলনী

##### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। কলিযুগের অন্তে অবতার হিসেবে কার আবির্ভাব ঘটবে ?

- |          |          |
|----------|----------|
| ক. কৃষ্ণ | খ. বরাহ  |
| গ. বামন  | ঘ. কঙ্কি |

২। ঈশ্বরের সাকার রূপ কারা ?

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| ক. মুনি-খায়ি     | খ. দেব-দেবী    |
| গ. যোগী-সন্ন্যাসী | ঘ. সাধক-সাধিকা |

৩। রোগ প্রতিরোধকারী দেবী কে ?

- |            |           |
|------------|-----------|
| ক. লক্ষ্মী | খ. দুর্গা |
| গ. কালী    | ঘ. শীতলা  |

৪। পরমাত্মার মৃত্যু নেই, কারণ পরমাত্মা -

- i. সাকার
- ii. মৃত্যুহীন
- iii. জন্ম ও মৃত্যুহীন

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুমিতা দেবী ফলাকাভঙ্গা ত্যাগ করে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় গভীর ধ্যানে মগ্ন থেকে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য মৌক্ষলাভ ।

৫। সুমিতা দেবী কোন ধরনের উপাসনা করেন ?

- |          |            |
|----------|------------|
| ক. সাকার | খ. নিরাকার |
| গ. সকাম  | ঘ. সমবেত   |

৬। নিয়মিত উপাসনার ফলে সুমিতা দেবীর -

- i. হৃদয় পরিষ্কার ও পবিত্র হবে
- ii. মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাবে
- iii. ঈশ্বরের সাম্মিধ্য লাভের প্রত্যাশা পূরণ হবে ।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. i ও ii      |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সংজ্ঞনশীল প্রশ্ন :

শুভ্র ও তার মায়ের কথপোকথন-

- শুভ্র - মা, দিনের পর রাত, রাতের পর দিন হয় কেন ? দাদু মারা গেলেন কেন ?
- মা - এটি মহাবিশ্বের একটি নিয়ম । এর মূলে রয়েছেন স্রষ্টা । তাঁকে আমরা ঈশ্বর বলি ।
- শুভ্র - মা, ঈশ্বর কে ? ব্রহ্মা, শিব না বিষ্ণু ?
- মা - এঁরা সকলেই এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ ও শক্তি এবং ঈশ্বরের সাকাররূপের প্রতিফলন । তাই আমরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করি ।
- ক. বিষ্ণুর সর্বশেষ অবতার কোনটি ?
- খ. উপাসনা বলতে কী বোঝায় ?
- গ. অনুচ্ছেদে শুভ্রের প্রশ্নের জবাবে তার মা স্রষ্টার কোন ভূমিকার কথা ব্যক্ত করেন তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর ।
- ঘ. শুভ্রের মায়ের শেষোক্ত কথাটি- ‘ঈশ্বরের সাকার রূপের প্রতিফলন’- বিশ্লেষণ কর ।

## প্রথম অধ্যায়

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ : স্তুতি, সৃষ্টি ও সেবা

পূর্ব পরিচ্ছেদে আমরা স্তুতির স্বরূপ ও উপাসনা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। এ পরিচ্ছেদে স্তুতি, সৃষ্টি ও সেবা সম্পর্কে জানব। ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

তিনি সকল কিছুর নিরাকার। তিনি এক ও অবিভিন্ন।  
তাঁর আদি মেই, অন্ত মেই। তাঁকে ঢোকে দেখা যায় না,  
তিনি নিরাকার। তিনিই জীবের মধ্যে আজ্ঞারূপে অবস্থান  
করেন। তাই জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা  
হয়। এ অধ্যায়ে আমরা সকল সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর, জীবের  
মধ্যে আজ্ঞারূপে ঈশ্বরের অবস্থান, এ সম্পর্কে একটি  
শ্লোক ও কবিতা এবং ঈশ্বর জানে জীবসেবা সম্পর্কে  
সংক্ষেপে আলোচনা করব।



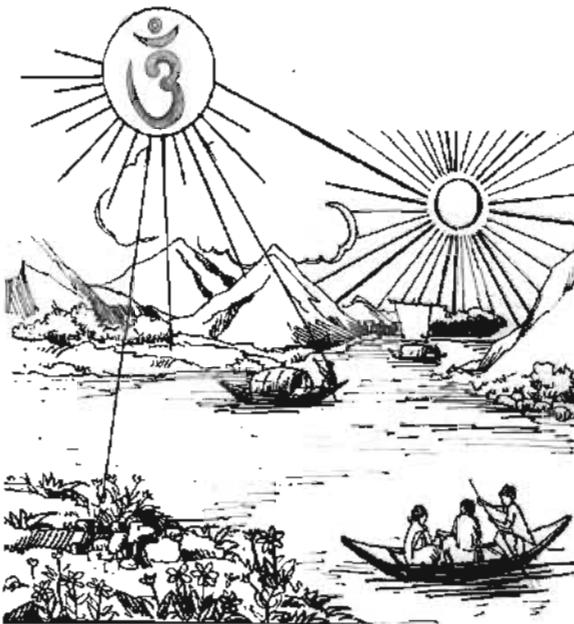
#### এ অধ্যায় শেবে আমরা-

- সকল সৃষ্টির মূলে ঈশ্বরের অভিষ্ঠ ব্যাখ্যা করতে পারব
- আজ্ঞারূপে জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থানকে ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্মগ্রন্থ থেকে জীব ও জগতের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কে একটি মন্ত্র বা শ্লোকের অর্থ ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- সবকিছুর মূলে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত একটি গীতিকবিতা ব্যাখ্যা ও এর শিক্ষা শনাত্ত করতে পারব
- ঈশ্বরজানে জীব সেবার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব
- জীব ও প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের অভিষ্ঠ উপরক্রি  
করতে এবং জীবসেবা ও পরিবেশ সংরক্ষণে  
উন্নত হব।



### পাঠ ১ : সকল সৃষ্টির মূলে ইশ্বর

সুনীল আকাশ, পৃথিবী ও পৃথিবীর প্রকৃতি- সব মিলিয়ে বিচ্ছিন্ন এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। অনন্ত আকাশজুড়ে বিরাজ করছে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলী। পৃথিবীতে রয়েছে সমুদ্র, মহাসমুদ্র, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, আলো-বাতাস ও বিভিন্ন ধরনের বিচ্ছিন্ন জীবজন্ম। সবকিছু মিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আদিতে এ মহাবিশ্ব ছিল না। তখন সব ছিল অঙ্গকার। তারপর এল আলো, জল এবং জলের পরে পৃথিবী। পৃথিবীর পরে এল গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গ, জীবজন্ম, মানবকূল প্রভৃতি। এ সবকিছু সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ইশ্বর। গীতায় বলা হয়েছে, তিনি পরমাত্মা এবং একমাত্র আশ্রয়। এ বিশ্বে জীবকূল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ইশ্বর। আবার তিনিই জীবাত্মা হিসেবে জীবদেহের মধ্যে নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে বিরাজ করছেন। তিনি জীবের জীবন, প্রাণীর প্রাণ, সর্বভূতের সন্তান বীজ। জীবদেহের তেতরে যে জীবন আছে তা পরমাত্মারই অংশ। আজ্ঞা ছাড়া জীবদেহ অচল, মৃত। তিনি জীবের জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। কথাটি আরও একটু বুবিয়ে বলি : জীবদেহের মধ্যে যখন ইশ্বর আত্মারূপে প্রবেশ করেন, জীবদেহ তখন চেতনাসম্পন্ন হয়, সচল, সক্রিয় হয়। যতদিন জীবাত্মারূপে তিনি জীবদেহে অবস্থান করেন, ততদিনই জীবের জীবন বা আয়। জীবাত্মা জীবদেহ পরিত্যাগ করলে জীবের মৃত্যু ঘটে এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেহের বিনাশ ঘটে। তাই বলা হয়েছে ইশ্বরই আমাদের জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। তিনিই আমাদের চিন্তা, চেতনা ও সকল প্রচেষ্টার নিয়ন্ত্রা।



ইশ্বর মানুষ ও জীবজন্মের কল্যাণে অফুরন্ত সৌন্দর্যে ও সম্পদে ভরপুর এ সুন্দর পৃথিবী ও প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। এ প্রকৃতিতে বিরাজ করছে কত রকমের ফুল, কত রকমের ফল। প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁরই সৌন্দর্য। সৌন্দর্য সৃষ্টির মূলেও ইশ্বর রয়েছেন।

### পাঠ ২ : আত্মারূপে ইশ্বর

স্তুতি বা ইশ্বর সর্বশক্তিমান। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা স্তুতিকে ব্রহ্ম, ইশ্বর বা তত্ত্ববান বলে অভিহিত করেন। জ্ঞানীদের কাছে ইশ্বর ব্রহ্ম, যোগীদের কাছে পরমাত্মা এবং ভক্তের নিকট তত্ত্ববান নামে পরিচিত। পরমাত্মা জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। পরমাত্মা যখন জীবের মধ্যে অবস্থান করেন, তখন তিনি জীবাত্মার রূপ ধারণ করেন। এই পরমাত্মা থেকেই জীবের সৃষ্টি। আজ্ঞা নিত্যবন্ধ ও নিরাকার। আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। একই পরমাত্মা বহু আত্মারূপে জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করেন। জীবদেহের বিনাশ আছে,

কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। কারণ জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশবিশেষ। পরমাত্মার সকল গুণই জীবাত্মার মধ্যে বিদ্যমান। তাই পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও জন্ম-মৃত্যুহীন এবং শাশ্বত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, এ আত্মা জন্মেন না, মরেন না।

ইনি নিত্য বিদ্যমান। ইনি জন্ময়াহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ। শরীরের বিনাশ ঘটলেও, ইনি বিনষ্ট হন না (গীতা, ২/২০)। আত্মার দেহান্তর ঘটে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে-

‘বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোৎপরাণি ।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী’॥ (২/২২)

অর্থাৎ মানুষ পুরাতন কাপড় পরিত্যাগ করে যেমন নতুন কাপড় পরিধান করে, আত্মাও তেমনি পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহে প্রবেশ করে। আত্মার এই দেহ পরিবর্তনকে জন্ম ও মৃত্যু বলে।

দেহ ও আত্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। দেহকে আশ্রয় করে আত্মার অভিযাত্রা। আবার আত্মাকে লাভ করে দেহ সংজীব। দেহহীন আত্মা নিঞ্চিত, আত্মাহীন দেহ জড়। অর্থাৎ জড় বস্তুর আত্মা নেই, তাই নিষ্ঠল, প্রাণহীন ও ক্রিয়াহীন। আত্মার জন্ম ও মৃত্যু নেই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতেও জানা যায়-আত্মা জন্মহীন, মৃত্যুহীন শাশ্বত, পুরাতন হয়েও চিরন্তনুন।

**পার্থ ৩ :** জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত একটি মন্ত্র বা শ্লোক এবং ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত কবি রঞ্জনীকান্ত সেন-এর গীতিকবিতা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে :

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়ঙ্খিতঃ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ (১০/২০)

**সরলার্থ :** হে অর্জুন! আমি সকল প্রাণীর হৃদয়স্থিত আত্মা, আমি ভূতসকলের আদি, মধ্য ও অন্ত।

**শিক্ষা :** এখানে আদি বলতে জীব-জগতের উৎপত্তি, মধ্য বলতে তাদের স্থিতি এবং অন্ত বলতে তাদের মৃত্যু বোঝানো হয়েছে। ঈশ্বরই জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করছেন। একথা উপলব্ধি করে আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব এবং জীবকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভালোবাস ও সেবা করব। উল্লিখিত শ্লোকের আলোকে আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি-

আছ অনল-অনিলে                      চির নভোনীলে

ভূধর সলিল গহনে,

আছ বিটপী লতায়                      জলদের গায়

শশী তারকায় তপনে ।

**ব্যাখ্যা :** উল্লিখিত কবিতাংশটি রঞ্জনীকান্ত সেন-এর একটি গীতিকবিতার অংশ। এখানে সবকিছুর মূলে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর সকল সৃষ্টি ও সৌন্দর্যের মধ্যে অবস্থান করেন। কবি রঞ্জনীকান্ত সেন-এর এ গীতিকবিতায় তিনি ব্যক্ত করেছেন যে নিরাকার ঈশ্বর অনল অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু ও চির

সুনীল আকাশে আছেন। এর অর্থ হচ্ছে – অগ্নির যে দাহিকা শক্তি, তা ঈশ্বরের শক্তি। বায়ু ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। বায়ুর যে গতি, তার মূলে রয়েছে ঈশ্বরের শক্তি। আমাদের মাথার ওপরে যে সুনীল আকাশ, ঈশ্বর সেখানেও আছেন নৌলিম সৌন্দর্যবৃপে। একইভাবে ভূধরে মানে পর্বতের দৃঢ়তা, উচ্চতা ও মৌনতার মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আবার ঈশ্বর আছেন জলের গভীরতায়। তিনি বৃক্ষ, লতা, মেঘ, চন্দ, সূর্য ও তারকারাজির মধ্যেও বিরাজিত আছেন। এ সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি। তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করছেন। রঞ্জনীকান্ত সেন এ কবিতায় ব্যক্ত করেছেন যে, ঈশ্বর সকল কিছুর মূলে অবস্থান করছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে নিজের মহিমা ও সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই ঈশ্বরের সৌন্দর্যেই সকল কিছু সুন্দর। তাঁর শক্তিতেই সকল কিছু শক্তিমান।

#### পাঠ ৪ : ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা

সাধারণ অর্থে ‘সেবা’ বলতে পরিচর্যা করা বোঝায়। যেমন- অতিথি সেবা, জীবসেবা, ঈশ্বর সেবা প্রভৃতি। অপরের সন্তোষ বিধানের জন্য যে দেহ ও মনের সমস্যায়ে কল্যাণকর কাজ করা হয় তাকে সেবা বলে। জীবসেবা বলতে জীবের পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও বৃক্ষ করাকে বোঝায়। এ ছাড়াও বুদ্ধি দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, সহানুভূতি জানিয়ে, বিপদে পাশে দাঁড়িয়ে নানাভাবে সেবা করা যায়। আমরা জীবের সেবা করব কেন? আমরা জানি, ঈশ্বর জীবাত্মারপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবসেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।

জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান ব্রত হিসেবে বিবেচিত। ‘যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ’। অর্থাৎ যেখানে জীব সেখানেই শিব। এখানে শিব বলতে ঈশ্বরের কথাই বোঝানো হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন :

‘বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর  
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।’

এ কথার তাত্পর্য এই যে, বহুরূপে অর্থাৎ বহুজীববৃপে ঈশ্বর আমাদের সম্মুখেই আছেন। তাই তাঁকে খুঁজে বেড়ানোর দরকার নেই। যিনি জীবকে তালোবাসেন, তিনি সেই সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরেরই সেবা করেন। তাই হিন্দুধর্মে জীবকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মজ্ঞানে সেবা করতে বলা হয়েছে। কারণ জীবকে সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

সুতরাং ঈশ্বর জ্ঞানে জীবসেবা হিন্দুধর্মের একটি মূল বৈশিষ্ট্য এবং অন্যতম নৈতিক শিক্ষা।

হিন্দুধর্মে বৃক্ষ একটি জীব। বৃক্ষের মধ্যে প্রাণরূপে ঈশ্বর বিরাজিত। তাই বৃক্ষের সেবা বা পরিচর্যা করা



হিন্দুধর্মে অতি প্রাচীন কাল থেকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আহারের শেষে কিছু অংশ বিভিন্ন প্রাণীর জন্য সংরক্ষণ করা হয়। এই অংশ জীবকে দেওয়া হয়। এভাবেও জীবসেবা হয়।

হিন্দুধর্মে জীবসেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন সেবাশ্রম, মঠ গড়ে উঠেছে যা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করছে। বিভিন্ন উপায়ে জীবসেবা করা হচ্ছে।

সকল জীবের মধ্যে প্রাণরূপে ঈশ্বর বিরাজিত এবং ঈশ্বরের সত্তা প্রকাশিত। আমরা এ সত্ত্ব উপলক্ষ্য করে, সব ভেদাভেদ ভুলে জীবের সেবা করব।

### অনুশীলনী

**বহনির্বাচনি প্রশ্ন :**

১। ‘আত্মা জন্মহীন মৃত্যুহীন শাশ্঵ত, পুরাতন হলেও চির নতুন’ – কে বলেছেন ?

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| ক. শ্রীচৈতন্যদেব | খ. শ্রীবিজয়কৃষ্ণ |
| গ. শ্রীকৃষ্ণ     | ঘ. শ্রীরামকৃষ্ণ   |

২। তত্ত্বদের কাছে ঈশ্বর কী নামে পরিচিত ?

- |             |             |
|-------------|-------------|
| ক. ব্রহ্ম   | খ. বৈষ্ণব   |
| গ. তত্ত্বান | ঘ. পরমাত্মা |

৩। জীবকে ভালোবাসার মূল কারণ হচ্ছে –

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| i. যেখানেই জীব সেখানেই শিব | ii. ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন |
| iii. জাগতিক কল্যাণ হয়     |                       |

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অতীন্দ্র বাবু প্রতিদিন দুপুরে আহারের সময় একমুঠো ভাত তাঁর একটি কুকুরকে দিতেন। একসময় কুকুরটি তাঁর খুব ভক্ত হয়ে ওঠে।

৪। অতীন্দ্র বাবুর আচরণে হিন্দুধর্মের কোন মূল বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে ?

- |                  |            |
|------------------|------------|
| ক. পশুপ্রীতি     | খ. জীবসেবা |
| গ. কর্তব্যনিষ্ঠা | ঘ. অল্লদান |

৫। অতীন্দ্র বাবুর পক্ষে ঈশ্বরকে ভালোবাসা সম্বন্ধ, কারণ তাঁর বিশ্বাসে রয়েছে ঈশ্বর-

- i. সকল সৃষ্টির মূল
- ii. মহাবিশ্বের নিয়ন্তা
- iii. আত্মারপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

**সূজনশীল প্রশ্ন :**

মৌমিতার বোনের জন্মের সাত দিন পরেই তার ঠাকুরমার মৃত্যু হয়। শ্রিয় ঠাকুরমাকে হারিয়ে সে একা হয়ে পড়ে এবং মায়ের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলে মা তাকে জীবাত্মা সম্পর্কে একটি ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য বুঝিয়ে বলেন। মৌমিতা তা উপলব্ধি করতে পেরে শ্রদ্ধায় ঈশ্বরের প্রতি মাথা নত করে।

- ক. ব্রহ্ম থেকে কী সৃষ্টি হয়েছে ?
- খ. ঈশ্বরকে কেন আদি শক্তি বলা হয় ?
- গ. অনুচ্ছেদে মৌমিতার মা কোন ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য তুলে ধরেন তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মৌমিতার উপলব্ধিটি তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে মূল্যায়ন কর।

## ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

### ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ, ଉତ୍ସପତ୍ତି ଓ ବିକାଶ

#### ଅଧ୍ୟାୟ ପରିଚେତ୍ : ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ

ଗଣ୍ଡୀର ବିଶ୍ୱାସେର ସଜେ ଆଚାର-ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଯେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ । ବିଶ୍ୱାସମୂହେର ଯଥେ ଈଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଛେ ମୌଳ ବିଶ୍ୱାସ । ଈଥର ସର୍ବତ୍ତିମାନ, ସର୍ବଜ, ସର୍ବଜ୍ଞ ବିବାଜିତ, ତିନି ଏକ, ଅଭିନ୍ନ, ଅନନ୍ୟ ପରମସତ୍ତା । ତିନି ନିରାକାର, ତବେ ପ୍ରୋତ୍ସମେ ସାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତେ ପାରେନ । ସେମନ - ଈଥରେର ଅବତାରଗମ ।



ଏଦେର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାନବୋରୁ ଜନ୍ୟ ପୂଜା-ଅର୍ଚନାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ ଥାକେ । ଆମରା ଜାନି ଈଥରେର କୋମୋ କ୍ଷଣ ବା ଶତିକେ ଈଥର ସଖନ ଆକାର ଦେଲ, ତଥବ ତାକେ ଦେବତା ବା ଦେବ-ଦେଵୀ ବଲେ । ତବେ ଦେବ-ଦେଵୀ ଓ ଅବତାରଗମ ସବାଇ ଏକ ପରମେଶ୍ୱରେର ବିଭୂତି ଏବଂ ଶତିର ପ୍ରକାଶକ । ଦେବ-ଦେଵୀର ଆରାଧନାର ଯଥ୍ୟ ଦିରେ ତତ୍ତ୍ଵ ଈଥରେର କରନ୍ତା ପେଣେ ଥାକେ । କେନାନା, ଈଥରେର ବିଭିନ୍ନ ଶତିର ପ୍ରକାଶ ହିସେବେ ଦେବ-ଦେଵୀର ଆବିର୍ତ୍ତାବ । ଆର ଅବତାରଙ୍କପେ ତୋ ସର୍ବ ତତ୍ତ୍ଵବାନଙ୍କ ପୃଥିବୀତେ ନେବେ ଆସେନ । ତାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଓ ଦେବ-ଦେଵୀ ଏକଇ ବ୍ରକ୍ଷ ବା ଈଥରେର ସାକାର ରୂପ ।

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଜୀବନକେ ସାର୍ଵକ ଓ ପୌରବମନ୍ତ କରାର ଜନ୍ୟ ବ୍ରଦ୍ଧାର୍ତ୍ତ, ଗାର୍ହତ୍ୱ, ବାନ୍ଧବ ଓ ସମ୍ମାନ ଏହି ଚତୁରାଶମ ବା ଚାରାଟି ତୁରେର କଷା ବଳା ହେଲେହେ । କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଓ ଭକ୍ତିଯୋଗ- ଏର ସେ କୋମୋ ଏକାଟି ନିଷ୍ଠାର ସଜେ ଅନୁଶୀଳନ କରଲେଇ ମାନୁଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରନ୍ତେ ପାରେ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମୀବଳସୀରୀ ସାଥନ ଜୀବନେର ଏହି ତୁରଙ୍ଗୋ ଜେନେ ଅନୁଶୀଳନ କରେ ଜୀବନକେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସାର୍ଵକ କରେ ତୁଳାତେ ପାରେନ ।

ଏ ପରିଚେତ୍ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ ମତେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ, ଅବତାରବାଦ, ଚତୁରାଶମ, ଯୋଗ ଏବଂ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିଯୋଗେର ଧାରଣାର ପ୍ରତି ଆଲୋକପାତ କରା ହୁଏହେ ।

ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେବେ ଆମଗା-

- ମୌଳିକ ବିଶ୍ୱାସ ହିସେବେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦେର ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତେ ପାରବ
- ଅବତାରବାଦେର ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତେ ପାରବ
- ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର, ଦେବ-ଦେଵୀ, ପ୍ରଭୃତି ଏକଇ ବ୍ରକ୍ଷ ବା ଈଥରେର ପ୍ରକାଶ ବା ସାକାର ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ମୂଳତ ସେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦୀ-ଏ ଧାରଣାଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତେ ପାରବ
- ଚତୁରାଶମେର ଧାରଣା (ବ୍ରଦ୍ଧାର୍ତ୍ତ, ଗାର୍ହତ୍ୱ, ବାନ୍ଧବ ଓ ସମ୍ମାନ) ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତେ ପାରବ
- କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିଯୋଗେର ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତେ ପାରବ
- ଧର୍ମବୋଧେ ଜାଗନ୍ତ ହବ ଏବଂ ଧର୍ମଚରଣେ ଉତ୍ସୁକ ହବ ।

### পাঠ ১ : একেশ্বরবাদ

হিন্দুধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচার পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, সেখানে যেমন রয়েছে একেশ্বরের চিত্তা, ধ্যান-ধারণা, তেমনি রয়েছে বিভিন্ন অবতার এবং বহু দেব-দেবীর উপাসনা ও পূজা-অচন্তার কথা।



এভাবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, হিন্দুধর্মাবলম্বীরা কি বহু ইশ্বরবাদী? এ প্রশ্নের উত্তর হিন্দুধর্মগ্রন্থেই রয়েছে।

বেদ ও উপনিষদে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এক ও অবিভীত। তিনি একাধিক নন। এই বে এক ঈশ্বরের বিশ্বাস, একেই বলে একেশ্বরবাদ। প্রচলিত বহু দেব-দেবীর উপাসনা হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ দিক। তবে দেব-দেবীগণ ঈশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা শূণ্যের অধিকারী।

ঝগ্নবেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, উষা প্রভৃতি দেব-দেবীর শক্তি রয়েছে। এঁরা ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয় বহু করলেও এঁদের সম্মিলিত শক্তির কেন্দ্রটি হচ্ছেন ঈশ্বর। ঝগ্নবেদে এ সম্পর্কে ঝগ্নিদের উপলক্ষ্মি হচ্ছে: ‘একৎ সদ্ব বিদ্ধা বহুধা বদন্তি’।

অর্থাৎ সদ্বন্দ্ব এক, বিপ্রগণ তাঁকে বহুপ্রকার বলে বর্ণনা করেন। অনুক্রমভাবে, কঠোপনিষদে দেখা যায় ‘নেহ নানান্তি কিঞ্জন’(কঠ ২/১/১১) ব্রহ্ম থেকে পৃথক কিছু নেই। ব্রহ্ম এক এবং অবিভীত। বিশেষ ঈশ্বরের সমান আর কেউ নেই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও একেশ্বরের কথা বলা হয়েছে। ‘গ্রন্থঃ প্রলয়ঃ হ্রানঃ নিধানঃ বীজমব্যয়ম্’- (গীতা-৯/১৮)। এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে – তাঁর থেকে জগতের উৎপত্তি, তাঁর ধারা হ্রিতি এবং তাঁতেই হচ্ছে লয়। তিনিই জগতের নিধান – আধার ও আশ্রয়।

সুতরাং অবতার ও দেব-দেবীগণ এক পরমেশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন শূণ্য ও শক্তির প্রকাশ। এখানে আরও উল্লেখ্য, দেব- দেবীর আরাধনা করে মানুষ যে সাফল্য অর্জন করে তাতে এক ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটে।

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବହୁମୂଳୀ ସାଧନାର ମଧ୍ୟେ ଦେବ-ଦେବୀର ଆରାଧନା ଓ ବ୍ରକ୍ଷ ସାଧନାର ମଧ୍ୟେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଚେତନା ରଯେଛେ । ସାକାର ଦେବୀ କାଳୀଓ ଯିନି, ନିରାକାର ଏକ ବ୍ରକ୍ଷ ଓ ତିନି । ଯିନି କାଳୀ, ତିନି ବ୍ରକ୍ଷ ।

ତାହଲେ ଦେଖା ଯାଚେ, ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେ ବହୁ ଦେବ-ଦେବୀର ପୂଜା-ଅର୍ଚନାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଶୀଳିତ ହେଲେଓ ମୂଲତ ଏକ ପରମେଶ୍ୱରେରଇ ଉପାସନା କରା ହଚେ । ସୁତରାଂ ଅବତାର ଓ ଦେବ-ଦେବୀ ଏକଇ ଈଶ୍ୱରେର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ, ଈଶ୍ୱର ଏକ ଓ ଅଦିତ୍ୟ- ଏ ବିଶ୍ୱାସକେ ବଲା ହ୍ୟ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ । ଏଭାବେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ଏକଟି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମାବଳୀଦେର ଏକେଶ୍ୱରବାଦୀ ବଲା ଯାଯ ।

## ପାଠ ୨ ଓ ୩ : ଅବତାରବାଦ

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହଚେ ଅବତାରବାଦେ ବିଶ୍ୱାସ । ଅବତାର-ଏର ଅର୍ଥ ହଚେ ଉପର ଥେକେ ନିଚେ ନାମା ବା ଅବତରଣ କରା । ମୃଷ୍ଟା ତାର ସୃଷ୍ଟିକେ ରଙ୍ଗା କରାର ଜନ୍ୟ ଧର୍ମ ଅନୁଶୀଳନେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରେଖେନେ । ଧର୍ମେର ଅସାଧାରଣ ଗୁଣ । ଧର୍ମକେ ଯିନି ରଙ୍ଗା କରେନ, ଧର୍ମ ତାକେ ରଙ୍ଗା କରେ ‘ଧର୍ମୋ ରଙ୍ଗତି ରଙ୍ଗିତ’ ।

ତବେ ମନୁଷ୍ୟସମାଜେ ମାଝେ ମାଝେ ଧର୍ମେର ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା, ଅବହେଲା ଦେଖା ଦେଇ । ଧାର୍ମିକଦେର ଜୀବନେ ନେମେ ଆସେ ନିର୍ମୀଡ଼ନ-ନିର୍ଯ୍ୟାତନ । ଦୁକ୍ଷତକାରୀଦେର ଅଭ୍ୟାସ-ଅନାଚାର ସମାଜଜୀବନକେ କଲୁଷିତ କରେ ତୋଳେ । ଏକୁପ ଅବହାୟ ଭଗବାନ ସ୍ଵର୍ଗ ମନୁଷ୍ୟାଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରେ ପୃଥିବୀତେ ନେମେ ଆସେନ । ଏକେଇ ବଲା ହ୍ୟ ଅବତାର । ଆର ଅବତାର ସମ୍ପର୍କେ ଯେ ଦାର୍ଢିନିକ ଚିନ୍ତା-ଭାବନା, ତା ଅବତାରବାଦ ନାମେ ପରିଚିତ ।

ଅବତାରେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁକ୍ଷତକାରୀଦେର ବିନାଶ ସାଧନ, ସାଧୁ-ସଜ୍ଜନଦେର ଦୁଃଖ-କଟ୍ ଥେକେ ମୁକ୍ତ କରା ଏବଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରା । ଏଇ ଅବତାରବାଦେର ସୂଚନା ଲଙ୍ଘ କରା ଯାଯ ପୌରାଣିକ ଯୁଗେ । ଅନେକ ଶକ୍ତିଧର ଈଶ୍ୱର ଜୀବେର ନ୍ୟାୟ ଦେହ ଧାରଣ କରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହନ । ଏଇ ଆବିର୍ଭାବେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଅବଶ୍ୟ ଅସୀମ ଈଶ୍ୱରେର ଧାରଣା କୋଳୋ ହେଲେ ଘଟେ ନା ।

ଈଶ୍ୱର ହଚେନ ଚୈତନ୍ୟମୟ ସତ୍ତା । ତିନି ଚୈତନ୍ୟମୟରାପ । ତିନି ଅସୀମ ସସୀମ ସକଳ ଅବହାତେଇ ଥାକତେ ପାରେନ । କାଜେଇ ଅବତାର ସସୀମ ହ୍ୟେ ଦେହ ଧାରଣ କରେ ଏଲେଓ ତାର ମଧ୍ୟେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଥାକେ । ଜୀବଦେହ ଧାରଣ କରଲେଓ ତିନି ଏବଂ ଜଗଥ କାରଣ ବ୍ରକ୍ଷ ଏକ ଏବଂ ତାର ଏଇ ଭୁଲ ଦେହ ଧାରଣ ଏକଟି ମାଯାର ଖେଳା ମାତ୍ର ।

ଏଇ ଅବତାର ତିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟେର ହ୍ୟେ ଥାକେ । ସଥା- ଗୁଣାବତାର, ଲୀଲାବତାର ଓ ଆବେଶାବତାର । ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ରକ୍ଷା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ଏଇ ତିନ ଦେବତାଙ୍କାପେ ଅବତାର ହ୍ୟେ ବ୍ରକ୍ଷାଙ୍କେ ସୃଷ୍ଟି, ଛିତ୍ର ଓ ସଂହାର କରେନ । ଏରା ପରମେଶ୍ୱରେର ଗୁଣାବତାର । ଆବାର ପୃଥିବୀତେ ମଂସ୍ୟ, କୂର୍ମ, ବରାହ ପ୍ରଭୃତି ଭୂଲ ଦେହଧାରୀ ଜୀବେର ମୂର୍ତ୍ତିତେ ଅବତାର ହ୍ୟେ ତାଙ୍କ କରିବାକାଣ୍ଡ କରେନ ତାକେ ଲୀଲାବତାର ବଲା ହ୍ୟ । ଶ୍ରୀଚିତନ୍ୟ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରେର ଜ୍ଞାନାଦି ଶକ୍ତିର ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍ଟ । ଏ ମହାପୁରୁଷେରା ଆବେଶାବତାର । ବିଷ୍ଣୁର ଦଶାବତାରେର କଥା ବଲା ହ୍ୟେଛେ । ଏହା ହଲେନ- ମଂସ୍ୟ, କୂର୍ମ, ବରାହ, ନୃସିଂହ, ବାମନ, ପରମ୍ଭରାମ, ରାମ (ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର), ବଲରାମ, ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ କଙ୍କି ।

ପୌରାଣିକ କାହିନୀ ଥେକେ ଜାନା ଯାଯ, ବେଦ ପ୍ରଲୟ ପଯୋଧି ଜଳେ ନିମଶ୍ଶ ହଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଂସ୍ୟରୂପ ଧାରଣ କରେ ବେଦ ଉଦ୍‌ଧାର କରେନ । ଏରପର ପୃଥିବୀ ଜଳପ୍ଲାବିତ ହଲେ କୂର୍ମରୂପେ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀକେ ପୃଷ୍ଠେ ଧାରଣ କରେନ । ଏହି କୂର୍ମାବତାର । ପୁନରାଯ ପୃଥିବୀ ଜଳପ୍ଲାବିତ ହଲେ ଭଗବାନ ବରାହରଙ୍କେ ପୃଥିବୀକେ ଦକ୍ଷେ ଧାରଣ କରେନ ।

নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হয়ে তিনি অত্যাচারী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিগুকে বধ করেন এবং রক্ষা করেন ভক্ত প্রহ্লাদকে। তগবান বাসনরূপে অবতীর্ণ হয়ে রাজা বলির দর্প ছূর্ণ করেন। ক্ষত্রিয় প্রতাপে পৃথিবী নিপীড়িত হলে তিনি পরম্পরামুরূপে পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়হীন করেন। অত্যাচারী রাজা রাবণের বিনাশ সাধন করেন শ্রীরামচন্দ্র অবতার। হৃষির বলরাম হল কর্তৃ করে পৃথিবীকে অগ্রহত্যাক করেন। একইসঙ্গে তিনি অন্যায়কেও দমন করেন। বুদ্ধরূপে তিনি অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী ও করুণার নৈতিক শিক্ষায় সকলকে উত্তুজ করার প্রয়াসী হন। কলিযুগের শেষ ভাগে বধন অর্থম ও অসত্যের প্রতাব প্রকট হয়ে উঠবে তখন বিষ্ণু কঙ্কনরূপে অবতীর্ণ হয়ে জগতে ধর্ম ও সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন। অবতারের সংখ্যা অবশ্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, অবতার অসংখ্য। এখানে প্রধানত দশ অবতারের কথা বলা হয়েছে।

দশ অবতারের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি স্বয়ং তগবান। তাই তাঁকে বলা হয় মহা-অবতারী। দশ অবতারের মধ্যে দিয়ে তাঁরই শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। কবি জয়দেব রচিত ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যে কৃষ্ণপ্রশংসিতে বলা হয়েছে-

“বেদকে তুঢি করেছ উকার,  
বহন করেছ পৃথিবীর ভার,  
দশন শিখেরে ধারণ করেছ মেদিনী,  
দৈত্যের অত্যাচার থেকে করেছ তাকে মুক্ত,  
চূর্ণ করেছ ছলে বলির দর্প,  
মুক্ত করেছ ধরণীকে ক্ষত্রিয়ের অত্যাচার থেকে,  
জয় করেছ দুর্জয় দশাননকে,  
শ্যামল করেছ মেদিনীকে হল কর্তৃ করে,  
মুক্ত অন্তরে বিলিরেছ করুণা,  
তুমই আবার আসবে শ্লেষ নিধনকঠে,  
দশমূর্তিধারী হে কৃষ্ণ, তোমাকে প্রণাম।”



সুতরাং মৎস্য, কূর্ম, বামন প্রভৃতি ভগবানের অংশ অবতার। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পূর্ণ অবতার। স্বয়ং তগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, ‘কৃকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ম্’— শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

ଇଶ୍ଵରେର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵରୂପ ମାନୁଷେର ଧାରଗାର ଅତୀତ । ତବେ ଅବତାର ପୂର୍ଣ୍ଣମେ ମାନୁଷ ଇଶ୍ଵରେର ସ୍ଵରୂପ ସମ୍ପର୍କେ କିଛୁଟା ଧାରଗା କରତେ ପାରେ । ଇଶ୍ଵର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ । ଅବତାରଙ୍କପେ ଦେହ ଧାରଣ କରେ ଅସୀଯ, ଅଲଙ୍କୃତ ସ୍ମୃତିମୂଳକ ଧାରଣ କରେ ଥାକେନ । ତାଇ ହିନ୍ଦୁଦେଵ ନିକଟ ଅବତାର ସ୍ଵରୂପ ଭଗବାନେରଇ ଏକ ମୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ । ଆର ଏ ଜନ୍ମଇ ହିନ୍ଦୁରୋ ଅବତାରକେ ଭଗବତ୍-ଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରମ ହିସେବେ ଭକ୍ତି-ପ୍ରକାଶ କରେ ।

ସୁତଗ୍ରାଂ ଦେଖା ଯାଚେ, ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଓ ଦେବ-ଦେଵୀ ଏକଇ ବ୍ରକ୍ଷ ବା ଇଶ୍ଵରେର ପ୍ରକାଶ ବା ସାକାର ରୂପ । ତାଇ ଆମରା ବଲତେ ପାରି, ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ମୂଳତ ଏକେଶ୍ଵରବାଦୀ ।

### ପାଠ ୪ ଓ ୫ : ଚତୁରାଶମ

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ଦୁଇଟି ଦିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରା ଯାଇ : ବ୍ୟବହାରିକ ଓ ପାରମାର୍ଥିକ । ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନେ କର୍ମକାଣ୍ଡେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନେ ଉତ୍ସବନେର ଲଙ୍ଘନ ଥାକେ । ଧର୍ମେର ସଂଜ୍ଞା ଦିତେ ଗିଯେ ଶାନ୍ତି ବଲା ହୁଯେଛେ, ଯା ଥେକେ ଅଭ୍ୟଦୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂସାରିକ ଉତ୍ସବ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ଲାଭ ହୁଯ ତାର ନାମ ଧର୍ମ । ଏ ଥେକେ ବୋବା ଯାଇ, ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ଖାଲିଗଣ ମାନବ ଜୀବନକେ ବିକଶିତ ଓ ସାର୍ଥକ କରେ ତୋଳାର ଜନ୍ୟ ସଚେଷ୍ଟ ହିଲେନ ।



ସାଭାବିକଭାବେ ମାନୁଷେର ଜୀବିତ ଥାକାର ସମୟ ଧରା ହୁଯ ଏକଶତ ବହସର । ଏହି ଶତ ବର୍ଷେର ଜୀବନକେ ଚାରଟି ସ୍ତରେ ବା ଆଶ୍ରମେ ବିଭକ୍ତ କରା ହୁଯ । ପ୍ରତିଟି ବିଭାଗେର ସମସ୍ତୀମାର ଗଡ଼ ପୌଟିଶ ବହର । ପ୍ରଥମ ପୌଟିଶ ବହରକେ ବଲା ହୁଯ ବ୍ରାହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ । ଦ୍ୱିତୀୟ ପୌଟିଶ ବହର ପାର୍ଵତ୍ୟ ଆଶ୍ରମ । ତୃତୀୟ ପୌଟିଶ ବହର ବାନପନ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଶେଷ ପୌଟିଶ ବହରକେ ସନ୍ଧ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ବଲା ହୁଯ ।

### ১. ব্রহ্মচর্যাশ্রম

প্রতিটি আশ্রমেই সুনিদিষ্ট কর্তব্য কর্ম রয়েছে। মানুষের পাঁচ বছর বয়স হলেই তাকে শুরুগৃহে গমন করে ব্রহ্মচর্য জীবন তরু করতে হয়। শুরুর নিকট দীক্ষাবহণ, শুরুর তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করতে হয়। এটাই ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এ আশ্রমে থেকে শিষ্যকে শুরুর নির্দেশে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, আত্মসংযম, পরিশ্রম ও কঠোর জীবনযাপনে অভ্যন্তর হতে হয়।

বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলে শুরুর নির্দেশে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে ব্রহ্মচারী গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করে।

### ২. গার্হস্থ্য আশ্রম

বিবাহের মাধ্যমে সন্তান-সন্ততি জাত এবং তাদের ভৱণ-পোষণসহ পারিবারিক জীবনে প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞ কর্মের অনুশীলন করতে হবে। এই পাঁচটি যজ্ঞ হচ্ছে : পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূত্যজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও খৰিযজ্ঞ। মানুষ জন্মাবহণ করে মাতা-পিতার মাধ্যমে। মাতাপিতার তত্ত্বাবধানে সেবা-শুল্কার্থ বড় হতে থাকে। এই মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা যত্ন কর্মগুলো সন্তানের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এ কর্তব্যগুলো সম্পাদন করে একজন সন্তান পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন করে থাকে। মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রকৃতির দান গ্রহণ করতে হয়।

এই দানের কর্তা বা উৎস হলেন শ্বেত ভগবান। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে ভগবানের মহস্ত ধ্বক্ষিণ। তাই প্রকৃতিদণ্ড বন্ত ভোগ করার সময় মানুষ কৃতজ্ঞ চিত্তে প্রকৃতি ভগবানকে তার ভোগ্যবন্ত নিবেদন করে থাকে। এই কর্মটিকে বলা হয় দৈবযজ্ঞ। ভূত্যজ্ঞ হচ্ছে পার্থিষহ অন্যান্য জীবজন্মের আহার প্রদানসহ নানা প্রকার পরিচর্যা। অভিষি সেবাকে বলা হয় নৃযজ্ঞ। পক্ষাতিগতভাবে বেদসহ প্রয়োজনীয় এছাদি পাঠের ধারা জ্ঞান ও নৈতিকতা অর্জনের প্রচেষ্টাকে বলা হয় খৰিযজ্ঞ। প্রাচীনকালে মুনিবায়িদের নিকট থেকে উক্ত জ্ঞান অর্জন করতে হতো বলে এ যজ্ঞের নাম খৰিযজ্ঞ।

মানুষ সমাজবন্ধ জীব। জীবনের প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যই সমাজের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হয়। মানুষ তার দৈনন্দিন চাহিদা যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট থেকে পেয়ে থাকে। সামাজিক চাহিদার কারণে মানুষ মঠ, মন্দির, উপাসনালয়, বিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপনের মধ্য দিয়ে সেবাধর্ম অনুশীলন করে। এ সমস্ত কর্মের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদন করে। এটিকেই বলা হয় গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ম। ব্রহ্মচর্য শেষে বিবাহ করে সংসারধর্ম পালন গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্গত।



### ୩. ବାନପ୍ରଶ୍ଟ ଆଶ୍ରମ

ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଆସେ ବାନପ୍ରଶ୍ଟ ଆଶ୍ରମେର କଥା । ସେଥାନେ ମାନୁଷ ସଂସାରେ ଦାୟ-ଦାୟିତ୍ବ ସନ୍ତାନେର ଉପର ନ୍ୟକ୍ତ କରେ ନିର୍ଜନ ପରିବେଶେ ଅବସର ଜୀବନଯାପନ କରେ । ଏଥାନେ ସଂସାର ଜୀବନେର ସଙ୍ଗୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ଵାମୀର ସଙ୍ଗେ ଥାକତେ ପାରେନ ତବେ ତାଁଦେର ଜୀବନ ଚର୍ଚାୟ ସଂୟମ, ତ୍ୟାଗ, ନିର୍ଲୋଭ ଆଚରଣେର ବିଧାନ ଥାକେ । ବାନପ୍ରଶ୍ଟେ ବନେ ଯାଉୟାର ବିଧାନ ଥାକଲେଣ ସଭ୍ୟତାର ଅଗ୍ରଗତିତେ ମାନୁଷ ବନବାସୀ ନା ହୁୟେ ଗୁହ ତ୍ୟାଗ କରେ କୋଳୋ ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ ଦେବାତ୍ମା ବା ପୂଜା-ଅର୍ଚନାର ମାଧ୍ୟମେ ବୈରାଗ୍ୟମ୍ୟ ଜୀବନ-ୟାପନ କରତେ ପାରେ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଭଜନ, ପୂଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଜପ, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଭୃତି ଧର୍ମୀୟ କର୍ମେ ମଧ୍ୟ ଥେକେ ବାନପ୍ରଶ୍ଟେର ଜୀବନ ନ୍ତର କାଟାନୋ ଯାଏ ।

### ୪. ସନ୍ଧ୍ୟାସ

ଆଶ୍ରମ ଜୀବନେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଆସେ ସନ୍ଧ୍ୟାସେର କଥା । ଏ ସମୟ ପୌଚାତ୍ର ଥେକେ ଏକଶ ବହୁରେର ମଧ୍ୟେ ଜୀବନ ଧାରଣେର ଶାନ୍ତ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଛେ । ସନ୍ଧ୍ୟାସ ଶବ୍ଦରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ତ୍ୟାଗ । ଏହି ଆଶ୍ରମେ ଏସେ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ଏକାକୀ ଜୀବନଧାରଣ କରବେଳ । ଏ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀଦେର ସଙ୍ଗେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀଓ ଥାକବେଳ ନା । ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ଜାଗତିକ ସକଳ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାତେଇ ମଧ୍ୟ ଥାକବେଳ । ମାତ୍ର ଦୁପୂର ବେଳାର ଆହାରେ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକାଳୟ ଥେକେ ସଂଗ୍ରହ କରବେଳ । ବାକି ଦୁବେଳା ଦୁଧ, ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଘର୍ଷ କରେ ସର୍ବ ପରିମାଣେ ଆହାର କରବେଳ । ଆଶ୍ରଯହୀନ ଅବସ୍ଥାଯ ମନ୍ଦିରେ ଦେବାଲୟେ କ୍ଷଣକାଳେର ଜନ୍ୟ ଆଶ୍ରଯ ନିତେ ପାରେନ । ପୋଶାକ-ପରିଚଛଦ ଥାକବେ ନିତାନ୍ତରେ ସାଧାରଣ । ଅତୀତ ଜୀବନେର ସ୍ମୃତି ସବ ପରିହାର କରେ ଏକ ମନେ ଏକ ଧ୍ୟାନେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାୟ ମଧ୍ୟ ଥାକବେଳ । ଶାନ୍ତବଚଳେ ଜାଳା ଯାଏ ‘ଦୁଷ୍ଗ୍ରହଗମାତ୍ରେଣ ନରୋ ନାରାୟଣୋ ଭବେତ’ । ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରଲେଇ ମାନୁଷ ନାରାୟଣ ବା ଦେବତା ହୁୟେ ଯାଏ । ତବେ ସନ୍ଧ୍ୟାସେର ମୂଳ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ହଚ୍ଛେ କର୍ମଫଳାସଙ୍କି ଓ ଭୋଗାସଙ୍କି ତ୍ୟାଗ । ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାଯ ବଲା ହେଁବେ-

ଅନାଶ୍ରିତଃ କର୍ମଫଳଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରମ୍ଭ କରୋତି ସଃ ।

ସ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ଚ ଯୋଗୀ ଚ ନ ନିରାପିନ୍ ଚାତ୍ରିଯଃ ॥ (୬/୧)

ଅର୍ଥାତ୍, କର୍ମଫଳେର ବାସନା ନା କରେ ଯିନି କର୍ତ୍ତବ୍ୟକର୍ମ କରେନ, ତିନିଇ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ, ତିନିଇ ଯୋଗୀ । ଶୁଦ୍ଧ ଗୃହାଦି କର୍ମ ବା ଶରୀର ଧାରଣେର ଉପକରଣ ସଂଘରେ କର୍ମତ୍ୟାଗଇ ସନ୍ଧ୍ୟାସ ନଯ ।

ଶାନ୍ତୀୟ ଯୁଗବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ କଲିଯୁଗ । ଏ ସମୟେ ବ୍ରକ୍ଷାର୍ଚ୍ୟ, ଗାର୍ହିଷ୍ୟ, ବାନପ୍ରଶ୍ଟ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାସ ଏ ଚାର ଆଶ୍ରମେର ଅନୁଶୀଳନ ସମ୍ଭବ ନଯ । ବର୍ତ୍ତମାନେ ବ୍ରକ୍ଷାର୍ଚ୍ୟ ଓ ବାନପ୍ରଶ୍ଟ ଆଶ୍ରମ ନେଇ ବଲଲେଇ ଚଲେ । ବ୍ରକ୍ଷାର୍ଚ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଛାତ୍ର ଜୀବନେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଁବେ । ଗାର୍ହିଷ୍ୟ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାସ ଏ ଦୁଟି ଆଶ୍ରମ ଲକ୍ଷ କରା ଯାଏ । ତବେ ଗାର୍ହିଷ୍ୟ ଜୀବନେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ମାତା, ପିତା ଏଦେର ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ବାନପ୍ରଶ୍ଟ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣେ ଉତ୍ସାହିତ କରା ହେଁ ନା । ତାଇ କଲିଯୁଗେ ଗାର୍ହିଷ୍ୟ ଆଶ୍ରମେ ଥେକେ ଜୀବନଯାପନ କରାଇ ଭାଲୋ । ଏତେଇ ମାନୁଷେର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଁ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣମ୍ୟ ହେଁ ।

### ପାଠ ୬ ଓ ୭ : ଯୋଗେର ଧାରଣା

ଯୋଗସାଧନା ମୁକ୍ତିଲାଭେର ଏକଟି ବିଶେଷ ଉପାୟ । ‘ଯୋଗ’ ଶବ୍ଦଟି ସାଧାରଣଭାବେ ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥି ବ୍ୟକ୍ତ କରେ । ଏକେର ସଙ୍ଗେ ଅପରେର ସଂଯୋଗକେ ସଂକ୍ଷେପେ ଯୋଗ ବଲା ହେଁ । କିନ୍ତୁ ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରେ ଏହି ଯୋଗେର ଅର୍ଥ ଆରା ଗଭୀରେ ନିହିତ । ଜୀବାତ୍ମାର ସଙ୍ଗେ ପରମାତ୍ମାର ସଂଯୋଗଇ ଯୋଗସାଧନା । ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାଯ ଏବଂ ଫର୍ମା-୪, ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଓ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା-୯୮-୧୦ୟ

পতঙ্গলির যোগ দর্শনে বলা হয়েছে- ‘যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ’। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলা হয়। মোক্ষ লাভের জন্য প্রথমে প্রয়োজন আত্মাপলব্ধি। আর এই আত্মাপলব্ধির জন্য প্রয়োজন শুদ্ধ, স্থির ও প্রশান্ত মন বা চিত্তের স্থিতা।

মনকে শুদ্ধ ও শান্ত করার জন্য যোগদর্শনে আট প্রকার সাধনপ্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে; যেমন- ১. যম ২. নিয়ম ৩. আসন ৪. প্রাণায়াম ৫. অত্যাহার ৬. ধারণা ৭. ধ্যান ও ৮. সমাধি। এই আট প্রকার যোগাঙ্গ অনুশীলন করে একজন যোগী মুক্তিলাভ করতে পারেন। যোগাঙ্গলোর পরিচয় নিচে বর্ণনা করা হলো :

**১. যম :** ‘যম’ শব্দটি মূলত সংযম অর্থ প্রকাশক। মুক্তিলাভের জন্য সাধক দৈনন্দিন জীবনে আচার-আচরণে সংযমী হবেন। তাকে অহিংসা, সত্য, অস্ত্রেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ - এ পাঁচটি বিষয়ের অনুশীলন করতে হবে। এই পাঁচটিকে বলা হয় যম। দেহ, মন ও বাক্যের দ্বারা কোনো জীবকে হত্যা না করা বা নির্যাতন না করাকে বলে অহিংসা। যোগী পুরুষ বাক্যে কর্মে সত্যনিষ্ঠ হবেন। কখনো মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করবেন না। আবার অস্ত্রেয় বলতে বোঝায় অপরের জিনিস চুরি না করা। মনে যেন চুরি করার ইচ্ছাও না জাগে। সে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করতে হবে। বিনা প্রয়োজনে কোনো দ্রুব্য গ্রহণ করা যাবে না, একে বলা হয় অপরিগ্রহ।

**২. নিয়ম :** শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্঵র প্রণিধান এই পাঁচটি অনুষ্ঠান নিয়মের অঙ্গসূক্ষ্ম। শৌচ দুই প্রকারের : বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ। স্নানদির মাধ্যমে দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাহ্যিক শৌচ লাভ হয়। আবার সৎ চিন্তা, মৈত্রী, দয়া প্রভৃতি ভাবনার দ্বারা অভ্যন্তরীণ শৌচ লাভ হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে যা পাওয়া যায় তাতে সন্তুষ্ট থাকাই সন্তোষ। আবার শ্রদ্ধার সাথে শান্ত নির্ধারিত ব্রত উদ্যাপন করাকে বলে তপস্যা। বেদাদি ধর্মশাস্ত্র নিয়মিত অধ্যয়ন করাই স্বাধ্যায়। ঈশ্বরকে সর্বক্ষণ চিন্তা করার নাম ঈশ্বর প্রণিধান।

**৩. আসন :** দেহ ও মনকে সুস্থ ও স্থির রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেহভঙ্গি বা দেহাবস্থানকে বলে আসন। যোগ সাধনায় আসন অনুশীলন একটি শুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আসন রয়েছে অনেক প্রকারের, যেমন- পদ্মাসন, বঞ্চাসন, গোমুখাসন ইত্যাদি। এই আসন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যোগীপুরুষ নিজ দেহ ও মনকে ঈশ্বর চিন্তায় নিবিষ্ট করার যোগ্যতা অর্জন করে। তবে কোনো শুরু বা যোগীর নিকট এই আসন প্রক্রিয়া শিক্ষা করা দরকার। তা না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। অবেজ্ঞানিকভাবে আসন অভ্যাসে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

**৪. প্রাণায়াম :** শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিকে নিয়ন্ত্রণ এবং নিজ আয়ন্ত্রে আনাই প্রাণায়াম। প্রাণায়াম তিন প্রকার। যেমন- রেচক, পূরক এবং কুষ্টক। শ্বাস ত্যাগ করে সেটি বাইরে স্থির রাখার নাম রেচক। শ্বাস গ্রহণের নাম পূরক। নিয়মিত গতিরোধ করে শ্বাস ভিতরে দীর্ঘ সময় রক্ষণ রাখার নাম কুষ্টক। এই প্রাণায়াম যোগের অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রাণায়ামে যেমন সুফল পাওয়া যায় তেমনি জ্ঞতির সম্ভাবনা থাকে। তাই অভিজ্ঞ শুরু নিকট প্রাণায়াম শিক্ষা করতে হয়।

୫. ଅତ୍ୟାହାର : ଦେହେର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟ ହତେ ଯୁକ୍ତ କରେ ଚିତ୍ତେର ଅନୁଗାମୀ କରାର ନାମ ଅତ୍ୟାହାର । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟ ହତେ ଯୁକ୍ତ କରା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବଟେ କିନ୍ତୁ ଅସାଧ୍ୟ ନାୟ । ଦୃଢ଼ ସଂକଳନ ଓ ଅଭ୍ୟାସେର ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଲୋକେ ଅନୁମୁଦୀ କରା ଯାଇ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଲୋ ଅନୁମୁଦୀ ହେଲେ ଚିତ୍ତେ ବିଷୟ-ଆସନ୍ତି ନଟ ହୁଏ । ଏମତାବହ୍ନାୟ ଚିତ୍ତ ଆରାଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତେ ନିବିଟି ହତେ ପାରେ ।

୬. ଧାରଣା : ଅଭିତ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟବଞ୍ଚିତେ ମନକେ ଧାରଣ ବା ଛାପିତ କରାର ନାମ ଧାରଣା । ସମ୍ପଦ ବାହ୍ୟବଞ୍ଚ ପରିହାର କରେ ମନ ବା ଅଭିନ୍ଦିତକେ ବ୍ରଦ୍ଧାବଞ୍ଚିତେ ଛାପନ କରତେ ହେବେ । ଏର ଦ୍ୱାରା ଯୋଗୀର ଚିତ୍ତ ସୁଶ୍ରମିତ ହୁଏ ।



୭. ଧ୍ୟାନ : ଧାରଣା ଓ ଧ୍ୟାନ ଦୁଇଟି ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଯୁକ୍ତ । ଧାରଣାର ଦ୍ୱାରା ମନକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିତେ ଛିର ରାଖା ଯାଇ । ଧାରଣାର ସେ ଛିର ଅବହ୍ଵାତି ଧ୍ୟାନେ ଆରୋ ନିବିଡ଼ ହୁଏ । ଯେ ବିଷୟେ ମନକେ ଛିର ରାଖା ହେଯେ ତେ ବିଷୟେ ଅବିଚିନ୍ନ ଭାବନାକେ ଧ୍ୟାନ ବଲେ । ଅବିଚିନ୍ନ ଧାରଣାଇ ଧ୍ୟାନ । ପରମତତ୍ତ୍ଵକେ ଉପଲକ୍ଷି କରାର ଜନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

୮. ସମାଧି : ଯୋଗ ସାଧନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ସମାଧି । ଧାରଣା ମନକେ ଅଭିଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୌଛାନୋର ସୁଯୋଗ କରେ ଦେଇ, ଆର ଧ୍ୟାନେ ସେ ସୁଯୋଗ ଅବିଚିନ୍ନ ଥାକେ । ସମାଧିତେ ଏସେ ଯୋଗୀର ଧ୍ୟାନଲଙ୍ଘ ଚିତ୍ତେ ଛିରତା ଆରୋ ଗଭୀର ହୁଏ । ସମାଧିତେ ଯୋଗୀର ଚିତ୍ତ ଆରାଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଲୀନ ହେଯେ ଯାଇ । ତେ ସମୟ ଯୋଗୀର ଚିତ୍ତଟି ଛିର ନିକ୍ଷିଯ ଅବହ୍ଵାୟ ଉନ୍ନିତ ହୁଏ । ତଥନ ଧ୍ୟାନ-କର୍ତ୍ତା, ଧ୍ୟାନେର ବିଷୟ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ତିନଟି ମିଶ୍ରିତ ହେଯେ ଏକାକାର ହେଯେ ଯାଇ । ଏହି ଏକାକାର ଅବହ୍ଵାୟ ଧ୍ୟାନୀର ନିଜକ୍ଷତି କୋଣୋ ଅନୁଭୂତି ଥାକେ ନା; ଆରାଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିର ସଙ୍ଗେ ଏକିଭୂତ ହେଯେ ଯାଇ । ଏଟାଇ ସମାଧିର ଚରମ ଅବହ୍ଵାୟ ।

ଉଚ୍ଚ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ୍ୟୋଗେର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦୁଇଭାଗେ ଭାଗ କରା ଯାଇ- ବହିରଙ୍ଗ ସାଧନ ଏବଂ ଅନୁରଙ୍ଗ ସାଧନ । ସମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ଅତ୍ୟାହାର ଏହି ପାଂଚଟିକେ ବଲା ହୁଏ ଯୋଗ ସାଧନାର ବହିରଙ୍ଗ ସାଧନ; ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧିକେ ବଲା ହୁଏ ଅନୁରଙ୍ଗ ସାଧନ । ଯୋଗସାଧନାର ମାଧ୍ୟମେ ଯୋଗୀ ଯୁକ୍ତ ଲାଭ କରେ ଥାକେନ ।

### ପାଠ ୮ ଓ ୯ : କର୍ମଯୋଗ

ମାନବ ଜୀବନେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣି ଇଶ୍ୱର ବା ମୋକ୍ଷଲାଭ । ଧ୍ୟିଗଣ ଏହି ମୋକ୍ଷଲାଭେର ଉପାୟ ହିଁବେ ତିନଟି ସାଧନ ପଥେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଯେ ଗେଛେନ । କର୍ମଯୋଗ, ଭକ୍ତିଯୋଗ, ଭକ୍ତିଯୋଗ ଏହି ସାଧନ ପଦ୍ଧତିଗୁଲୋର ଯେ କୋଣୋ ଏକଟି ନିର୍ଣ୍ଣାର ସଙ୍ଗେ ଅନୁଶୀଳନ କରେ ଏକଜନ ସାଧକ ମୋକ୍ଷଲାଭ କରତେ ପାରେନ ।

୧୯ ଯା କିଛୁ କରା ହୁଏ ତାକେହି ବଲେ କର୍ମ । ଆମରା ପ୍ରତିନିଯତ ଜୀବନ ଧାରଣେର ଜନ୍ୟ ସେ-କାଜ କରି ତୋର ସକଳଟି କର୍ମ । କର୍ମ ଦୂରକର୍ମ- ସକାମ କର୍ମ ଓ ନିକାମ କର୍ମ । ଯଥନ ବିଶେଷ କୋଣୋ ଫଲେର ଆଶାୟ କର୍ମ କରା ହୁଏ ତଥନ

তাকে বলে সকাম কর্ম। অর্থাৎ, কামনা বাসনা যুক্ত কর্ম। এই কর্মে কর্মকর্তার কর্তৃত্বের অভিমান থাকে, ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে; এমন বোধ হয় আমি কর্ম করছি, আমি কর্মের কর্তা, কর্মের ফলও আমিই ভোগ করব। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম ভিন্ন রকম। এখানে কর্তা কর্ম করেন কোনো রকম ফলের আশা না নিয়ে। তিনি মনে করেন কর্মের কর্তা আমি নই, কর্মফলও আমার নয়। নিষ্কাম কর্মের ফল কর্মকর্তাকে স্পর্শ করে না। এই নিষ্কাম কর্মই যোগ সাধনার ক্ষেত্রে কর্মযোগ। সকাম কর্মে বদ্ধন হয়; আর নিষ্কাম কর্মে ঘোষ্কলাভ হয়। কর্মকে যোগে পরিণত করে তা অনুশীলন করলে অভিষ্ঠ ঘোষ্কলাভ সম্ভব।

বৈদিক যুগে সকাম কর্মের সর্বোচ্চ ফলপ্রাপ্তি হিসেবে স্বর্গ লাভের কথা জানা যায়। পুণ্যফল ভোগের শেষে স্বর্গ থেকে চলে এসে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। ‘ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকৎ বিশন্তি’ (গীতা)- পুণ্য ক্ষয় হলে মানুষ পুনরায় মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। এ অবস্থায় মানবজীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ ঘোষ্কলাভ সম্ভব হয় না। তাই উপনিষদের খরিণগ কর্ম ত্যাগ করে সন্ধ্যাস গ্রহণের উপদেশ দেন। তাঁদের বক্তব্য - কর্ম করলেই কর্মফল উৎপন্ন হবে। এই কর্মফল ভোগের জন্য কর্মকর্তাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবক্ষ হতে হয়। এর থেকে উক্তার পাওয়ার জন্য সন্ধ্যাস গ্রহণ আবশ্যিক। এটা হচ্ছে সন্ধ্যাসবাদীদের মত।

দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসে উক্ত সন্ধ্যাসবাদীদের মত খণ্ডন করে বললেন, ঘোষ্কলাভের জন্য কর্মত্যাগের প্রয়োজন নেই। দেহধারী জীবের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে কর্মকে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। যাঁরা ঘুষ্কলাভের প্রত্যাশায় জাগতিক কর্মকাণ্ড ত্যাগ করেন, তাঁরাও কিন্তু আধ্যাত্মিক কর্ম অনুশীলন করতে থাকেন। ঘুষ্কলাভের সোপান হিসেবে সংঘম, নিয়ম, আসন ইত্যাদি অষ্টাঙ্গ যোগ অনুশীলন করেন; ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভের জন্য শ্রবণ, মনন, আসন প্রভৃতি কর্ম তাদের চলতেই থাকে। তাহলে ঘুষ্কিকামী সন্ধ্যাসীগণও কর্মকে একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেন না।

কর্মই জীবন। জীবন ধারণের জন্য কর্ম করতেই হবে। তবে এই আবশ্যিক কর্মের মাধ্যমে মানুষ ঘুষ্কলাভ করতে পারে না। কর্মকে যোগে বা নিষ্কাম কর্মে পরিণত করতে হবে। মনে করতে হবে বিশ্ব জগৎ ঈশ্঵রের বিবাট কর্মক্ষেত্র। এই কর্মক্ষেত্রে সর্বক্ষণ ঈশ্বরেরই কর্ম হচ্ছে। আর এই কর্ম করার জন্য ঈশ্বর জীবদের নিয়োগ করেছেন। তবে ফলের আশায় নয়। ঈশ্বরের নিয়োজিত ব্যক্তি হিসেবে কর্ম করা। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত এই কর্মই কর্মযোগ। কর্মফলকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-  
‘কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেন্মু কদাচন।  
মা কর্মফলহেতুভূমা তে সঙ্গোহস্তকর্মাপি ॥’ (২/৪৭)

অর্থাৎ, কর্মে তব অধিকার, ফলে কভু নয়। ফলাসক্তি ত্যাগ কর, কর্ম ত্যাজ্য নয়॥  
কর্মযোগের নির্দেশ হচ্ছে-

কর্মফল যেন তোমার কর্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়,  
কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

১. কর্মকর্তাকে কর্মফল ঈশ্বরে সম্পর্ণ করতে হবে। আমি কর্ম করছি, এরূপ অনুভূতি থাকবে না।
২. প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্ম অবশ্যই নিষ্পত্তি করতে হবে।
৩. ফলের আশা ত্যাগ করে কর্ম করতে হবে।
৪. এরূপ কর্মে কর্মকর্তা অন্তরে অনাবিল আনন্দ লাভ করেন।

৫. তখন ভগবানের প্রতি ভক্তির উদয় হয় এবং এভাবে কর্মানুশীলন করতে করতে স্টিপ্রানুগ্রহে মানুষের মুক্তিলাভ হয়ে থাকে।

### পাঠ ১০ ও ১১ : জ্ঞানযোগ

মোক্ষলাভের অন্যতম উপায় হচ্ছে জ্ঞানযোগ। জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা পরম সত্ত্বায় উপনীত হওয়ার পদ্ধতি জ্ঞানযোগ। শাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব ও পরমার্থতত্ত্ব জ্ঞানাকে জ্ঞান বলা হয়েছে। আর জ্ঞানের পথে



স্টাকে জ্ঞানার যে সাধনা তাকে বলে জ্ঞানযোগ। জ্ঞানী জগৎ ও জীবের প্রকৃতি ও পরিণতি জেনে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্টাকে অঙ্গের অনুভব করেন। তিনি উপলক্ষ্মি করেন, তাঁর নিজের মধ্যে এবং বিশ্বের সকল প্রাণীর মধ্যে একই চেতনা অবস্থান করছে। জগতের সবকিছু সেই পরম চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যময়। এই চৈতন্যই আত্মা বা জীবাত্মা।

জ্ঞানী আরও উপলক্ষ্মি করেন, প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে জীবাত্মা রয়েছে, তা বিশ্ব আত্মা বা পরমাত্মা। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে পরমাত্মার অবস্থান ধরা পড়ে বিশ্ব চরাচরের মধ্যে। তবে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সেই পরমতত্ত্ব ধরা পড়ে না। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, স্মৃতির মায়া শক্তি দ্বারা জীব আচ্ছন্ন থাকে। তার নিকট আত্মতত্ত্ব বা পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। তবে ইশ্বর-অনুগ্রহে যখন মায়ার প্রভাব কেটে যায় তখন জীব আত্মতত্ত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে। এভাবে তার সর্বত্র সমবুদ্ধি জন্মে, বাসনা শুক্র হয়, সুন্দর হয় তার আচরণ। তখন সাধকের অহংকার থাকে না, হিংসা থাকে না। গুরুসেবা, দেহ-মনে পরিত্র থাকা, জ্ঞানের বিষয়ে জ্ঞানার আগ্রহ, ক্ষমা-এ সকল শুণ তার মধ্যে প্রকাশ পায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানীর বিশটি লক্ষণের উল্লেখ রয়েছে। জ্ঞানী কর্মতত্ত্ব উপলক্ষ্মি করে থাকেন। তাই তার কর্ম হয় নিষ্কাম। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জ্ঞানযোগ অধ্যায়ে কর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনটি কথা রয়েছে— কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম। শাস্ত্রবিহিত যে সকল কর্ম করতে হয় সেগুলোকে বলে কর্ম। আর যা শাস্ত্র নিষিদ্ধ সেগুলো হচ্ছে বিকর্ম। আর কোনো কাজ না করাকে বলা হয় অকর্ম। কর্মতত্ত্ব গহীন অরণ্যের মতো। সেখানে জ্ঞানী তাঁর

জ্ঞানালোকে কর্তব্যকর্ম নির্ণয় করে থাকেন। জ্ঞান অনুশীলনে মানুষের সমস্ত রকম দৃঃখ, তাপ দূর হয়। ভক্ত মাত্রই ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র হলেও গীতায় জ্ঞানী ভক্তই ভগবানের বেশি প্রিয় (গীতা, ৭/১৭)। জ্ঞান অর্জনের জন্য গীতার নির্দেশ হচ্ছে তত্ত্বদর্শী শুরূর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম বন্দনা করতে হবে, সেবা কর্ম দ্বারা তাঁকে তুষ্ট করতে হবে এবং বিনীতভাবে তাঁকে প্রশ্ন করতে হবে। সেবা কর্মে তুষ্ট আত্মতত্ত্বজ্ঞ গুরুর তখন জ্ঞানপ্রার্থীকে উপদেশ দিয়ে থাকেন। জ্ঞান লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে-

শ্রদ্ধাবান্ম লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিযঃ ।

জ্ঞানং লক্ষ্মা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ (৪/৩৯)

অর্থাৎ, যিনি শ্রদ্ধাবান, একনিষ্ঠ সাধন তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয়, তিনি জ্ঞান লাভ করেন। আত্মজ্ঞান লাভ করে শীঘ্রই তিনি পরম শান্তি লাভ করেন।

সংক্ষেপে জ্ঞানযোগের ফল হচ্ছে :

১. জ্ঞান পরম পবিত্র। সকল অপবিত্রতাকে দূর করে দেওয়ার ক্ষমতা জ্ঞানের রয়েছে।
২. জ্ঞানীর পাপ বিনষ্ট হয়। জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানতা থাকতে পারে না।
৩. জ্ঞানীর কর্ম বন্ধন থাকে না। তাই জ্ঞানী পরম সুখে অবস্থান করেন। জ্ঞান লাভের জন্য আমরা সবাই যত্নশীল হব।

## পাঠ ১২ ও ১৩ : ভক্তিযোগ

ভক্তিকে অবলম্বন করে যে ঈশ্বর আরাধনা তাকে ভক্তিযোগ বলে। ভক্তিকে অবলম্বন করে ভগবানের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করা ভক্তিযোগ। ভক্তির অশেষ শক্তি, ভক্তিতেই মুক্তি। ভক্তি মানব হৃদয়ের একটি সুকুমার বৃত্তি।

নারদীয় ভক্তি সূত্রে বলা হয়েছে— ভগবানে ঐকান্তিক প্রেম বা ভালোবাসাকে ভক্তি বলে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভাবকে ভক্তি বলে। শাঙ্খিল্য সূত্রে ভক্তির লক্ষণ সমস্তে বলা হয়েছে— ভগবানের পদে যে একান্ত রতি, তারই নাম ভক্তি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। এর আগে কর্মজ্ঞানের কথা, ভগবানের বিভূতি ও বিশ্বরূপের পরিচয় পাওয়া গেছে। অর্জন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সংগৃহ ঈশ্বর, নির্গুণ ঈশ্বর সমস্তে জেনেছেন।



দ্বাদশ অধ্যায়ের শুরুতে অর্জনের মনে প্রশ্ন জেগেছে— নির্গুণ, নির্বিশেষ, অরূপ ব্রহ্মের সাধনা আর ব্যক্তি ঈশ্বরকে সাকাররূপে আরাধনা করার মধ্যে কোনটি উত্তম পথ? উত্তরে ভগবান বলেছেন, সাধনার উভয় পথেই ক্লেশ আছে। তবে অব্যক্ত ব্রহ্মচিন্তার চেয়ে সগুণ মূর্তিমান সাকার ঈশ্বরের আরাধনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ঈশ্বরকে যাঁরা সাকারে শুণময়রূপে আরাধনা করেন তাঁরাই মূলত ভক্তি পথের সাধক। ভক্তিকে অবলম্বন করে যিনি সাধনা করেন তিনিই ভক্ত। ভক্ত সমস্তে গীতায় বলা হয়েছে— যে ব্যক্তি আসক্তি, ভয় ও

କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ କରେ ଈଶ୍ଵରର ଶରଣାପତ୍ର ହନ, ତିନି ଭଗବଦ୍ଭାବ ଲାଭ କରେନ । ତାର ପାପ ତାପ ଦୁଃଖ ବେଦନା ଥାକେ ନା । ଭକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନେର ଅନୁଗ୍ରହ ପେଯେ ଥାକେନ । ଭଗବାନେର ଶ୍ରୀଚରଣେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣଇ ଭକ୍ତିଯୋଗେର ପ୍ରଧାନ କଥା । ତବେ ମନେ ରାଖା ପ୍ରଯୋଜନ, ଏ ଭକ୍ତିର ମୂଳେ ଥାକବେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ- ଈଶ୍ଵର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତିନି କରଣାମୟ, ତିନି ଭକ୍ତବାଙ୍ଗୀ-କଞ୍ଚାତରକ ।

ଗୀତାଯ ବହୁବିଧ ସାଧନ ପଥେର ଉତ୍ତରେ ରାଯେଛେ । ସେ ସକଳ ପଥେ ସାଧନାୟ ନିଷ୍ଠା ଥାକଲେ ଈଶ୍ଵରର କରଣ ଲାଭ କରା ଯାଯ । ତବେ କର୍ମଯୋଗେର ବା ଜ୍ଞାନଯୋଗେର ଯେ ପଥେଇ ସାଧକ ହୋନ ନା କେନ, ସକଳ ପଥେଇ ଈଶ୍ଵରର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରା ସମ୍ଭବ । ଗୀତାଯ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଲେଛେ-

‘ଯେ ସଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟତ୍ତେ ତାଙ୍କୁଥିବ ଭଜାଯହୁମ ।  
ମୟ ବର୍ଜାନୁବର୍ତ୍ତତ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟାଃ ପାର୍ଥ ସର୍ବଶଃ ॥’ (8/11)

-ହେ ପାର୍ଥ, ଯେ ଆମାକେ ଯେତାବେ ଉପାସନା କରେ, ଆମି ତାକେ ସେତାବେଇ ତୁଟ୍ଟ କରି । ମାନବଗଣ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ଆମାର ପଥଇ ଅନୁସରଣ କରେ । ଅର୍ଥାତ୍, ମାନବଗଣ ଯେ ପଥଇ ଅନୁସରଣ କରୁକ ନା କେନ, ସକଳ ପଥେଇ ଆମାତେ ପୌଛିବେ ପାରେ ।

ଭକ୍ତିଯୋଗେ ଭକ୍ତେର ଚିନ୍ତା ଭଗବାନେର ଅଶେଷ କରଣ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରାୟ ଥାକେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ । ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନକେ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟହୁଲ ମନେ କରେନ । ଭଗବାନ ଏକମାତ୍ର ଗତି । ଏହି ଅନୁଭୂତି ନିଯେ ଭଗବାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣଇ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ପ୍ରଧାନ ତାବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଭଗବାନେ ଶରଣାଗତି ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭକ୍ତିଯୋଗେର ସାର କଥା ।

ନ୍ତୁନ ଶବ୍ଦ- ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଯୋଗ, ଚତୁରାଶ୍ରମ, ଏକେଶ୍ଵରବାଦ, ଅବତାରତତ୍ତ୍ଵ, ଜ୍ଞାନଯୋଗ, କର୍ମଯୋଗ, ଭକ୍ତିଯୋଗ ।

## ଅନୁଶୀଳନୀ

ବହୁନିର୍ବାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ :

୧ । ଜୀବାଜ୍ଞାର ସଜେ ପରମାଜ୍ଞାର ସଂଯୋଗକେ କୀ ବଲେ?

- |               |             |
|---------------|-------------|
| କ. ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର | ଘ. ଯୋଗସାଧନା |
| ଗ. ଯୋଗ ଦର୍ଶନ  | ଘ. ଯୋଗାଙ୍ଗ  |

୨ । ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶଦେର ଅର୍ଥ କୀ?

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| କ. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରାପେ ତ୍ୟାଗ | ଘ. କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ      |
| ଗ. ଗୃହତ୍ୟାଗ             | ଘ. ଭୋଗାକାଙ୍କ୍ଷା ତ୍ୟାଗ |

୩ । ଗାର୍ହଶ୍ୟ କଲିଯୁଗେର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ସମ ଆଶ୍ରମ, କାରଣ-

- ଏର ମଧ୍ୟେ ଥେକେ ମାନୁଷ ସମାଜେର ପ୍ରତି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଲନ କରେ ।
- ଜାଗତିକ ସକଳ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ କେବଳ ଈଶ୍ଵର ଚିନ୍ତାତେଇ ମଧ୍ୟ ଥାକେନ ।
- ଏତେ ମାନୁଷେର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ଓ କଳ୍ୟାନମୟ ହୁଏ ।

নিচের কোনটি সঠিক?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii  | খ. ii ও iii    |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি গড় এবং ৪, ৫ ও ৬ নং থ্রৈর উভয় দাও :

গোবিন্দ বাবু একজন সাধারণ গৃহস্থ। সৎসারে সন্তান প্রতিপালন ও অর্থ উপার্জন সকল ক্ষেত্রেই তিনি ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ করে কর্ম করার চেষ্টা করেন। এটাই তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু মাঝে মাঝে বৃক্ষ বয়সে তাঁর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাঁর সন্তানরা নেবে কিনা এটা ভেবেও শক্তি হন।

৪। ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণে গোবিন্দ বাবুর মূল লক্ষ্য ছিল কোনটি?

- |          |          |
|----------|----------|
| ক. ভান   | খ. ভক্তি |
| গ. মোক্ষ | ঘ. কর্ম  |

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ক. i      | খ. ii       |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

৬। গোবিন্দ বাবুর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ার কারণ কী?

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| ক. বিষয়প্রীতি               | খ. সন্তানপ্রীতি              |
| গ. ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার চিন্তা | ঘ. ঈশ্বর সাধনায় মনোযোগহীনতা |

সূজনশীল প্রশ্ন :

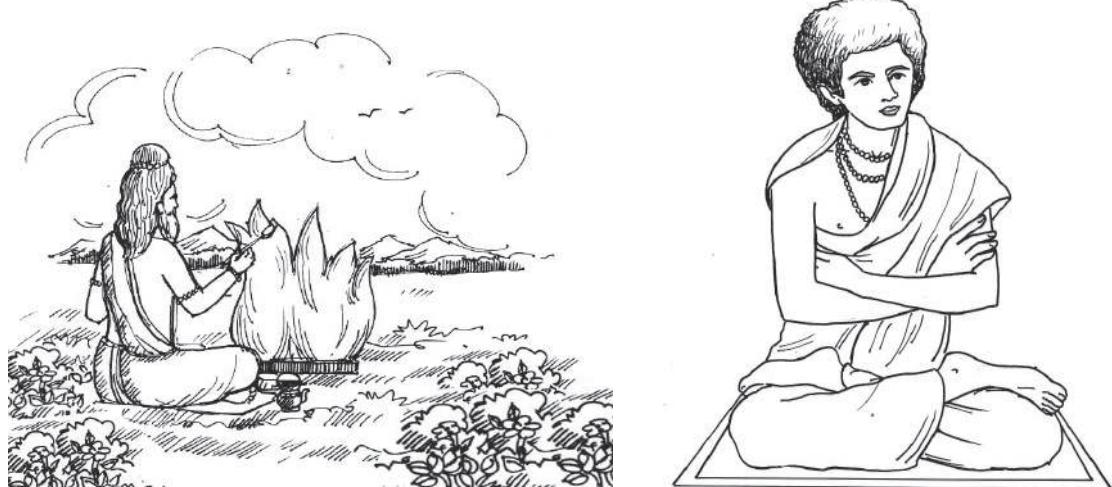
বিজেন্দ্রনাথ একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁর বয়স ৭৫ বছর। তিনি সৎসারে থেকেও অত্যন্ত সংযমী। তিনি সৎসারের সমস্ত দায়িত্ব পূর্ণের হাতে অর্পণ করে মন্দিরে মন্দিরে ঈশ্বর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। এতেও তাঁর আত্মাত্তি হয় না বিধায় তিনি জীবনের পরম প্রাণির উদ্দেশ্যে সৎসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।

- ক. একেশ্বরবাদ কী?
- খ. প্রত্যাহার বলতে কী বোঝায়?
- গ. বিজেন্দ্রনাথ সৎসারে থেকে জীবনের কোন স্তরে অবস্থান করছেন তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘জীবনের পরম প্রাণি শাতে বিজেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তটি ছিল মৌকিক।’— তোমার উভয়ের সপক্ষে যুক্তি দাও।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

বিশ্বে প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্ম অন্যতম প্রাচীন ধর্ম। এর প্রাচীন নাম সনাতন ধর্ম। এই সনাতন ধর্মের নির্দিষ্ট প্রবর্তকরণে কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করা যায় না। এ ধর্মের মূলে রয়েছেন ভগবান স্বয়ং। জগৎ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এ ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। তবে মানব সভ্যতার কোন বিস্তৃত অতীতে হয়ত কোন আদিম মানবের মনে প্রথম ধর্মবোধ জেগে ওঠে। সেখান থেকে এ ধর্মের যাত্রা শুরু।



মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে এ ধর্মের বিকাশ ও প্রসার লক্ষণীয়। বহিরাগত আর্য সম্প্রদায়ের ধর্মতের সঙ্গে প্রাগীর্য ধর্মতের সংশ্লেষণে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। হিন্দুধর্ম চিত্তায় একেশ্বরবাদ, অবতারবাদ, ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি হিসেবে দেব-দেবীর উপাসনা ও পূজা পদ্ধতির পরিচয় মেলে। ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বেদ, উপনিষদ (বেদান্ত), পুরাণ, গীতা, ভাগবতের প্রকাশ ঘটে এবং দার্শনিক চিত্তায়ও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতেও সনাতন ধর্মের সংস্কার ও ধর্মসাধনার নব নব রূপ লক্ষণীয়। রাজা রামমোহন রায়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রভু জগদ্গুরু, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, বাবা লোকনাথ, হরিচাঁদ ঠাকুর, স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ, এ.সি. ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রমুখ ধর্মগুরুর গৌরবময় অবদান হিন্দুধর্মকে আধুনিকতার পরিম্পলে উন্নীত করেছে। এঁদের সকলের প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্ম বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে।

এ অধ্যায়ে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে এবং বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম প্রচার, সংস্কার ও বিকাশে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে পারব
- বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম তথা সনাতন ধর্ম প্রচার, সংস্কার ও বিকাশে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব
- হিন্দুধর্মের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে তা সমৃদ্ধত রাখতে উদ্বৃদ্ধ হব।

### ପାଠ ୧ : ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମବିକାଶ

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଅପର ନାମ ସନାତନ ଧର୍ମ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେ ପ୍ରଚଲିତ ଧର୍ମସମୂହର ମଧ୍ୟେ ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମ ତଥା ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଏକାଧାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ନବୀନ । ପ୍ରାଚୀନ ଏ କାରଣେ ଯେ, ସନାତନ ଧର୍ମ ତାର ସନାତନ ଐତିହ୍ୟ ବଜାୟ ରେଖେଛେ । ଆର ନବୀନ ଏ କାରଣେ ଯେ, ସନାତନ ଐତିହ୍ୟ ବଜାୟ ରେଖେଓ ଏ ଧର୍ମ ଯୁଗେର ପରିବର୍ତ୍ତନେର ସଙ୍ଗେ ଖାପ ଝାଇୟେ ଚଲାଇଛେ । ଏ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହିସେବେ କୋମୋ ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକେ ଚିହ୍ନିତ କରା ଯାଇ ନା । ଏ ଧର୍ମର ମୂଳେ ର଱େହେଲ ଭଗବାନ ଅଯଃ । ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକାଳ ଥିବେ ଏ ଧର୍ମମତେର ପରିଚୟ ମେଲେ । ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାପଥେ ଧର୍ମର ମୂଳତତ୍ତ୍ଵକେ ଧରେ ରେଖେଓ ନତୁନ ନତୁନ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରହପ କରେ ଏ ଧର୍ମ କ୍ରମଶ ପଲ୍ଲବିତ ହେଲାଇଛେ ଏବଂ ହଜେ । ସିଙ୍ଗୁ ସଭ୍ୟତାର ମହେଞ୍ଜୋଦାଡ଼ୋ ଓ ହରଙ୍ଗାର ନିଦର୍ଶନ ଥିବେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର କିଞ୍ଚିତ୍ ପରିଚୟ ଓ ଧାରଣା ପାଓଯା ଯାଇ । ଆର୍ଯ୍ୟରା ଏଦେଶେର ବହିରାଗତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ । ତାରା ଯଥିନ ଭାରତ ଭୂମିତେ ଆସେ ତଥିନ ତାଦେର ସଙ୍ଗେ ଛିଲ ନିଜୀର ଧର୍ମ ଓ ସଂକ୍ଷତି । ଏଦେଶେର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ସଙ୍ଗେ ଆର୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ପରିଣତିତେ ସିଙ୍ଗୁସଭ୍ୟତାର ସଙ୍ଗେ ଆର୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଏକଟା ସମସ୍ତମ ଘଟେ । ଏର ଫଳେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଧର୍ଚର୍ଚାର ସଙ୍ଗେ ଆର୍ୟଦେଇ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯିଲିତ ହେଲେ ଏକଟା ନତୁନ ରୂପ ଧାରଣ କରେ । କାଳକ୍ରମେ ଏଟି ଆର୍ୟସଭ୍ୟତା, ଆର୍ୟଧର୍ମ ନାମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରେ । ଏହି ଐତିହାସିକ ପଟ୍ଟଭୂମିକାଯ ଛିତ ସନାତନ ଧର୍ମ ତାର ନତୁନ ଅଭିଧାୟ ପରିଚିତ ହୋଇ ଗଲା କରେ । ଆର୍ୟଗଣ ସୁପ୍ରାଚୀନ ସିଙ୍ଗୁନଦେଇ ତୌରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ଧଳେ ବସିବାସ କରିବାକୁ ଥାକେ । ବହିରାଗତ ଆକଗାନ ଓ ପାର୍ଶ୍ଵିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସିଙ୍ଗୁନଦକେ ହିନ୍ଦୁନଦ ବଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଥାକେ । ତାଦେର ଉଚ୍ଚାରଣେ ସିଙ୍ଗୁର 'ସ' ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ 'ହ'-ତେ ରୂପ ନେଇ ଏବଂ ସିଙ୍ଗୁ ଶଙ୍କଟି ହିନ୍ଦୁ ବଲେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହତେ ଥାକେ । ତାଇ ଅନେକ ଗବେଷକେର ମତେ ସିଙ୍ଗୁ ଶଙ୍କ ଥିବେଇ ହିନ୍ଦୁ ଶଦେଇ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସିଙ୍ଗୁ ନଦେଇ ତୌରବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଦେଇ ଧର୍ମହି ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ବଲେ ଆଖ୍ୟାୟିତ ହେଲା । ସନାତନ ଧର୍ମ କ୍ରମେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ନାମେ ପରିଚିତି ଲାଭ କରେ । ତବେ ସମୟେର ଅଗ୍ରଗତିତେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମବିକାଶେର ଅନୁମତି ହିସେବେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଚିନ୍ତା-ଚେତନାୟ ନତୁନତ୍ତ୍ଵର ସଂଧ୍ୟାଜଳ ଘଟେ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଏହି ବିକାଶମାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ତିନଟି କ୍ଷରେ ବିନ୍ୟନ୍ତ କରେ ଦେଖା ଯାଇ- ବୈଦିକ ଯୁଗ, ପୌରାଣିକ ଯୁଗ ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ।

### ବୈଦିକ ଯୁଗ

ବୈଦିକ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଆଦି ଧର୍ମଥିରୁ । ବୈଦିକ ଧର୍ମଥିରୁରେ ର଱େହେଲ ଚାରଟି ଭାଗ : ସଂହିତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ ଏବଂ ଉପନିଷଦ । ସଂହିତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଭାଗ ନିଯେ ବୈଦେର କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଆବାର ଆରଣ୍ୟକ ଓ ଉପନିଷଦ ଭାଗ ଦୁଇ ନିଯେ ବୈଦେର ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ । ବୈଦେର ସଂହିତା ଅଥେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଆଗ୍ନି, ସୂର୍ୟ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଉଷା, ରାତ୍ରି ପ୍ରଭୃତି ଦେବ-ଦେଵୀର କ୍ଷବ-କ୍ଷତି ର଱େଛେ । ବୈଦେର ମତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଦେବଗଣେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଗଯଜ୍ଞ କରେ ଅଭୀଷ୍ଟ ଲାଭେର ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ହତୋ । ବୈଦ-ମଞ୍ଚଙ୍ଗଲୋ ରହସ୍ୟମଯ ।

ସାଧାରଣେର ଜ୍ଞାନେ ଏଇ ତାତ୍ପର୍ୟ ଅନେକ ସମୟ ଧରା ପଡ଼େ ନା । ତବେ ଯାଗଯଜ୍ଞର ଅନୁଶୀଳନ କରେ ଆର୍ୟଗଣ ଦୁଇଟି ବନ୍ତୁର ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜ୍ଞାନାତେନ । ବନ୍ତ ଦୁଇଟି ହଜେ- ଶ୍ରୀ ଓ ଥୀ ।



শ্রী অর্থাং ধন-ধান্য, বল-বিক্রম, যশ ইত্যাদি পার্থিব কাম্যবস্তু । ধী হচ্ছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা । আবার বেদের অন্য কতগুলো মন্ত্রের বিষয়বস্তু বুদ্ধি, জ্ঞানজ্যোতিঃ, অমৃততত্ত্ব । এ দুইটি চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বাত্মক প্রকটিত হয়েছে । ধর্মের সংজ্ঞায় জানা যায় যা থেকে জাগতিক কল্যাণ এবং পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হয় সেটিই ধর্ম । এটি সনাতন তথা হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি । বৈদিক যুগের খৰিদের ধর্মীয় চিন্তাচেতনায় জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয়বিধি কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্য ছিল । বৈদিক যুগে খৰিগণ ছিলেন সুখবাদী, জীবনবাদী । বাজসনেয় সংহিতায় বলা হয়েছে-

তেজোৎসি তেজো ময়ি ধেহি । বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি ।  
বলমসি বলং ময়ি ধেহি । ওজোৎস্যোজো ময়ি ধেহি ।  
মন্ত্যুরসি মন্ত্যং ময়ি ধেহি । সহ্যোৎসি সহ্যং ময়ি ধেহি ।

অর্থাং তুমি তেজস্বরূপ, আমাকে তেজ দাও, আমাকে তেজস্বী কর । তুমি বীর্যস্বরূপ, আমায় বীর্যবান কর । তুমি বলস্বরূপ, আমায় বলবান কর । তুমি ওজস্বরূপ, আমায় ওজস্বী কর । তুমি মন্ত্য স্বরূপ (অন্যায়দ্বারাই), আমায় অন্যায়দ্বারাই কর । তুমি সহ্যস্বরূপ (সহ্যশক্তি), আমায় সহমন্তীল কর ।

বৈদিক যুগের প্রার্থনায় দেখা যায় জীবনে সমৃদ্ধি, জীবের প্রতি মেহ-প্রীতি এবং জগতের শান্তি কামনা । এই প্রার্থনাগুলোর মধ্য দিয়ে এক পরমশক্তি দৈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে । একে দৈশ্বরবাদ বলা যায় । এখানে উল্লেখ্য, বৈদিক যুগে ধর্মানুষ্ঠানের রূপ ছিল যজক্রিয়া । যজ্ঞকর্মের অনুশীলন করে মানুষ অভীষ্ট কর্মফল লাভ করতে পারতেন । এটিকে পরবর্তীকালে বলা হলো যাগ-যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম, জীবের সংসার বন্ধনের কারণ । এগুলো মোক্ষলাভের সহায়ক নয় । যজ্ঞকর্ম সুস্থুভাবে সম্পাদিত হলে যজ্ঞকারীর অভীষ্ট ফল লাভ হয়, এমনকি স্বর্গপ্রাপ্তি ও ঘটে । কিন্তু পুণ্য ক্ষয় হলে জীবকে স্বর্গভোগ ছেড়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় । মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হচ্ছে দৈশ্বর লাভ বা মোক্ষলাভ । বৈদিক যুগের জ্ঞানপ্রাপ্তি ও দার্শনিক চিন্তার পর্যায়ে এসে তৎকালীন খৰিগণ উপলব্ধি করেন, মোক্ষলাভই জীবনের উদ্দেশ্য আর এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কাম্যকর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করতে হবে । এখানে সনাতন ধর্মচিন্তায় নতুন উপলব্ধি এসে যায় । মোক্ষলাভের সহায়ক ধর্মচিন্তায় সন্ন্যাসবাদের আবির্ভাব ঘটে । এ স্তরে যুক্তিলাভের পথ প্রদর্শক হিসেবে বহু উপনিষদ গ্রন্থ রচনা হয় । এ পর্যন্ত দুইশতেরও অধিক উপনিষদের পরিচয় জানা গেছে । তবে কৌবিতকী, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, দৈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি বারোটি উপনিষদকে প্রধান ও প্রামাণ্য উপনিষদ বলা হয় । এগুলোর মধ্যেও প্রস্তুত মতভেদ রয়েছে । ব্রহ্মলাভের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে মহৰ্ষি বাদরায়ণ বেদব্যাস ‘ব্রহ্মসূত্র’ প্রচ্ছে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন । একেই বলা হয় বেদান্ত দর্শন ।

এখানে উল্লেখ্য, ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ, ত্বেদবাদ, অত্বেদবাদ, ত্বেদাত্বেদবাদ প্রভৃতি দার্শনিক মতবাদের উত্থান ঘটে এবং হিন্দুধর্ম-চিন্তায় এক সমৃদ্ধ যুগের আবির্ভাব ঘটে । বৈদিক যুগের ধর্মচিন্তায় কাম্যকর্ম মোক্ষদায়ক নয় । তাই বেদান্তের ব্রহ্মচিন্তা হিন্দুধর্মের চিন্তাজগতে এক পরিবর্তন ধরা পড়ে ।

এভাবে সনাতন ধর্মের দুইটি শাখা প্রকট হয়ে ওঠে; একটি কর্মমার্গ, অপরটি জ্ঞানমার্গ ।

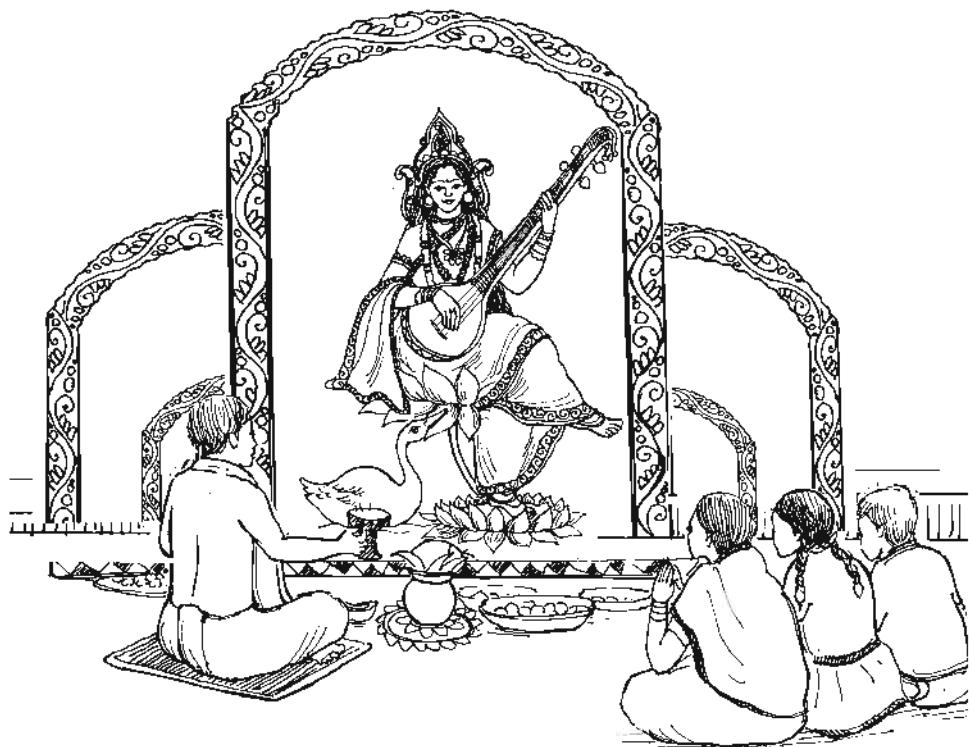
## পাঠ ২ : স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র

বৈদিক শিক্ষার কর্ম ও জ্ঞান এ দুই মতের সংযোগ স্থাপন করে সৃষ্টি হয় স্মৃতিশাস্ত্র। এখানে এসে জ্ঞান যায় মোক্ষলাভের জন্য কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন রয়েছে। হিন্দুদের জীবনচর্চার আশ্রম বিভাগে জ্ঞান গেছে, প্রথম পঁচিশ বছর ব্রহ্মচর্য আশ্রমে বিদ্যা শিক্ষা ও সংযম শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এর পরের পঁচিশ বছর গার্হস্থ্য আশ্রমে ধর্ম সংযুক্ত অর্থ, কাম, সেবা আচরণীয়। পরে বানপ্রস্থ আশ্রমে মুনিবৃত্তি অবলম্বন এবং সন্ন্যাস আশ্রমে কর্ম ত্যাগ করে ব্রহ্মচিন্তায় নিমজ্জন। এখানে প্রথম দুই আশ্রমে কর্মযোগ এবং শেষের দুই আশ্রমে জ্ঞানযোগের পরিচয় মেলে। স্মৃতিশাস্ত্রে হিন্দুসমাজ পরিচালনার বিধি-বিধানও সন্নিবেশিত রয়েছে। এভাবে হিন্দুধর্মে জাগতিক এবং পারমার্থিক চিন্তার ত্রুট্য বিকাশ ঘটতে থাকে।

### পৌরাণিক যুগ

পৌরাণিক যুগে হিন্দুধর্মের চিন্তা জগতে ভক্তির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। বেদ ও উপনিষদের মধ্যেও ভক্তিভাবের ইঙ্গিত রয়েছে। এটি পৌরাণিক যুগে এসে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ করে। আর ভক্তিমার্গের প্রাধান্য লাভ করায় সনাতন ধর্মে এক

রূপান্তর সংঘটিত হয়। ভক্তিকে অবলম্বন করে পরম তত্ত্বে উপনীত হওয়ার যাত্রাপথে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রকাশ ঘটে। দেবতা একাধিক, তাই পরব্রহ্মের স্থান নিয়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর অনুসারী ভক্তগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়।



এভাবে বৈষ্ণব, শৈব, শাঙ্ক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উচ্চব ঘটে। আর হিন্দুধর্মের অবতার পুরুষদের মাহাত্ম্য কীর্তনে বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণ প্রণীত হয়। বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, কূর্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, ভাগবতপুরাণ এবং বেশকিছু উপ-পুরাণও এই যুগে রচিত হয়। বৈষ্ণব ধর্মে বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ তগবান হিসেবে পূজিত হন। আবার বৈষ্ণব ধর্মতের মতো আর একটি প্রভাবশালী ধর্মমত হলো শৈব ধর্মমত। তাদের মতে শিবই সমস্ত আগমশাস্ত্রের বক্তা।

আবার বিশ্বচরাচরে সর্বত্র শক্তির প্রকাশ। ব্রহ্ম বস্তুকে যখন সংগুণ, সংক্ষিয় বলে ধারণা করা হয় তখনই তাঁর শক্তির চিহ্ন এসে পড়ে; কেননা শক্তিরই প্রকাশ হয় ক্রিয়াতে। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নির কল্পনা অসম্ভব। অনুরূপভাবে শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের কর্মক্ষমতা থাকে না। সুতরাং শক্তিও পরম আরাধ্য।

এই যে বৈষ্ণব, শৈব, শাঙ্কমতের উল্লেখ করা হলো, এসব মতের সবগুলোতেই সংগুণ ঈশ্বর, জগতের সত্যতা এবং ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়েছে। বৈদিক কর্মবাদ ও বেদান্তের নির্ণয় ব্রহ্মবাদ থেকে পৌরাণিক ধর্মসমূহের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। শাঙ্কবচন থেকে জানা যায়, বিষ্ণু, রূদ্র, শক্তির দেবী-ঝঁঁরা সবাই এক মূলতত্ত্বের প্রকাশ বা বিকাশ - ‘একৎ সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি’। এক ব্রহ্মকেই মনীষীরা বিভিন্ন নামে ও বৃপ্তে অভিহিত করেন। ধর্মচর্চার অবলম্বন হিসেবে ভক্তি সনাতন সাধনার চিন্তাজগতে এক বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রসঙ্গটি স্মরণ করা যায়। ভক্তিপথে ঈশ্বর আরাধনার বিশেষ আহ্বান আছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়। এ গ্রন্থটিতে হিন্দুধর্মের সাধন প্রক্রিয়াগুলোর কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি বিষয় সংরক্ষিত ও সমন্বিত রয়েছে। তগবান শ্রীকৃষ্ণের উদার আহ্বানে হিন্দুধর্মের সমস্য-চেতনা বিবৃত হয়েছে।

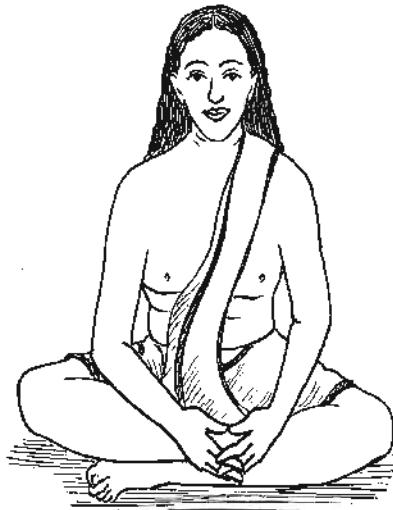
গীতার ভক্তিবাদের প্রকাশ বিভিন্ন পর্যায়ে লক্ষ করা যায়। এখানে তগবানের আহ্বান রয়েছে - সতত আমাকে স্মরণ কর, আমাতে মনোনিবেশ কর। আমার ভজনা কর, আমাতেই সমস্ত কর্ম সমর্পণ কর, একমাত্র আমারই শরণ লও ইত্যাদি উক্তির মধ্য দিয়ে ভগবন্তকির উপদেশ লাভ করা যায়। এই উক্তির ধারাটি আরো বিকাশ লাভ করে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে।

### পাঠ ৩ : আধুনিক ধর্ম সংস্কারের যুগ

উনবিংশ শতকে হিন্দুধর্মে তথা বাংলাদেশের হিন্দুধর্মে এক বিশেষ চিন্তাচেতনার বিকাশ লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞানমনস্ক সুধীজন সনাতন তথা হিন্দুধর্মের প্রচলিত পূজা-পার্বণ, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তাঁরা মনে করেন, যুক্তিসংগত নির্দেশ ছাড়া সামাজিক আচার-আচরণে যে প্রচলিত ধর্মীয় বিধি-বিধান সেগুলো সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। শাঙ্ক্রান্ত বলা হয়েছে ‘যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে’-যুক্তিহীন বিচারে ধর্মের হানি ঘটে। এক্ষেত্রে যুক্তিবাদী সংস্কারক মনীষীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি লক্ষ করেন, বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসক হয়ে এক হিন্দু সম্প্রদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীচিন্তায় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। সব উপাস্য যে একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ,

হিন্দু সম্প্রদায় তা ভুলতে বসেছে। তখন তিনি এক ব্রহ্মের উপাসনার তত্ত্বকে উপস্থাপিত করেন। এভাবে তিনি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একজ প্রতিষ্ঠার জন্য এক ব্রহ্মকে সাধনার আহ্বান জানালেন। স্থাপন করলেন ‘ব্রাহ্মসমাজ’। তিনি বললেন ব্রহ্মই একমাত্র আরাধ্য। হিন্দুরা একেশ্বরবাদী।

তাঁর এই সংক্ষার-চেতনা সুধীমহলে নদিত হলেও সাধারণ মানুষ তাদের প্রচলিত বিশ্বাস ও পূজা-পার্বণ ত্যাগ করতে পারেনি। এদের অনুভূতিতে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাকার মাতৃসাধনার সাফল্যের দ্বারা। একশ্বেরবাদী ধারণা আর বহু দেব-দেবীরূপে ইশ্বর আরাধনা এ দুইয়ের সমন্বয় সাধিত হয় ঠাকুর রামকৃষ্ণের অমর উপদেশে – ‘যত মত, তত পথ’; ‘যত্ত জীব, তত্ত্ব শিব’ ইত্যাদি বাণীর মাধ্যমে।



ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবাদর্শগুলো প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৮৬ সালে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হয়। এই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন নামে যুগ্ম প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ ভাবান্দেলন বা বেদান্ত আন্দেলন সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করছে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ‘বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরম্পরের ভাব গ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি’। এই আদর্শটি শুধু হিন্দুধর্মের প্রেক্ষাপটে নয়, এটি বিশ্ব মানবতার ক্ষেত্রেও সমানভাবে ক্রিয়াশীল।

হরিচাঁদ ঠাকুর ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে আবির্ভূত হয়ে হিন্দু সমাজে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে এক হরিনামে মেতে থাকার আহ্বান জানান। তাঁর এই ধর্মনীতি থেকেই মতুয়া ধর্মের উন্নতি। এ ধর্মের মূলমত্ত্ব হচ্ছে ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে হরিনামে মেতে থাকা। হরিনামই জগতে কল্যাণ, শান্তি, সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ।

এখানে উল্লেখ্য, হিন্দুধর্ম বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর (পঞ্চদশ শতক) প্রেমভক্তির ধর্ম তথা আন্দোলনটি বিশেষ অবদান রাখতে সমর্থ হয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির আন্দোলনটি হিন্দুধর্ম চেতনায় বিভিন্ন দেব-দেবীর অনুসারীদের বিদ্যে এবং বর্ণভেদ প্রথা দূর করতে অনেকখানি সমর্থ হয়। প্রেমপূর্ণ ভক্তি দিয়েই পরম আরাধ্য ভগবানকে লাভ করা যায়। আর ধর্ম আচরণে ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, নারী, পুরুষ সকলের সমান অধিকার রয়েছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর এই প্রেমভক্তি অনুসরণ করে আবির্ভূব ঘটে প্রভু জগদ্বক্ষু সুন্দরের। তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথের সাধক হয়ে ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে এক অনন্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর এই আদর্শকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে তাঁর পরম ভক্ত মহেন্দ্রজী মহানাম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন আর এই সম্প্রদায়ের গৌরবোজ্জ্বল নক্ষত্র বৈষ্ণব আচার্য হচ্ছেন ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যে এবং একনিষ্ঠ ভক্তিতে কৃষ্ণ-গৌর-বঙ্গ লীলা মাধুর্য প্রকাশিত। মহানাম কীর্তন জীবের উদ্ধারের উপকরণ।

ଶ୍ରୀଚିତନ୍ୟ ପ୍ରସରିତ ପ୍ରେମଭକ୍ତିର ଧର୍ମଟି ବିଶେର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶେ ପ୍ରଚାର କରାର ମାନସେ ୧୯୬୬ ସାଲେ ଜୁଲାଇ ମାସେ ନିଉଇୟର୍କ ଶହରେ ଶ୍ରୀଲ ଏ.ସି. ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ଥାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କୃଷ୍ଣଭାବନାୟତ ସଂସ୍ଥ 'ଇସକନ' (ISKCON) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେନ । ତିନି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପରିପୋଷକ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବଦ, ଶ୍ରୀଚିତନ୍ୟ ଚରିତାୟତ ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମଗ୍ରହେର ଇଂରେଜି ଭାର୍ମନ ପ୍ରକାଶ କରେନ ।



ବୈରାଗ୍ୟମୟ ଜୀବନେର ଅନୁଶୀଳନ ପ୍ରକାର ପାପକର୍ମ ଦୂର କରତେ ସଚେତ ହନ । ତାର ଅନୁଶୀଳିତ 'ହରେ କୃଷ୍ଣ' ମହାମୂର୍ତ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ ଜୀବର ମୁକ୍ତିଲାଭେର ଅବଲମ୍ବନ ହୟେ ଜଗତେ ନାମ ମାହାତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଛେ ।

ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ୧୮୮୮ ସାଲେ ପାବନା ଜେଲାର ହିମାଇତପୁର ଗ୍ରାମେ ଆବିର୍ଭୂତ ହନ । ତିନି 'ସଂସଙ୍ଗ' ନାମେ ଏକଟି ଧର୍ମୀୟ ସଂଗ୍ଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେନ । ସଂସଙ୍ଗେର ଆଦର୍ଶ ହଚେ - ଧର୍ମ କୋନୋ ଅଲୋକିକ ବ୍ୟାପାର ନୟ ବରଂ ବିଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧ ଜୀବନସ୍ତ୍ର । ଭାଲୋବାସାଇ ମହାମୂଳ୍ୟ ଯା ଦିଯେ ଶାନ୍ତି କେନା ଯାଏ । ଏ ସଂଘେର ପାଂଚଟି ମୂଳନୀତି ହଚେ- ଯଜନ, ଯାଜନ, ଇଷ୍ଟଭୂତି, ସ୍ଵନ୍ୟାନ୍ତି ଓ ସଦାଚାର । ଆର ଏ ସଂଘେର ମୂଳ ସ୍ତର ହିସେବେ ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ଓ ସୁବିବାହ ନୀତିଗୁଲୋ ଅନୁଶୀଳିତ ହଚେ । ଏମନିଭାବେ ଧର୍ମ ଓ ବିଜ୍ଞାନକେ ଏକତ୍ରିତ କରେ ଜୀବନ ଗଠନଇ ସଂସଙ୍ଗୀଦେର ଆଦର୍ଶ । ତାର ଛଡା, କବିତା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୀତ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାନ ଏଣୁଳୋ ବିଶେଷ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରାରେ । ସଂସଙ୍ଗ ଚାଯ ଆଦର୍ଶ ମାନୁସ, ଆଦର୍ଶ ଗୃହୀ, ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମଯାଜକ । ତାର ଦୃଷ୍ଟିଭକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଯ ନନ୍ଦିତ ହଚେ ।

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ବିକାଶେର ଭରେ ଯେ ନତୁନ ନତୁନ ଧର୍ମଚର୍ଚାର ରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହୟେଛେ, ସେକ୍ଷେତ୍ରେ ଅଖଣ୍ଡମନ୍ଦୀର ଅବଦାନ ସ୍ମରଣୀୟ । ଏହିର ସଂଗ୍ଠନର ନାମ 'ଆୟାଚକ ଆଶ୍ରମ' । ଏହି ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ଥାମୀ ସ୍ଵର୍ଗପାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ୧୮୯୩ ଖ୍ରିସ୍ଟାବ୍ଦେ ବାଂଲାଦେଶେର ଚାଁଦପୁର ଶହରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହନ । ଆୟାଚକ ଆଶ୍ରମର ନାମଟିର ମଧ୍ୟେଇ ଏର ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲକ୍ଷ କରା ଯାଏ । କୋନୋ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେର ନିକଟ ହତେ ଅର୍ଥ ଯାଏଣା ନା କରା ଏ

সংগঠনের আদর্শ। স্বাবলম্বী হয়ে সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করাই এ সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অ্যাচক আশ্রমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমবেত উপাসনায় চরিত্র গঠন, সমাজ সংক্ষার, ব্রহ্মাচর্য, স্বাবলম্বন ও জগতের কল্যাণের কাজে নিযুক্ত থাকা। স্বামী স্বরূপানন্দের আদর্শকে ঝুঁপদান করার লক্ষ্যে চরিত্র গঠন আন্দোলন শুরু হয় ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি। এর মূল আবেদন ‘আমি ভালো মানুষ হব এবং অপরকে ভালো হতে সহায়তা দিব’। স্বামী স্বরূপানন্দ রচিত বহু গ্রন্থ, সংগীত সমাজের কল্যাণ সাধনে বিশেষ অবদান রাখতে সমর্থ হচ্ছে।

স্বামী স্বরূপানন্দের জীবনাদর্শ থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, সকলকে সমানভাবে ভালোবাসতে হবে। সকলের তরে সকলে আমরা – এ ছিল তাঁর কল্যাণময় জীবনভাবনা।

স্বামী প্রণবানন্দের (১৮৯৬-১৯৪১) সেবাদর্শ হিন্দু সমাজকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করছে। ১৯২১ সালে তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সেবা করেন। তিনি অস্পৃশ্যতাকে দূর করে সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন। জনগণের সেবা করার জন্য তিনি ‘ভারত সেবাশ্রম সংঘ’ নামে একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার পরও লোকসেবা বা লোকশিক্ষার জন্য সাধারণের মধ্যে নেমে এসেছিলেন। তিনি বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার বারদীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে জনগণের সেবা করতে থাকেন। সততা, নিষ্ঠা, সংযম, সাম্য ও সেবা ছিল তাঁর নৈতিক আদর্শের মূলমন্ত্র। তিনি প্রচলিত অর্থে গুরগিরি করেননি। কিন্তু পালন করেছেন একজন লোকশিক্ষকের ভূমিকা। তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা তাঁকে গুরই বিবেচনা করতেন। বাংলাদেশ এবং ভারতসহ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে লোকনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাবা লোকনাথকে কেন্দ্র করে বারদীর লোকনাথ মন্দিরের পরিচালনা পরিষদ, ঢাকার স্বামীবাগে প্রতিষ্ঠিত লোকনাথ মন্দিরকেন্দ্রিক লোকনাথ সেবক সংঘ প্রতিষ্ঠান সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এ রকম আরও ধর্মীয় সংগঠন হিন্দুধর্মের প্রচার ও বিকাশে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

হিন্দুধর্মের চিন্তা-চেতনায় বিভিন্ন মত ও পথের সন্ধান মেলে। তবে এই বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহান মিলন সূত্র লক্ষ করা যায়। হিন্দু ধর্ম সংক্ষারপন্থী হয়েও সন্তান ভাবধারা সংরক্ষণ করে চলছে। মানব জীবনের ব্যবহারিক সমৃদ্ধিসহ আধ্যাত্মিক জীবনের পরম কল্যাণ লাভ হিন্দু ধর্মের মৌলিক স্তুপ। এটি যুগ পরিক্রমার বৈচিত্র্যময় প্রকাশের মধ্য দিয়ে এক অনন্য ভাবেরই দোতনা বহন করছে। হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য চেতনা উপলব্ধি করে মহান হিন্দুধর্মাবলম্বীগণ গৌরব বোধ করে থাকেন।

নতুন শব্দ- সিদ্ধুসভ্যতা, জ্ঞানকাণ্ড, সন্ন্যাস ধর্ম, ব্রহ্মসূত্র, শাক্ত, সমন্বয়, একেশ্বরবাদ।

## ଅନୁଶୀଳନୀ

**ବହନିର୍ବାଚନି ପ୍ରେସ୍ :**

୧। ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର କ୍ରମବିକାଶକେ କୟାଟି ଭରେ ବିଭିନ୍ନ କରା ହୋଇଛେ ?

- |          |          |
|----------|----------|
| କ. ଏକଟି  | ଖ. ଦୁଟି  |
| ଗ. ତିଣଟି | ଘ. ଚାରଟି |

୨। କୋଣ ମହାପୁରୁଷର ପ୍ରେମଭକ୍ତି ଅନୁସରଣ କରେ ବାଙ୍ଗାଳି ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଚେତନାର ଆକାଶେ ଥାଇ ଜଗଦ୍ରହ୍ଣ ସୁନ୍ଦରେ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ ?

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| କ. ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର  | ଘ. ଡ. ମହାନାମବ୍ରତ ବ୍ରଦ୍ଧାଚାରୀ |
| ଗ. ଶ୍ରୀଚିତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ | ଘ. ହରିଚାନ୍ଦ ଠାକୁର            |

୩। ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ର ବଳତେ ବୋବାଯା -

- i. ଜାଗତିକ ଏବଂ ପାରମାର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାର କ୍ରମବିକାଶ
- ii. ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ ରାଜ୍ୟଯୋଗେର ସମସ୍ୟା
- iii. କର୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନେର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ

ନିଚେର କୋଣଟି ସଠିକ୍ ?

- |        |            |
|--------|------------|
| କ. i   | ଘ. ii      |
| ଗ. iii | ଘ. i ଓ iii |

ନିଚେର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଡ଼ ଏବଂ ୪ ଓ ୫ ନଂ ପ୍ରେସ୍ର ଉତ୍ତର ଦାଓ :

ନୃପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମୁଖ୍ୟାର୍ଜୀ ଏକଜନ ଉଦ୍‌ଦୀର୍ଘ ମନେର ମାନୁଷ । ତିନି ତା'ର ପିତାର ମୃତ୍ୟୁବାର୍ଧିକୀତେ ଅଷ୍ଟପଦ୍ମର ନାମଯଜ୍ଞେର ଆୟୋଜନ କରେନ । ସେଥାନେ ତା'ର ଗ୍ରାମେର ଉଚ୍ଚ-ଲିଚ୍, ଧନୀ-ଦରିଦ୍ର ନିର୍ବିଶେଷେ ସକଳକେ ଆମତ୍ରଣ ଜାନାନ । ତା'ର ବାଢ଼ିତେ ସକଳେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ ମେତେ ଉଠେନ ।

୪। ଉଦ୍ଧିପକେର ନୃପେନ୍ଦ୍ରନାଥେର ଚରିତ୍ରେ ତୋମାର ପଠିତ କୋଣ ମହାପୁରୁଷର ଆଦର୍ଶ ଫୁଟେ ଉଠେହେ ?

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| କ. ସ୍ଵାମୀ ସ୍ଵର୍ଗପାନନ୍ଦ | ଘ. ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର |
| ଗ. ହରିଚାନ୍ଦ ଠାକୁର      | ଘ. ଶ୍ରୀଚିତନ୍ୟଦେବ      |

୫। ଉତ୍ସ ମହାପୁରୁଷର ମତାଦର୍ଶ ଥେକେ ଉତ୍ସବ ହୋଇଛେ -

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| କ. ଭକ୍ତିବାଦ      | ଘ. ମତ୍ୟବାଦ      |
| ଗ. ଅଧ୍ୟାତକ ଆଶ୍ରମ | ଘ. ସଂସଙ୍ଗ ସଂଗଠନ |

**সৃজনশীল প্রশ্ন :**

শংকর বেশ কিছুদিন হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে কোনো চাকুরি যোগাড় করতে না পেরে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় তার ছেটবেলার বন্ধু দুর্জয় শংকরকে একটি আশ্রমে নিয়ে যায়। এ আশ্রমে কারো কাছ থেকে কোনো চাঁদা বা সাহায্য নেওয়া হয় না। এরা নিজেদের অর্থের সংস্থান নিজেরাই করে। শংকর এ আশ্রমের শিক্ষায় উদ্বৃক্ষ হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করে এবং সকল ভেদাভেদ ভুলে সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে।

**ক. অবতারবাদ কী ?**

**খ. একেশ্বরবাদ বলতে কী বোঝায় ?**

**গ. শংকর কোন মহাপুরুষের মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয় ? তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।**

**ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে উক্ত মহাপুরুষের মতাদর্শের শিক্ষা মূল্যায়ন কর।**

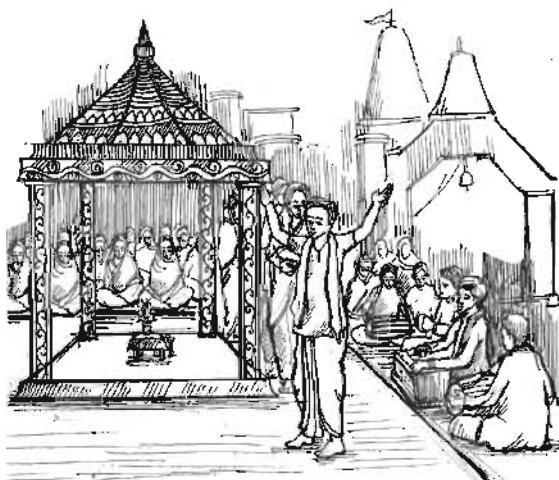
## তৃতীয় অধ্যায়

### ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান

আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করার জন্য যে সমস্ত আচার-আচরণ চার্চিত হয় তা-ই ধর্মাচার। এগুলো শোকাচারও বটে। এসকল আচরণে মানবিক কর্মের নির্দেশ আছে। অপরাদিকে ধর্মশাঙ্কে পূজা এবং অবশ্য কর্তব্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া আছে। এগুলো ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান মূলত একই সূত্রে গাঁথা। ধর্মাচার ব্যতীত ধর্মানুষ্ঠান হয় না আবার ধর্মানুষ্ঠান করতে হলে ধর্মাচার অবশ্য কর্তব্য। সংক্ষাপিত উৎসব, গৃহপ্রবেশ, জামাইষ্টী, রাখীবদ্ধন, ভাইফোটা, দীপাবলি, হাতেখড়ি, নবাব প্রভৃতি ধর্মাচারগুলোর পাশাপাশি দোলযাত্রা, রথযাত্রা, নামযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানগুলোও আমাদের সংকৃতি।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচারের ধারণা দুইটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মাচার ও পূজা আচারের অধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব
- প্রধান প্রধান ধর্মাচারগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব
- সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে ধর্মাচারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব
- ধর্মানুষ্ঠান হিসেবে দোলযাত্রা, রথযাত্রা ও নামযজ্ঞের বর্ণনা এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনে ধর্মাচারের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- তীর্থদর্শনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- পণ্ডিতের পরিচয় ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।



### পাঠ ১ : ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান

হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সারা বছর নানা উৎসব-অনুষ্ঠান করে থাকে। কথায় বলে, বার মাসে তের পার্বণ। এর মধ্যে কিছু আছে ধর্মানুষ্ঠান। আর কিছু আছে লোকাচার। মূলত জীবনটাকে কল্যাণময়, সুখময় ও আনন্দময় করে রাখার চেষ্টা থাকে সতত। যে-সকল আচার-আচরণ আমাদের জীবনকে সুস্পর্শ ও অঙ্গস্থলময় করে গড়ে তোলে, তা ধর্মাচার নামে স্বীকৃত। এগুলোকে লোকাচারও বলে। তবে এর মধ্যে থাকে মাজলিক কর্মের নির্দেশ। আবার ধর্মশাস্ত্রে পূজাসহ নানা অনুষ্ঠানের নির্দেশ আছে। এগুলো ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। ধর্মাচার করতে গেলে ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, আবার ধর্মানুষ্ঠানে ধর্মাচার করতে হবে। সংক্ষিপ্তি, বর্ষবরণ, দোলযাত্রা, রথযাত্রা উৎসবসহ এখানে কয়েকটি ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া হলো।

#### ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মাচার ও পূজা-আচারের সম্পর্ক

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে-সমস্ত মাজলিক আচার-অনুষ্ঠান ধর্মনীতির সাথে সম্পর্কিত সেগুলোই ধর্মাচার। অপরদিকে দৈশ্বর, দেব-দেবীর শ্রব-স্তুতি, প্রশংসা করে যে-সকল ধর্মানুষ্ঠান করা হয় তা-ই ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মাচার ও পূজা-পার্বণ পরম্পরার সম্পর্কিত। ধর্মাচার ধর্মীয় বিধি-বিধান দ্বারা অনুমোদিত। আবার ধর্মানুষ্ঠানে ধর্মাচার পালন করা হয়। পূজা এক প্রকার ধর্মানুষ্ঠান। কিন্তু পূজার সঙ্গে মিশে আছে নানারকম ধর্মাচার। ধর্মানুষ্ঠান করতে হলে নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় আচারও পালন করতে হয়।

### পাঠ ২ ও ৩ : কতিপয় ধর্মাচার

#### সংক্ষিপ্তি

বাংলা মাসের শেষ দিনকে বলা হয় সংক্ষিপ্তি। এ দিনে ঝাতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাসের সংক্ষিপ্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উৎসব করা হয়। তবে বাঙালি সমাজে পৌষ সংক্ষিপ্তি ও চৈত্র সংক্ষিপ্তির উৎসবই উল্লেখযোগ্য। সংক্ষিপ্তি শব্দটি কোথাও কোথাও ‘সাকরাইন’ নামে পরিচিত। তবে পৌষপার্বণ বা পৌষ সংক্ষিপ্তিকে মকর সংক্ষিপ্তিও বলা হয়। হিন্দুরা এই দিনে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করে থাকে।

চৈত্র সংক্ষিপ্তির প্রধান উৎসব শিব পূজা। এর অপর নাম নীল পূজা। শিবের পূজা করা হয়। অনেক স্থানে একে বুড়োশিবও বলে। শিব পূজার একটি অঙ্গ চড়ক পূজা। শাঙ্ক ও লোকাচার অনুসারে স্নান, দান, ব্রত, উপবাস, প্রভৃতি মঙ্গলজনক উৎসব করা হয়।

#### গৃহপ্রবেশ

নবনির্মিত গৃহে প্রথম প্রবেশ করার সময় মাজলিক অনুষ্ঠান করা হয়। সেখানে নারায়ণ দেবতার পাশাপাশি বাস্তু বা ভূমিদেবতা এবং গৃহপতির অঙ্গীষ্ঠ দেবতা বা ঠাকুরের পূজা করা হয়।

#### জামাইষঠী

জ্যেষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে জামাইষঠী অনুষ্ঠিত হয়। খুবই আনন্দময় অনুষ্ঠান এটি। এদিন জামাইকে শুভরবাঢ়িতে নিমজ্ঞন করা হয়। খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ



ଆଯୋଜନ କରା ହୁଏ । ଜାମାଇକେ ନତୁନ କାପଡ଼-ଜାମା ଦେଓଯା ହୁଏ । ଜାମାଇଏ ଶାନ୍ତିଭିସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଜୀଯକେ ସାଧ୍ୟମତୋ ନତୁନ କାପଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଦିନ ସତୀପୂଜାଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ । ସନ୍ତାନ କାମନାୟ ଓ ସନ୍ତାନେର ମନ୍ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସତୀଦେବୀର ପୂଜା ହୁଏ ।

### ରାଖୀବନ୍ଦନ

‘ରାଖୀ’ କଥାଟି ରଙ୍ଗା ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ଉତ୍ତପ୍ତ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଚାରେର ମଧ୍ୟେ ରାଖୀବନ୍ଦନ ଅନ୍ୟତମ । ଏଦିନ ବୋନେରା ତାଦେର ଭାଇଦେର ହାତେ ରାଖୀ ନାମେ ଏକଟି ପବିତ୍ର ସୁତୋ ବେଁଧେ ଦେଇ । ଭାଇ-ବୋନେର ମଧ୍ୟକାର ଆଜୀବନ ଭାଲୋବାସାର ପ୍ରତୀକ ବହନ କରେ ଏହି ରାଖୀବନ୍ଦନ । ନିଜେର ଭାଇ ଛାଡ଼ାଓ ଆଜୀଯ ଓ ଅନାଜୀଯ ଭାଇଦେର ହାତେଓ ରାଖୀ ପରାନୋ ହୁଏ ଏବଂ ଏତେ ଭାଇ-ବୋନେର ମଧ୍ୟେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ । ଶ୍ରାବଣ ମାସେର ପୂର୍ଣ୍ଣମା ତିଥିତେ ଏ ପର୍ବତୀ ପାଲନ କରା ହୁଏ ବିଧାୟ ଏ ଦିନଟି ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ନାମେଓ ପରିଚିତ ।

### ଆତ୍ମବିତୀଯା

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେର ଶୁକ୍ଳା ଦିତୀଯା ତିଥିତେ ଏ ଉତ୍ସବ ପାଲନ କରା ହୁଏ । ଏ ଦିନଟି ବଡ଼ଇ ପବିତ୍ର । ପୁରାଣେ ଉଲ୍ଲେଖ ଆଛେ- କାର୍ତ୍ତିକର ଶୁକ୍ଳା ଦିତୀଯା ତିଥିତେ ସମୁନାଦେବୀ ତା'ର ଭାଇ ଯମେର ମନ୍ଦଳ କାମନାୟ ପୂଜା କରେନ । ତା'ରଇ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଭାବେ ସମ୍ବଦେବ ଅମରତ୍ମ ଲାଭ କରେନ । ଏ କଲ୍ୟାଣତ୍ରତ୍ନ ଯମଗେ ରେଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେର ବୋନେରାଓ ଏ ଦିନଟି ପାଲନ କରେ ଆସିଛେ ।

ଭାଇକେ ଯାତେ କୋନୋ ବିପଦ-ଆପଦ ସ୍ପର୍ଶ କରତେ ନା ପାରେ ସେଜଳ୍ୟ ବୋନ୍ଦେର ସତତ କାମନା । ଏଦିନ ଉପବାସ ଥିଲେ ଭାଇଯେର କପାଳେ ଫୋଟା ଦେଓଯା ହୁଏ । ବଁ ହାତେର କଡ଼େ ଅଥବା ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳ ଦିଯେ ଚନ୍ଦନେର (ଘି, କାଜଳ ବା ଦଥିଓ ହତେ ପାରେ) ଫୋଟା ଦିଯେ ଭାଇଯେର ଦୀର୍ଘଯୁ କାମନା କରେ ବଢା ହୁଏ-

‘ଭାଇଯେର କପାଳେ ଦିଲାମ ଫୋଟା,  
ସମେର ଦୂରାରେ ପଡ଼ିଲ କାଟା ।’

ଏଜଳ୍ୟ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନେର ଏକ ନାମ ‘ଭାଇଫୋଟା’ ।  
ଭାଇକେ ଫଳ, ମିଷ୍ଟି, ପାଯେସ, ଲୁଚି ପ୍ରଭୃତି ଉପାଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଶନ କରା ହୁଏ । ଶୁଦ୍ଧ ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଠିର ମଧ୍ୟେଇ ନମ, ଏ ଉତ୍ସବେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଜାତିଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷେ ସକଳେର ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମବୋଧ ଜାଗାଇବା କରେ ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ ଗଡ଼େ ତୋଳା ସମ୍ଭବ ।



### বর্ষবরণ

বাংলা সনের প্রথম দিন নতুন বছরকে বরণ করার মাধ্যমে এ উৎসব পালন করা হয়। এটি ধর্মীয় অনুভূতির পাশাপাশি পেয়েছে সার্বজনীনতা। বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব। এ দিন বিভিন্ন পূজা, মিষ্টি খাওয়া, ভাব বিনিময় ও হালধাতাসহ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করা হয়।

বর্ষবরণ ও চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষেত্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব 'বৈসাবি' পালন করা হয়।



### দীপাবলি

শ্যামা বা কালীপূজার দিন রাত্রে অনুষ্ঠিত হয় 'দীপাবলি' উৎসব। প্রদীপ জ্বালিয়ে অঙ্ককার দূর করা হয়। সচেতনতার আলো জ্বালিয়ে মনের অঙ্গনতার মোহাঙ্ককার দূর করার প্রতীক হিসেবে এই দীপাবলি উৎসব। এটির মধ্য দিয়ে সকল কুসংস্কার প্রদীপের আগন্তে পুড়িয়ে জ্বালের আলোকে সারা বিশ্ব আলোকিত হোক। -এ ব্রহ্ম নিয়েই দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়। এটি দেওয়ালি, দীপান্ধিতা, দীপালিকা, সুখরাত্রি, সুখসুন্দিকা প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

### হাতেখড়ি

সরস্থতী পূজার দিন শিশুদের শিক্ষা-জীবনে প্রবেশের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠান। পুরোহিত কিংবা পছন্দনীয় শুরুজনের কাছে কলাপাতায় খাগ দিয়ে লিখে অথবা পাথরে খড়িমাটি দিয়ে লিখে শিশুরা লেখাপড়ার জগতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করে।

### নবান্ন

নবান্ন আবহ্যান বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব। নবান্ন = নব + অন্ন; নবান্ন শব্দের অর্থ নতুন ভাত। বার মাসে তের পার্বণের একটি পার্বণ।

হেমন্তকালের অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নালা রকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে যে মাঙলিক উৎসব করা হয় তার-ই নাম নবান্ন উৎসব। এটি খাতুভিত্তিক অনুষ্ঠান। এদিন শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীগ্রীষ্মকালীর পূজা দেওয়া হয়।

একক কাজ : প্রত্যেকটি বিষয়	সংক্রান্তি	ভারতীয়	দীপাবলি	হাতেখড়ি	নবান্ন
সম্পর্কে দুইটি করে বাক্য লেখ					

## পাঠ ৪ : ধর্মানুষ্ঠান

### দোলযাত্রা

ফাল্গুনী পূর্ণিমা (দোলপূর্ণিমা) দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবীর, কুক্ষমে রাঞ্জিয়ে পূজা করা হয়। তাঁদের পূজা দিয়ে পরম্পর পরম্পরকে রং বা আবীর মাখিয়ে সকলে আনন্দ করে। এ পূজার আগের দিন অর্থাৎ ফাল্গুনী শুক্র চতুর্দশীর দিন ‘রুড়ির ঘৰ’ বা ‘মেড়া’ পুড়িয়ে অঘঙ্গলকে দূর করার বা ধ্বৎস করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অনেকস্থানে এসময় সমন্বয়ে বলা হয়- ‘আজ আমাদের মেড়া পোড়া, কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে বলো সবাই, বলো হরিবোল।’

এটি মূলত বৈশ্বণীয় উৎসব। এই ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোল পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবীর নিয়ে রাধিকা ও অন্যান্য গোপীগণের সাথে রং খেলায় মেতেছিলেন। সে ঘটনা থেকেই এ দোল খেলার প্রবর্তন। একে বসন্ত-উৎসবও বলা যায়।

দোলপূর্ণিমার দিন দোলযাত্রা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে গান, মেলা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। দোলযাত্রা উৎসবের দিন সকাল থেকেই শক্র-মিত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে বিভিন্ন প্রকার রং নিয়ে খেলায় মন্ত হয়ে বিভেদ ভুলে যায়। সকলেই হয়ে যায় একাত্ম। এটাই দোলযাত্রার সাৰ্বজনীনতা। বাংলার বাইরে এটি হোলি উৎসব নামে পরিচিত।

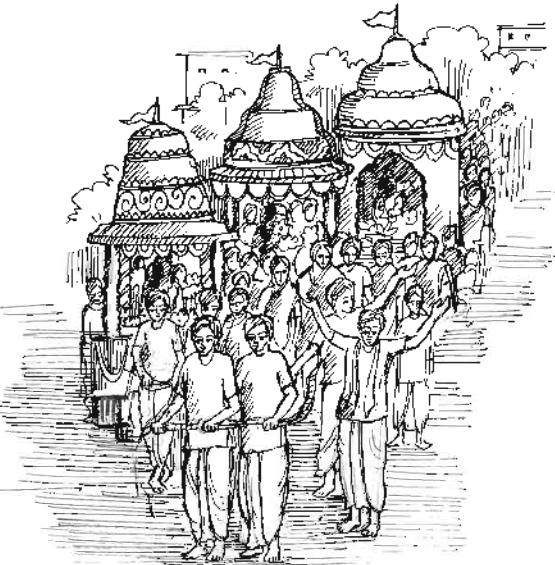
### রথযাত্রা

হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রথযাত্রা অন্যতম পর্ব। এটি হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব হলেও বর্তমানে সাৰ্বজনীন উৎসব হিসেবে বৃপ্লাভ করেছে।

আষাঢ় মাসের শুক্র-দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা শুরু হয়। এই রথযাত্রা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা নামেই পরিচিত উড়িষ্যার পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

রথ হলো চাকাওয়ালা একটি যান। এখানে তিন জন দেবতা - জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা অধিষ্ঠিত থাকেন। ভঙ্গগণ এ তিন দেবতার যানটিকে একটি নির্দিষ্ট দেবালয় বা মন্দির থেকে রশি দিয়ে টেনে অন্য একটি নির্দিষ্ট মন্দির বা বারোয়ারি তলায় নিয়ে রেখে আসে। এরপর ঠিক নবম দিনে অর্থাৎ একাদশীর দিন সে স্থান থেকে টেনে পুনরায় পূর্বের নির্দিষ্ট মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া

হয়। এ পর্বটির নাম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা বা উচ্চোরথ। এই রথযাত্রা উপলক্ষে নয় দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই রথযাত্রা পালিত হয়। তবে ঢাকা জেলার ধামরাইয়ে অনুষ্ঠিত রথযাত্রা উৎসব বাংলাদেশে বিখ্যাত।



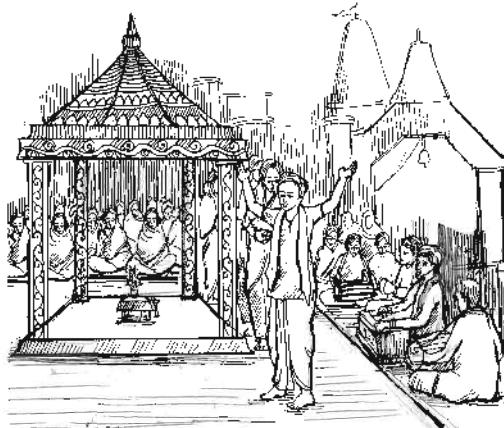
### রথযাত্রার তাংপর্য :

রথের সময় ভগবানই ভক্তের কাছে নেমে আসেন। সবাই একত্রে রথের রশি ধরে। এখানে জাতি বর্ণের বিভিন্ন থাকে না। তাই রথযাত্রা দেয় সাম্যের শিক্ষা। রথের মেলা একদিকে উৎসব, অন্যদিকে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

### পাঠ : ৫ : ধর্মানুষ্ঠান ও পারিবারিক-সামাজিক জীবনে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মচারের গুরুত্ব

#### নামযজ্ঞ

নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়। বিভিন্ন সুরে, ছন্দে, তালে কৃষ্ণনাম এবং রামনাম কীর্তন করা হয়। এ অনুষ্ঠানটি স্থান, সময় এবং আয়োজনের পরিধিতে কয়েক প্রহরব্যাপী হয়ে থাকে। তিন ঘন্টায় এক প্রহর ধরা হয়। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে মন্দির বা নামযজ্ঞানুষ্ঠান স্থানটি পরিত্র রাখা হয়। ভক্তরা আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে—শ্রীহরির নাম নিলে বা শুনলে সে পুণ্য লাভ করে। দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পায়। আর এ বিশ্বাস নিয়েই মানুষ বহুদূর থেকে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে ঘোগ দেয়।



এই নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়। ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবাই একাত্ম হয়ে যায়। সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়।

**একক কাজ :** তোমার এলাকায় অনুষ্ঠিত দোলযাত্রা অথবা রথযাত্রা অথবা নামযজ্ঞ ধর্মানুষ্ঠানের বর্ণনা দাও।

### পারিবারিক-সামাজিক জীবনে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মচারের গুরুত্ব

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে ধর্মচারের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মচার বা ধর্মনীতি মানুষকে ভদ্র, ন্যস্ত ও বিনয়ী করে তোলে। মানবিক মূল্যবোধের এ নীতি অনুসরণ করতে হলে ধর্মচার অনুসরণ করতে হয়। আবার ধর্মানুষ্ঠান ছাড়া ধর্মচার তেমন ফলপ্রসূ হয় না। ধর্মচারের মাধ্যমে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। সুতরাং বলা যায় আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবন সুন্দর-সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মচারের নীতি অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

### পাঠ ৬ : বাংলাদেশের তীর্থস্থান

বাংলাদেশে অনেক তীর্থস্থান রয়েছে। যেমন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড, মহেশখালীর আদিনাথের মন্দির, গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দি, নারায়ণগঞ্জের লাঙ্গলবন্দ, নোয়াখালীর রামঠাকুরের সমাধিস্থল, পাবনার হিমাইতপুর, সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরের পগাতীর্থ, শ্রীহট্টের যুগলটিলা প্রভৃতি।

### তীর্থ দর্শনের গুরুত্ব

স্বয়ং ভগবান কিংবা তাঁর অবতারের আবির্ভাব স্থানকে পুণ্যস্থান বলা হয়। কোনো দেবালয়ের স্থানও পুন্যস্থান আর পুণ্যস্থানকে বলা হয় তীর্থস্থান। এগুলো ঐতিহাসিক স্থান বলেও আখ্যায়িত। তীর্থস্থান ভ্রমণ করা একটি পুণ্য কর্ম। ধর্মপালন করার মতো তীর্থদর্শন করাও একটি পবিত্র কর্তব্য। তীর্থদর্শনে মন পবিত্র হয়, অশান্ত মন শান্ত হয়। দুঃখ দূর হয়। পুণ্যলাভ হয়। পরকালে সদ্গতি হয়। এছাড়াও ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। মনের প্রসারতা বাঢ়ে। সংকীর্ণতা দূর হয়। উদারতা বৃদ্ধি পায়। মনে আসে স্মৃতি। মহাপুরূষদের জীবনাচরণের নিদর্শন মনকে ভালো কাজে উদ্বৃক্ষ করে।

### পণ্টাতীর্থ এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এর প্রভাব

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর থামে পণ্টাতীর্থস্থানটি অবস্থিত। পণ্টাতীর্থে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পার্বদ শ্রীমৎ অবৈত প্রভুর জন্মস্থান। এটি লাউড়ি পাহাড়ে অবস্থিত। চৈত্রমাসে বারণীস্থানে এখানে বহু মানুষের সমাবেশ হয়। সাধক পুরুষ অবৈত প্রভুর মা লাভাদেবীর গঙ্গাস্নানের খুব ইচ্ছে হলো। কিন্তু শারীরিক অসামর্থ্যের কারণে তিনি গঙ্গাস্নানে যেতে পারেননি। অবৈত প্রভু তাঁর মায়ের ইচ্ছে পূরণের জন্য যোগসাধনাবলে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থের পুণ্যজল এক নদীর মধ্যে নিয়ে আসেন।

এই জলধারাটিই পূরনো রেণুকা নদী। বর্তমানে এটি যাদুকাটা নদী নামে প্রবাহিত। সুনামগঞ্জের তাহিরপুর থানার এই নদীর তীরে পণ্টাতীর্থে প্রতি বছর বারণী স্নানে বহু লোকের সমাগম হয়।



**একক কাজ :** পণ্টাতীর্থের মতো তোমার দেখা কোনো তীর্থস্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

### অনুশীলনী

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। 'নবান্ন' উৎসবে কোন দেবীর পূজা করা হয় ?

- |            |            |
|------------|------------|
| ক. সরস্বতী | খ. লক্ষ্মী |
| গ. দুর্গা  | ঘ. মনসা    |

২। চৈত্রসংক্রান্তির প্রধান উৎসব কোনটি ?

- |               |              |
|---------------|--------------|
| ক. জামাইবষ্ঠী | খ. দোলযাত্রা |
| গ. দীপাবলি    | ঘ. শিবপূজা   |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উভয় দাও :

নবম শ্রেণির ছাত্র অয়ন পহেলা বৈশাখের সকালে পূজার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামের সকলের সাথে আনন্দ উপভোগ করে। এ আনন্দ উৎসব তার কাছে ছিল মহামিলন মেলা।

৩। অয়ন গ্রামে কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ?

- |               |              |
|---------------|--------------|
| ক. সংক্রান্তি | খ. গৃহপ্রবেশ |
| গ. বর্ষবরণ    | ঘ. নবাব      |

৪। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে উক্ত অনুষ্ঠানটি অয়নের জীবনে এক মহামিলন মেলা।  
কারণ এ অনুষ্ঠানটি-

- i. সর্বজনীন
- ii. অসাম্প্রদায়িক চেতনার মিলন
- iii. ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কিত

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |        |                |
|--------|----------------|
| ক. i   | খ. ii          |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। প্রতি বছর কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে কনক উপবাস থেকে তার ভাই সৌবর্ণের কপালে ফোটা দিয়ে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে। তার বিশ্বাস সৌবর্ণ সকল বিপদ-আপদ থেকে পরিদ্রাগ পাবে।

- ক. বাংলা মাসের শেষ দিনকে কী বলা হয় ?
- খ. ধর্মাচার বলতে কী বোঝায় ?
- গ. কনক কীভাবে অনুচ্ছেদে বর্ণিত ধর্মাচারটি উদযাপন করছে, তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনে কলকের পালনকৃত ধর্মাচারটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

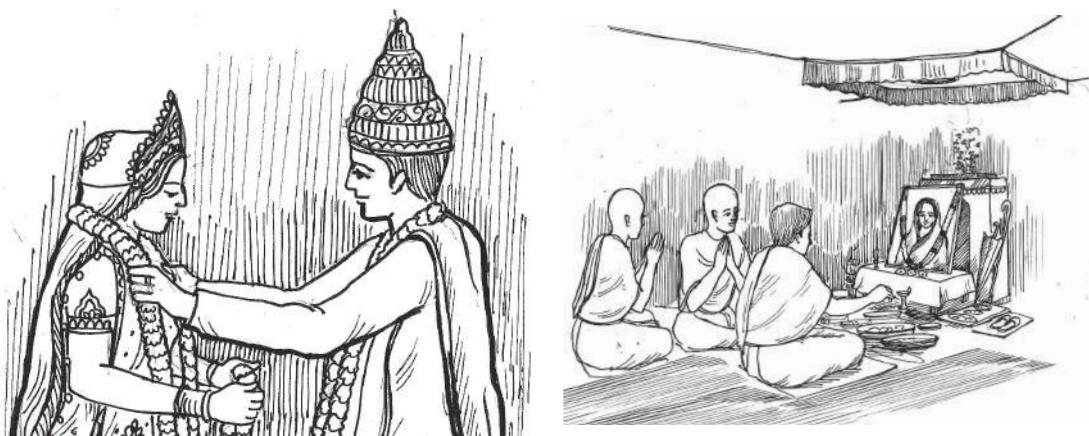
২। চৈত্র মাসে গোবিন্দ তার মা-বাবার সাথে লাঙলবন্দ মানে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সে তার মা-বাবার সাথে মান সম্পন্ন করে। মান শেষে হাজার মানুষের ভিড়ে লাঙলবন্দ মান সম্পর্কে তার কৌতূহল জাগে এবং সে লাঙলবন্দ মানের উৎপত্তি, বিকাশ ও মহাপুরুষের অবদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

- ক. পুণ্যস্থান কী ?
- খ. ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থান ভ্রমণের শুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
- গ. গোবিন্দের তীর্থ দর্শনের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের যে তীর্থস্থানের সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. তীর্থ ভ্রমণে মানুষের জীবনে যে প্রভাব প্রতিফলিত হয় তা বিশ্লেষণ কর।

## চতুর্থ অধ্যায়

### হিন্দুধর্মে সংস্কার

আমাদের এই পার্থির জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাচীন খ্যাতিরা ধর্মীয় আচার- আচরণ ও মাঙ্গলিক কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা রচনা করেছেন ‘মনুসংহিতা’, ‘যাজ্ঞবঙ্গ্যসংহিতা’, ‘পরাশরসংহিতা’ প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র। এগুলো হিন্দু ধর্মের বিধিবিধানের বিখ্যাত গ্রন্থ। এ সকল গ্রন্থে বর্ণিত বিধি-বিধানকে আশ্রয় করে হিন্দুদের সমগ্র জীবনে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন মাঙ্গলিক ক্রিয়া। মৃতজনের উদ্দেশ্যে অন্ত্যষ্টিক্রিয়া, পারলৌকিক কৃত্য প্রভৃতি সম্পাদন করার বিধি-বিধানও হিন্দুধর্মের গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত রয়েছে।



এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- ধর্মীয় সংস্কারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- বিভিন্ন সংস্কারের নাম উল্লেখ করতে পারব এবং প্রচলিত সংস্কারসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব
- পরিবার ও সমাজ জীবনে ধর্মীয় সংস্কারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- হিন্দুধর্মের বিবাহ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারব
- বিবাহের একটি মন্ত্রের সরলার্থ এবং মন্ত্রের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ‘হিন্দুবিবাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারম্পরিক সুদৃঢ় ধর্মীয় বন্ধন’- বিশ্লেষণ করতে পারব
- সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বিবাহের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব
- ‘পণপ্রথা অধর্ম’ এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব
- অন্ত্যষ্টিক্রিয়ার ধারণা ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব
- অন্ত্যষ্টিক্রিয়া শব্দেহ প্রদক্ষিণ করার সময়কার মন্ত্রটি সরলার্থসহ ব্যাখ্যা করতে পারব
- অন্ত্যষ্টিক্রিয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব
- অশৌচের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- অশৌচ পালনের পদ্ধতি এবং গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- শ্রাদ্ধের ধারণা ও আদ্যশ্রাদ্ধের বিধান ব্যাখ্যা করতে পারব
- সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব
- হিন্দুসমাজের আচার-অনুষ্ঠান পালনে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পার্থক্য না রেখে একই প্রকার বিধানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

### পাঠ ১ : ধর্মীয় সংস্কারের ধারণা ও ধরন

এতিহ্য অনুসরণ করে হিন্দুদের সমগ্রজীবনে যে-সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয় সেগুলোকে বলা হয় সংস্কার। স্মৃতিশাস্ত্রে দশবিধি সংস্কারের উল্লেখ আছে। যেমন- ১. গর্ভাধান ২. পুঁসবন ৩. সীমঙ্গলায়ন ৪. জাতকর্ম ৫. নামকরণ ৬. অল্পপ্রাশন ৭. চূড়াকরণ ৮. সমাবর্তন ৯. উপনয়ন ও ১০. বিবাহ।

এখানে প্রচলিত কয়েকটি সংস্কারের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :

**জাতকর্ম :** জন্মের পর পিতা যব, যষ্টিমধু ও ঘৃতদারা সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন একে বলে জাতকর্ম।

**নামকরণ :** সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দশম, একাদশ, দ্বাদশ বা শততম দিবসে নামকরণ করণীয়।

**অল্পপ্রাশন :** পুত্রের ষষ্ঠ মাসে এবং কন্যার পঞ্চম, অষ্টম বা দশম মাসে পূজাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম অল্পভোজনের নাম অল্পপ্রাশন।

**সমাবর্তন :** পাঠ শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হয় তার নাম সমাবর্তন। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষকমহাশয় বা গুরু শিক্ষার্থীকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিতেন।



**বিবাহ :** যৌবনে বেদ ও পিতৃপূজা, হোম প্রত্যুতির মাধ্যমে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বর ও বধুর মিলনরূপ সংস্কারকে বলা হয় বিবাহ। দশবিধি সংস্কারের মধ্যে বর্তমানে গর্ভাধান, পুঁসবন, সীমঙ্গলায়ন প্রভৃতি সংস্কার লুপ্তপ্রায়।

### পাঠ ২ : বিবাহ

হিন্দুসমাজে বিবাহ হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। স্ত্রী হচ্ছেন পুরুষের সহধর্মিণী। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুরুষের কেনো ধর্মকার্যই সম্পন্ন হয় না। ‘বিবাহ’ শব্দটি বি-পূর্বক বহু ধাতু ও ঘণ্ট প্রত্যয়যোগে গঠিত। বহু ধাতুর অর্থ ‘বহন করা’ এবং বি উপসর্গের অর্থ বিশেষরূপে। সুতরাং ‘বিবাহ’ শব্দের অর্থ বিশেষরূপে ভারবহন করা। বিবাহের ফলে পুরুষকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং মানসম্মত রক্ষার সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে হয়।

### বিবাহের প্রকারভেদ

স্মৃতিশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ মনুসংহিতায় আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে : ব্রাহ্ম, দৈব, আর্চ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ। এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্চ ও প্রাজাপত্য উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সমাজে ব্রাহ্মবিবাহ বিবাহ প্রচলিত। কন্যাকে বন্ধু দ্বারা আচ্ছাদন করে এবং অলংকার দ্বারা সজ্জিত করে বিদ্বান ও সদাচারী বরকে আমন্ত্রণ করে কন্যা দান করাকে বলা হয় ব্রাহ্মবিবাহ বিবাহ।

সমাজে গান্ধর্ব বিবাহেরও প্রচলন আছে। নারী-পুরুষ পরম্পর শপথ করে মাল্যবিনিয়য়ের মাধ্যমে যে বিবাহ করে তার নাম গান্ধর্ব বিবাহ। মহাভারতে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ গান্ধর্ব বিবাহের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

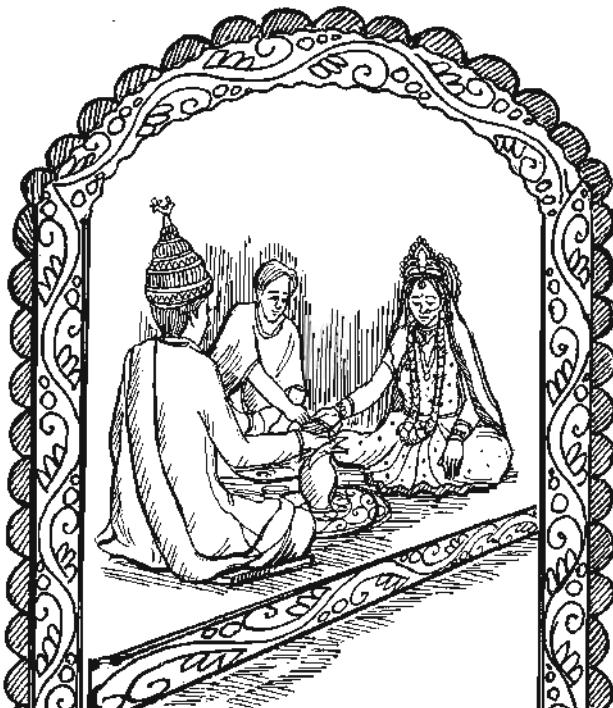
### বিবাহের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র

‘যদিদৎ হদযং তব তদস্তু হদযং মম।  
যদিদৎ হদযং মম, তদস্তু হদযং তব।’  
(ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ)

“তোমার হৃদয় আমার হোক, আমার হৃদয় হোক তোমার।” এই মন্ত্রের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গড়ে উঠে গভীর একাত্মার সম্পর্ক। জীবন হয় একসূত্রে পৌঁথা। আয়ত্ত্য তারা সুখে-দুঃখে একসাথে ধাকার প্রতিজ্ঞা করে এবং জীবনের নতুন অধ্যায়ে শুরু হয় পথ চলা।

### বিবাহের গুরুত্ব

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সমগ্র জীবনে যে-দশটি সংক্ষার বা মানসিক অনুষ্ঠান রয়েছে তন্মধ্যে বিবাহ শ্রেষ্ঠ। বিবাহের দ্বারা পুরুষ সন্তানের



জনক হয়ে লাভ করেন পিতৃত্ব এবং নারী জননীরূপে লাভ করেন মাতৃত্ব। বিবাহের মাধ্যমে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, সকলকে নিয়ে গড়ে উঠে সুখের সংসার, যাকে কেন্দ্র করে প্রেমঘীতি, মেহ, বাঞ্ছল্য প্রভৃতি মানব মনের সুকুমার বৃত্তিশূলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়। এভাবে গড়ে উঠে আলোকিত মানুষ তৈরির সূতিকাগার।

### পাঠ ৩ ও ৪ : বিবাহ অনুষ্ঠানের পর্বসমূহ

হিন্দু বিবাহে কতগুলো বিধিবিধান শাস্ত্রীয়, কতগুলো অনুষ্ঠান স্তৰ-আচার। হিন্দুবিবাহ কোনো চুক্তি নয়, ২০ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংক্ষারমূলক অধ্যায়। শুভলঘে নারায়ণ, অগ্নি, গুরু, পুরোহিত, আজ্ঞায় এবং আমন্ত্রিত

অতিথিগণকে সাঙ্গী রেখে মঙ্গলমন্ত্রের উচ্চারণ, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিয়ের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় যজ্ঞ এবং কতগুলো লোকাচারের মাধ্যমে।

বিবাহ অনুষ্ঠানের অনেক পর্ব আছে। যেমন- আশীর্বাদ, অধিবাস, বৃক্ষিশ্রান্ত, গায়ে হলুদ (গোত্র হরিদ্বা), বর-বরণ, শুভদৃষ্টি, মালাবদল, সম্প্রদান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাতপাকে বাঁধা, সিথিতে বিবাহ চিহ্ন, সঙ্গপদীগমন, বাসি বিয়ে, অষ্টমঙ্গলা প্রভৃতি। এর মধ্যে কিছু পর্ব শাস্ত্ৰীয়, আৱ কিছু অবলম্বনে লোকাচার।

### বৃক্ষিশ্রান্ত

বিবাহের দিন কিংবা তার আগের দিন উভয় পক্ষই নিজ নিজ ঘরে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করে। উভয় কুলের পিতৃপুরুষদের প্রতি এই শ্রদ্ধার্তৰ্গত করাকে বলা হয় বৃক্ষিশ্রান্ত।

### গায়ে হলুদ (গোত্র হরিদ্বা)

গায়ে হলুদ হিন্দু বিবাহের একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। বর-কনের স্ব স্ব বাড়িতে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠিত হয়। বর বা কনেকে একটি আসনের উপর বসানো হয়। বড়ো ধান, দূর্বা প্রভৃতি দিয়ে আশীর্বাদ করে আৱ ছোটৱা নমস্কার করে গালে, কপালে, হাতে হলুদ মাখিয়ে দেয়। সাথে সাথে মিটিযুখও করানো হয়।

এটি মূলত দেহশুক্রকরণ অনুষ্ঠান। কাঁচা হলুদের সাথে মেথি, সুজা, সরিয়া, চন্দন প্রভৃতি থাকে। এগুলো সবই সৌভাগ্যের প্রতীক। সুদৃঢ় বিবাহিত জীবন, নবদম্পত্তির সুখ-শাস্তি কামনা করাই এ অনুষ্ঠানের অঙ্গনিহিত উদ্দেশ্য।

**একক কাজ :** বিবাহের আগে বৃক্ষিশ্রান্ত ও গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান করা হয় কেন? কারণ উল্লেখ কর।

### মালাবদল

বর তার গলার মালাটি কনের গলায় এবং একইভাবে কনেও তার গলার মালাটি বরের গলায় পরিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়ায় পর পর তিনবার পরম্পরারে মালা বদল করা হয়।

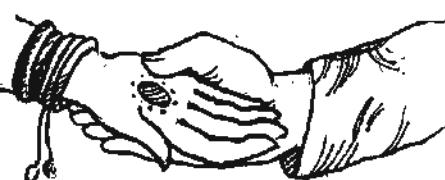
### সম্প্রদান

বিবাহের মূল পর্বই হচ্ছে সম্প্রদানপর্ব। বিবাহের নির্দিষ্ট পোশাক পরে বর-কনেকে বিয়ের পিঁড়িতে মুখোযুথি বসাতে হয়। বর পূর্বমুখী আৱ কনে পচিমমুখী হয়ে বসে।

যিনি কন্যা সম্প্রদান কৰবেন তিনি উলুরমুখী হয়ে বসেন।

পুরুলি অক্ষিত, আন্দুপদ্মবে সুশোভিত, গঙ্গাজলপূর্ণ একটা ঘটের উপর বরের চিৎ করা ভান হাতের উপর কনের ভান হাত রাখা হয়। তার উপর জাল গামছায় বাঁধা

পাঁচটি ফল কুশগত আৱ ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়। সম্প্রদানকর্তা দেবতাদের নাম উচ্চারণ কৰে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও আনন্দযন পরিবেশের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান কৰেন।



### যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাতপাকে বাঁধা

সম্প্রদান পর্বের পরে সেখানে বর্গাকার যজক্ষেত্র তৈরি করা হয়। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে মনের অহংকার, মান-অভিমান, হিংসা-বিদ্ধি, ঘৃণাসহ সকল অসাধু চিন্তারপী ঘি-মাখা আমপাতা আগুনে আহুতি দিতে হয়। এরপর দেবপুরোহিত অগ্নিকে পর পর সাতবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করতে হয়। এভাবেই সাতপাকে বেঁধে নবদম্পতি বিশুদ্ধ নব-জীবন লাভ করে। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে অগ্নিদেবের কাছে বর-কনে আমৃত্যু বাঁধা হয়ে থাকে। অনেকস্থানে কলাগাছ বেষ্টিত বিবাহ আসরে বর কনেকে সাতবার ঘোরানো হয়। বর সম্মুখে কনে তার পিছনে। বর তার বাঁ হাত দিয়ে কনের ডান হাত ধরে বিবাহ আসরের চারদিকে সাতবার ঘোরে। এর পাশাপাশি দুজনের কাপড়ের কোণা একত্র করে একটা গিটও দেওয়া হয়।

**একক কাজ :** বিবাহে শুভদৃষ্টি ও যজ্ঞানুষ্ঠানের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

### সিংথিতে বিবাহ চিহ্ন

সম্প্রদানপর্ব ও যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে বর কনের সিংথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। সিঁদুর দিয়ে বিবাহ চিহ্ন পরানো একজন হিন্দু নারীর জীবনে সবচেয়ে শুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরপর থেকেই কন্যা অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর জীবিতাবস্থায় সিংথিতে সিঁদুর পরতে পারবে। আমাদের দেশে অনেক স্থানে বাসি বিয়ের দিন অর্থাৎ বিয়ের পরদিন সিঁদুর পরানোর অনুষ্ঠান হয়।

### পণপ্রথা অধর্ম

কন্যাকে পাত্রস্ত করার সময় বরপক্ষকে যদি নগদ অর্থ, সম্পদ প্রভৃতি দিতে হয় তাহলে তাকে বলে পণ। এই পণপ্রথা বা যৌতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। বহুকাল থেকে এটি আমাদের অনেক ক্ষতি করছে। পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। এর মূলে রয়েছে অশিক্ষা, অসচেতনতা, পিতৃত্বাত্মিক ও পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এই পণপ্রথা নিন্দনীয় এবং রাস্তায়ভাবে নিষিদ্ধ। এ সমস্ত জগন্য অপরাধমূলক কাজকর্ম থেকে সমাজকে বক্ষ করার জন্য আমরা এগিয়ে আসব। এ জগন্য প্রথা নির্মূল করার জন্য দরকার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিরোধ, নারীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে যথাযোগ্য মর্যাদা দান। এছাড়াও মানসিক প্রসারতা ও জীবনমুখী শিক্ষা এ প্রথা নির্মূলে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সর্বोপরি পণ বা যৌতুকবিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে।

**একক কাজ :** সিংথিতে সিঁদুর পরানো একজন হিন্দু রমণীর জীবনে সবচেয়ে শুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ব্যাখ্যা কর।

### পাঠ ৫ : অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

‘অন্ত্য’ ও ‘ইষ্টি’ এই দুটি শব্দ মিলেই অন্ত্যেষ্টি শব্দটি গঠিত। ‘অন্ত্য’ শব্দের অর্থ শেষ এবং ‘ইষ্টি’ শব্দের অর্থ যজ্ঞ। সুতরাং অন্ত্যেষ্টি শব্দের অর্থ ‘শেষযজ্ঞ’ অর্থাৎ অগ্নিতে মৃতদেহকে আহুতি দেওয়া।

মৃত্যু মানে দেহ থেকে আত্মার বহির্গমন। আত্মা দেহ থেকে অস্তর্হিত হলে দেহ একটি প্রাণহীন অচল পদার্থে পরিণত হয় এবং ক্রমে ক্রমে এটি পচে যায়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেয়া হয়েছে। এই সৎকারাই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নামে পরিচিত।

মৃত্যুর পর দেহটিকে বস্ত্রাবৃত ও মালা চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করে শাশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে তাকে কুশের উপর শয়ন করানো হয়। দাহাধিকারী স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল ও কাঁচা হলুদ মেখে তাকে স্নান করান।

স্নানের পরে মৃতদেহকে নতুন কাপড় ও মালা পরিয়ে কপালে চন্দন দিতে হয়। এরপর দুই চোখ, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র ও মুখ এই সপ্তছিদু স্বর্ণ বা কাঁসা দ্বারা আচ্ছাদন করতে হয়। তারপর পিণ্ডান করতে হয়।

এরপর আমকাঠ বা চন্দনকাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হয়। তারপর শবকে চিতায় শয়ন করানো হয়। চন্দনকাঠ পাওয়া না গেলে ক্ষতি নেই। যেখানে যেমন কাঠ প্রাপ্য তা দিয়ে দাহকার্য সম্পন্ন করতে হবে। বর্তমানে বৈদ্যুতিক চুল্লিতেও শবদাহ করা হয়।

### অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র

এরপর অগ্নিদান শিরে অগ্নিপ্রদান করতে হবে। সাধারণত নিয়মানুসারে প্রথমে জ্যেষ্ঠ পুত্র শির বা মন্তকে অগ্নিপ্রদান করে। তার অভাবে কে অগ্নিপ্রদান করবে, তার একটি ক্রমধারা স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। প্রচলিত কথায় বলা হয় মুখাপ্তি।

অগ্নিদানের পূর্বে শবদেহ সাত বা তিনবার প্রদক্ষিণ করতে করতে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করতে হয় :

‘ওঁ কৃত্তা তু দুষ্কৃতং কর্ম জ্ঞানতা বাপ্যজ্ঞানতা ।

মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্ত্বমাগতম্ ॥

ধর্মাধর্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম্ ।

দহেয়ং সর্বগাত্রাপি দিব্যান् লোকান् স গচ্ছতু ॥’

অর্থাৎ জেনে বা না জেনে তিনি হয়ত দুর্কার্য করেছেন। এখন মৃত্যুকালবশে তিনি পঞ্চত্ত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি ধর্ম ও অধর্ম এবং লোভ ও মোহাচ্ছন্ন। তাঁর সকল শরীরের দক্ষ করমন। তিনি দিব্যলোকে গমন করমন। দাহকার্য শেষ হলে চিতায় জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে চিতা পরিষ্কার করতে হবে। শুশানবঙ্গণ বা দাহকার্যে নিয়োজিত সকলে স্নান করে পরিচ্ছন্ন হবেন।

একক কাজ : অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রটির অর্থ লেখ।

### অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শুরুত্ব

আত্মা দেহ থেকে নির্গত হলে দেহটি একটি জড়বস্তুতে পরিণত হয় এবং আকৃতিক নিয়মে ধীরে ধীরে এটি পচতে শুরু করে। ভূ-পৃষ্ঠে পড়ে থাকলে তখন ভীতির সংঘার হয় এবং পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া একটি ধর্মীয় বিধি-বিধান। তবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শুধু যে ধর্মীয় দিক থেকেই শুরুত্ব আছে তা নয়, সামাজিক দিক থেকেও এটি একটি

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଜ । କେଉଁ ମାରା ଗେଲେ ପାଡ଼ା-ପ୍ରତିବେଶୀ, ଆଜୀଯ-ସଜନ ଦେଖତେ ଆସେନ । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବାର, ଜ୍ଞାତିବର୍ଗ ଅଶୌଚ ପାଲନ କରେ ତାର ଆତ୍ମାର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେନ । ଏତେ ସାମାଜିକ ଅନୁଶାସନେର ବନ୍ଧନ ଆରା ଦୃଢ଼ ହୁଏ । ତାହାଡ଼ା ଅନ୍ୟେଟିକ୍ରିୟାର ମନ୍ତ୍ରାଳୀ ଉଚ୍ଚାରଣେର ଫଳେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୁଏ । ସକଳେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ତୈରି ହୁଏ । ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ସାମାଜିକ ମୂଳ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

### ପାଠ ୬ : ଅଶୌଚ

‘ଶୌଚ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ‘ଶୁଚିତା’ । ସୁତରାଂ ‘ଅଶୌଚ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶୁଚିତା ବା ପବିତ୍ରତାର ଅଭାବ । ମାତା-ପିତା ବା ଜ୍ଞାତିବର୍ଗେର ମୃତ୍ୟୁତେ ଆମାଦେର ଅଶୌଚ ହୁଏ । କାରଣ ପ୍ରିୟଜନେର ମୃତ୍ୟୁତେ ଆମାଦେର ମନ ଶୋକେ ଆଚଛନ୍ତି ହୁଏ । ଆମାଦେର ଚିନ୍ତା ସାଧନ- ଭଜନେର ଉପଯୋଗୀ ଥାକେ ନା । ତଥାନ ଆମରା ଅଶୁଚି ହୁଏ ।

ମାତା-ପିତାର ମୃତ୍ୟୁର ପର ଅଶୌଚ କାଳେ ହବିଷ୍ୟାନ ବା ଫଳକଳାଦି ଥେବେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରତେ ହୁଏ । ଏସମୟ କଠୋର ସଂଖ୍ୟା ପାଲନ କରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରାର ଉପଯୁକ୍ତତା ଅର୍ଜନ କରତେ ହୁଏ ।

ଅଶୌଚକାଳେ ଉଠାନେ ଏକଟି ତୁଳସୀ ଗାଛ ରୋଗନ କରେ ଦେଖାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶେ ଜଳ ଓ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରତେ ହୁଏ ।

ପିତା-ମାତାର ମୃତ୍ୟୁର ପର ଚତୁର୍ଥ ଦିନେ ଓ ଦଶମ ଦିନେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରତେ ହୁଏ । ଏଇ ପିଣ୍ଡକେ ବଲା ହୁଏ ପୂରକପିଣ୍ଡ । ପୂରକ ପିଣ୍ଡ ଦିତେ ହୁଏ ମୋଟ ଦଶଟି । ଅଶୌଚାନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରକ ମୁଖନ କରେ ନବବନ୍ଧ ପରିଧାନ କରତେ ହୁଏ । ଅଶୌଚାନ୍ତେର ଦିତୀୟ ଦିବସେ ହୁଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା । ଅଶୌଚ ପାଲନେ ବର୍ଣ୍ଣପ୍ରଥାର ଅଭାବ ଦେଖା ଯାଏ । ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣର ଚେଯେ ନିମ୍ନବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକଦେର ଅଶୌଚ ପାଲନେର ଦିବସ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ । ବ୍ରାହ୍ମଗେର ଦଶଦିନ, କ୍ଷତ୍ରିୟେର ବାରଦିନ, ବୈଶ୍ୟେର ପନରଦିନ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧେର ତ୍ରିଶଦିନ ଅଶୌଚ ପାଲନେର ବିଧାନ ଆଛେ । ତବେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟ ସକଳ ବର୍ଗେର ବା ଗୋଟ୍ରେର ମାନୁଷ ଦଶ ଦିନ ଅଶୌଚ ପାଲନ କରେ ଏକାଦଶ କିଂବା ଅତ୍ୟାଦଶ ଦିବସେ, କେଉଁ କେଉଁ ପନେର ଦିନ ଅଶୌଚ ପାଲନ କରେ ଘୋଡ଼ଶ ଦିବସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାନୁଷ୍ଠାନ କରେ ଥାକେନ ।

ଜନନାଶୌଚ ଓ ମରଣାଶୌଚ ଭେଦେ ଅଶୌଚ ଦୁଇ ପ୍ରକାର । କେଉଁ ଜନୟହତ କରିଲେ ଯେ ଅଶୌଚ ହୁଏ ତାର ନାମ ଜନନାଶୌଚ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ଯେ ଅଶୌଚ ହୁଏ ତାର ନାମ ମରଣାଶୌଚ । ସଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାତିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାକେ । ସୁତରାଂ ସଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ଜନନାଶୌଚ ଓ ମରଣାଶୌଚ ପାଲନ କରାର ନିୟମ ଆଛେ ।

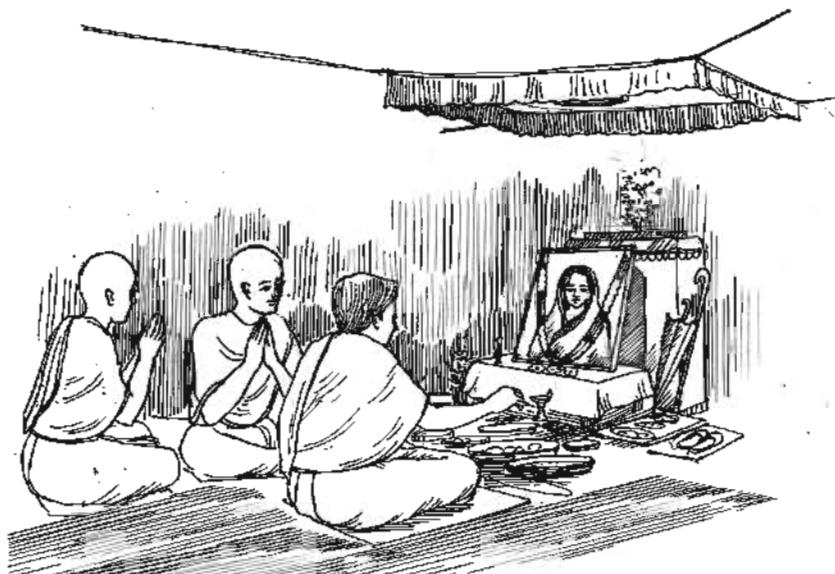
### ଅଶୌଚ ପାଲନେର ଶୁରୁତ୍ୱ

ଅଶୌଚ ପାଲନ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି-ବିଧାନ ତା-ଇ ନନ୍ଦ, ସାମାଜିକ ଦିକ ଥେକେଓ ଏଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁରୁତ୍ୱ ଆଛେ । ପିତା-ମାତାର ଜୀବନଶାୟ ସାରାଦିନ କର୍ମକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ସରେ ଫିରେ ଏଲେ ତାଁଦେର ସ୍ପର୍ଶ ଆମାଦେର ସ୍ଵର୍ଗସୁଖ ଦେଇ । ହଠାତ୍ କରେ ତାଁଦେର ଚିର ଅନୁପସ୍ଥିତ ସନ୍ତାନକେ ବିଚଲିତ କରେ ତୋଳେ । ଏମନକି ନିକଟ ଆଜୀଯ-ସଜନେର ମୃତ୍ୟୁର ଆମାଦେର ବିଷାଦଗ୍ରହ କରେ ତୋଳେ । ତାଁଦେର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି କାମନାଯ ନିଜେଦେରକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରତେ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ବିଚଲିତ ମନେ ଈଶ୍ଵରେର ପ୍ରତି ସବିନ୍ୟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ଆସେ ନା । ଏଜନ୍ୟ ଚାଇ ଶାନ୍ତ ମନ । ତାଇ ସମୟେର ପ୍ରୟୋଜନ । ଆର ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଜନ୍ୟ ଅଶୌଚ ପାଲନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏତେ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ମନେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଫିରେ ଆସେ । ଏହାଡ଼ା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବାର ଓ ଜ୍ଞାତିବର୍ଗ ଅଶୌଚ ପାଲନ କରେ ତାର ଆତ୍ମାର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେନ ।

**ଏକକ କାଜ :** ମରଣାଶୌଚ ପାଲନେର ବିଧାନଗୁଲୋ ଉଲ୍ଲେଖ କର ।

### পাঠ ৭ ও ৮ : আদ্যশ্রাদ্ধ

‘শ্রাদ্ধ’ শব্দের সঙ্গে ‘অণ’ প্রত্যয় যোগে ‘শ্রাদ্ধ’ শব্দ গঠিত। শ্রাদ্ধার সঙ্গে যা দান করা হয় তাই শ্রাদ্ধ। সুতরাং যেখানে শ্রাদ্ধার সংযোগ নেই সেখানে আড়ম্বর থাকলেও শ্রাদ্ধ হয় না। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর



প্রথমে যে শ্রাদ্ধ করণীয় তাকে বলা হয় আদ্যশ্রাদ্ধ। অশৌচকাল উত্তীর্ণ হলে তার পর দিন অনুষ্ঠিত হয় এই শ্রাদ্ধ। যতদূর জানা যায়, নিমি শ্রাদ্ধের প্রবর্তক। আদ্যশ্রাদ্ধের সময় শাঙ্কে ছয়, আট, ষেল প্রভৃতি বিভিন্ন দানের বিধান আছে। যার যেমন সামর্থ্য সে তেমন দানই করে থাকে। আদ্যশ্রাদ্ধে গীতা ও মহাভারতের বিরাট পর্ব পাঠেরও বিধান আছে। কোনো কোনো অঞ্চলে শ্রাদ্ধবাসরে কঠোপনিষদ পাঠ করা হয়।

আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণ নাম আদ্য একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ। একজন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয় বলে তাকে বলা হয় একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ। অর্থাৎ একজনের উদ্দেশে শ্রাদ্ধার সাথে দান। আদ্য একোদিষ্ট শ্রাদ্ধের প্রথমে প্রদীপ প্রজ্ঞালিত করে বাস্তুপুরুষ যজ্ঞেশ্বর ও ভূবামীর পূজা করণীয়। অতঃপর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করতে হয়। এই সময় আসন, ছাতা, পাদুকা, বন্ধ, অল, জল, তামুল, মালা, বিছানা প্রভৃতি মৃতব্যক্তির নামে মন্ত্রোচ্চারণসহ উৎসর্গ করা হয়। পরে পিণ্ডান করে আদ্য একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ সমাপ্ত করা হয়। নারীরাও অশৌচ এবং চতুর্থী প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন।

### পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব

আদ্যশ্রাদ্ধের যে শুধু ধর্মীয় দিক থেকেই গুরুত্ব আছে তা নয়, পারিবারিক ও সামাজিক দিক থেকেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট। কেউ মারা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী, আজীয়-স্বজন যেমন দেখতে আসেন তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার পরিবার, জাতিবর্গের দৃঢ়ত্বের সাথে একাজ্ঞ হন। এতে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। সকলেই সমব্যক্তি হয়। পাশাপাশি আজীয়-স্বজনের একটি

ମିଳନମେଲାଓ ହୟ । ଏକଜନେର ପ୍ରତି ଆରେକ ଜନେର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଲୋବାସା ବେଡ଼େ ଯାଯ । ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଜନ୍ମେର ମଧ୍ୟେ ସାମାଜିକତାର ବୀଜ ଅଛୁରିତ ହୟ ।

**ଏକକ କାଜ : ଆଦ୍ୟଶାନ୍ତ କରାର ସମୟ କି କି ଦାନ କରତେ ହୟ ?**

### ଅଭିନ୍ନ ବିଧାନେର ପ୍ରୋଜନୀୟତା ଓ ଶୁରୁତ୍ୱ

ହିନ୍ଦୁ ସମାଜେର ଆଚାର-ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଲନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟେ କୋଣୋ ପ୍ରକାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନା ରେଖେ ଏକଇ ପ୍ରକାର ବିଧାନେର ପ୍ରୋଜନୀୟତା ଦେଖା ଦିଯେଇଛେ । କେନନା ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାଯ ବଲା ହେଁବେ ଜନ୍ମଭେଦେ ନୟ, ବରଂ କର୍ମଭେଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣବିଭାଜନ ହୟ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଯେ ରକମ ପେଶାଯ ନିଯୋଜିତ ତାର ବର୍ଣ୍ଣଟି ସେ ଅନୁସାରେ ହୟ । ଏ ପ୍ରମଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାଯ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଲେଛେ- ‘ଚାତୁର୍ବର୍ଷ୍ୟେ ମନ୍ମା ସୃଷ୍ଟିଃ ଶୁଣକର୍ମବିଭାଗଶ୍ତ’- ଅର୍ଥାତ୍ - ଶୁଣ ଓ କର୍ମର ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଆମିଇ ଚାରଟି ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରେଇ ।

ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ହେଁଇ ଯେ ଏକଜମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଲେ ଗଣ୍ୟ ହବେ, ଏମନଟି ନୟ । ସନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଭାବିତ କୋଣୋ ଶୁଦ୍ଧେର ସନ୍ତାନଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦବାଚ୍ୟ ହତେ ପାରେନ । ଆବାର କୋଣୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ-ସନ୍ତାନ ତମଃ ଶୁଣେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ବଲେ ଗଣ୍ୟ ହବେନ । ସୁତରାଂ ବଲା ଯାଯ, ଜାତି ବା ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ବନ୍ଧଗତ ନୟ, ଶୁଣ ଓ କର୍ମଗତ ।

ଆଶୀର୍ଚ୍ଛା ପାଲନେର ଦିବସସଂଖ୍ୟାଯ ତାରତମ୍ୟ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନେର ଭିନ୍ନତା ଯୌଡ଼ିକ ନୟ । ଆର ସେଜନ୍ୟାଇ ବର୍ତମାନେ ପ୍ରାୟ ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣର ମାନୁଷ ଦଶ ଦିନ ଅଶୀର୍ଚ୍ଛା ପାଲନ କରେ ଏକାଦଶ କିଂବା ଦ୍ୟାନଦଶ ଦିବସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାନୁଷ୍ଠାନ କରଛେ । କିନ୍ତୁ ଏଟା ସେହାକୃତ । ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଜନ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ ବିଧାନ ଯୌଡ଼ିକ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜେର ସାମାଜିକ ଐକ୍ୟ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦୀତିର ଜନ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ ବିଧାନ ପ୍ରୋଜନ ।

**ନୃତ୍ୟନ ଶବ୍ଦ :** ପାର୍ଥିବ, ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗା, ଯୋହାଚନ୍ଦ୍ର, ଜନନାଶୀଚ, ମରଣାଶୀଚ, ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ଥିତିକ୍ରିୟା, ହବିଷ୍ୟାନ, ମୁଣ୍ଡନ, ବିଷାଦଗ୍ରହ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ପାଦୁକା, ତାମ୍ରଳ, ଅଛୁରିତ ।

### ଅନୁଶୀଳନୀ

#### ବହନିର୍ବାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ :

୧ । ନାରୀ-ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରା ଶପଥ କରେ ମାଲ୍ୟ ବିନିମୟେର ମାଧ୍ୟମେ କୋଣ ବିବାହ ସଂସାରିତ ହୟ ?

- କ. ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ
- ଖ. ଗାନ୍ଧର୍ବ
- ଘ. ଆସୁର
- ଘ. ବ୍ରାହ୍ମ

୨ । ସମାବର୍ତ୍ତନ ବଲତେ କୀର୍ତ୍ତପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋବାଯ ?

- କ. ପାଠ୍ୟହରଣେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶୁରୁଗୁହେ ଗମନ
- ଖ. ପାଠ୍ୟହରଣକାଳେ ଶୁରୁକେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ
- ଘ. ପାଠ୍ୟଶେଷେ ଶୁରୁଗୁହ ଥିକେ ବିଦ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
- ଘ. ପାଠ୍ୟଶେଷେ ଶୁରୁଗୁହ ଥିକେ ନିଜଗୁହେ ଫିରେ ଆସା ।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

গোপাল তার ঠাকুরদার একমাত্র নাতি। চোখের সামনে ঠাকুরদার মৃত্যুতে সে শোকাহত হয়। গোপাল দেখে মৃত্যুর পর তার ঠাকুরদার দেহটিকে ফুলের মালা ও চন্দন দিয়ে সাজিয়ে তার বাবা ও পাড়া-প্রতিবেশীরা শুশানে নিয়ে যায়। শাক্ত অনুবাদী গোপাল ও তার বাবা মা-বাব দিন অশোচ পালন করেন।

৩। গোপালের ঠাকুরদাকে শুশানে নিয়ে যাওয়ার কারণ কোনটি ?

- ক. হিন্দুয়ান পালন      খ. নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন
- গ. আদ্যশ্রান্ত সম্পন্ন      ঘ. অঙ্গেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন

৪। তাদের অশোচ পালনের মাধ্যমে অর্জিত হবে-

- i. শ্রান্ত করার উপযুক্ততা
- ii. আত্মার শান্তি কামনায় নিজেদের প্রস্তুত করা
- iii. শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান পালন করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii  | খ. ii ও iii    |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

মাতক পরীক্ষা শেষে মিতার বাবা-মা তার বিবাহের দিন ধার্য করে। ঐদিন মিতাকে বন্ধ ও অলংকার সজ্জিত করে তার বাবা তাকে বরের হাতে সম্প্রদান করেন। এ অনুষ্ঠানে পুরোহিত মন্ত্র পাঠ ও যজ্ঞের মাধ্যমে তাদের বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেন।

- ক. সংক্ষার কী ?
- খ. কেন অশোচন অনুষ্ঠান করা হয় ?
- গ. মিতার বিবাহ পদ্ধতিটি তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মিতার বিবাহ কার্য সম্পাদনে যজ্ঞানুষ্ঠানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

## পঞ্চম অধ্যায়

### দেব-দেবী ও পূজা

দেব-দেবী, পূজা, পূজার উপকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে অন্যান্য প্রেরিতে আমাদের কিছুটা ধারণা হয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা পূজা, পুরোহিতের ধারণা ও যোগ্যতা, দেবী দুর্গা, কালী, শীতলা ও কার্তিকের পূজা নিয়ে আলোচনা করব। দেবী দুর্গা ঐশ্বরিক মাতা যিনি সকল দুঃখ-দুর্দশ দূর করে আমাদের পারিবারিক এবং সমাজ জীবনে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দেবী কালী ঐশ্বরিক মহাশক্তি ও ত্রাণকারীরূপে যে-কোনো ধরনের দুর্যোগের সময় আমাদের মাঝে আবির্ভূত হন। দেবী শীতলা শৌকিক দেবী হলেও গ্রাম বাঢ়ায় তিনি ঠাকুরানি নামে পরিচিত। তিনি শান্তির দেবী হিসেবে সকলের কাছে অতি পরিচিত। কার্তিক ভগবান শিবের পুত্র এবং দেব সেনাপতি। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা তাঁকে রক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে পূজা করে থাকেন। এ অধ্যায়ে উল্লিখিত দেব-দেবীর পরিচয়, পূজা পদ্ধতি, প্রণাম মন্ত্র ও সমাজ জীবনে এ সকল পূজার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।



এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- পূজা ও পুরোহিতের ধারণা ব্যাখ্যা এবং পুরোহিতের যোগ্যতা বর্ণনা করতে পারব
- দেব-দেবীর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- দুর্গা নামের ব্যৃৎপদ্ধি ব্যাখ্যা করতে পারব
- দেবী দুর্গার পরিচয় ও ক্লপ বর্ণনা করতে পারব
- দুর্গা পূজা পদ্ধতি (বোধন থেকে বিসর্জন) বর্ণনা করতে পারব
- দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্রের সরলার্থ ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- কুমারী পূজা ও বিজয়া দশমীর তাৎপর্য ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে দুর্গা পূজার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- নিজ জীবনাচারণে দুর্গা পূজার শিক্ষার অনুশীলনে উদ্বৃদ্ধ হব
- দেবী কালীর পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- কালী পূজার ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্রের সরলার্থ ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কালী পূজার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব এবং নিজ জীবনাচারণে কালী পূজার শিক্ষার অনুশীলন করতে পারব

- শীতলা দেবীর পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- শীতলা পূজার প্রণাম মন্ত্রের সরলার্থ ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- শীতলা পূজার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব
- নিজ জীবনাচরণে শীতলা পূজার প্রভাব উপলক্ষ্মি করে পূজা-অর্চনা অনুশীলনে উন্নুন্দ হব
- কার্তিক দেবের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব
- কার্তিক পূজার ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্রের সরলার্থ ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- কার্তিক পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব এবং দেব মাহাত্ম্য প্রচার ও দেবের শিক্ষা উপলক্ষ্মি করে পূজার্চনা অনুশীলনে উন্নুন্দ হব।

### পাঠ ১ : পূজা ও পুরোহিত

‘পূজা’ শব্দের অর্থ প্রশংসন বা শন্মুক্তা জানানো, যা পুষ্প কর্মের মধ্য দিয়ে অর্চনা বা উপাসনার মাধ্যমে করা হয়। হিন্দুধর্মে ‘পূজা’ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঈশ্বরের প্রতীক বা তাঁর কোনো রূপকে (দেব-দেবী) সন্তুষ্ট করার জন্য ভক্তি সহকারে ফুল, দুর্বা, তুলসী পাতা, বিছপত্র, চন্দন, আতপচাল, ধূপ, দীপ প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে পূজা করা হয়। পূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে বা দেব-দেবীদের কাছে মাথা নত করা এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভের প্রয়াস। আমরা জানি, দেব-দেবীরা ঈশ্বরের গুণ বা শক্তির প্রকাশ। তাই দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য যে অনুষ্ঠানাদি করা হয় তাকে ‘পূজা’ বলে।

### পুরোহিত

পুরোহিত শব্দটি ‘পুরস্ত’ (পুরঃ) এবং ‘হিত’ শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। পুরস্ত শব্দের অর্থ সম্মুখে এবং হিত শব্দের অর্থ অবস্থান। সম্মুখভাগে যিনি অবস্থান করেন তিনি পুরোহিত। সাধারণ অর্থে পুরোহিত বলতে পূজা-অর্চনা কার্যাদি সম্পাদনকারীকে বোঝানো হয় এবং যিনি পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে অবস্থান করেন। সাধারণভাবে যিনি পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠান পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে থাকেন, তাঁকে পুরোহিত বলে। এটা একটা পেশাও বটে। যার নামে সংকল্প করে পূজা করা হয় তাকে যজমান বলে। যজমান নিজেও পূজা করতে পারেন। তবে সাধারণত যজমান পুরোহিতকে পূজা করে দেয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনেন। সাধারণত ব্রাহ্মণ বর্ণের লোকেরাই পৌরোহিত্য করে থাকেন। তবে পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ এক কথা নয়। ব্রাহ্মণ বলতে যাঁদের ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে



ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଧାରଣା ଆହେ ବା ଯିନି ବ୍ରାହ୍ମବିଦ, ଏମନ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ବୋବାନୋ ହୟ । ପୌରୋହିତ୍ୟ କରାର ସମୟ ସଂକ୍ଷିତ ଭାଷାଜ୍ଞାନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଥାକା ପ୍ରୋଜନ । ଯଁରା ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନା, ଯଜନ-ୟାଜନ କରତେନ, ତାଁରା ଛିଲେନ ବ୍ରାହ୍ମଗ ସମ୍ପଦାଯେର । ତାଇ ପୌରୋହିତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଗ ବର୍ଣେରଇ ପେଶା ଛିଲ । ଏକାଳେ ସଂକ୍ଷିତ ଭାଷାଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ସକଳ ବର୍ଣେର ମଧ୍ୟେଇ ଦେଖା ଯାଏ । ସୁତରାଂ ଏକାଳେ ସଂକ୍ଷିତ ଭାଷା ଓ

ଶାସ୍ତ୍ରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ଯେକୋନୋ ବର୍ଣେର ବ୍ୟକ୍ତିଇ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରାର ଯୋଗ୍ୟ । ପୁରୋହିତେର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶୁଣାବଳି ଥାକା ପ୍ରୋଜନ :

### ପୁରୋହିତେର ଶୁଣାବଳି

ପୁରୋହିତ ଏକଜନ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି । ତିନି ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ପୂଜା-ଅର୍ଚନାଦି ପରିଚାଳନା କରେ ଥାକେନ । ଏ କାରଣେଇ ତାଁକେ ନିମ୍ନବର୍ଣ୍ଣିତ ଗୁଣେର ଅଧିକାରୀ ହତେ ହୟ-

୧. ହିନ୍ଦୁଧର୍ମବଳୟୀ ଯେ-କୋନୋ ବର୍ଣେର ମାନୁଷେର ପୌରୋହିତ୍ୟ କରାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ ।
୨. ସଂକ୍ଷିତ ଭାଷା ଲେଖା ଓ ପଡ଼ାର ମତୋ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ଥାକା ।
୩. ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କେ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଥାକା ।
୪. ନିତ୍ୟକର୍ମ ଓ ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପର୍କେ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଧାରଣା ଥାକା ।
୫. ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରୀତି-ନୀତି ଓ ପ୍ରଥାର ଉପର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାକା ।
୬. ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥେକେ ଧର୍ମନୂରାଗୀ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓ ଜନସାଧାରଣେର ପ୍ରତି ମମତ୍ବବୋଧ ଥାକା ।
୭. ଶୁଦ୍ଧତାବେ ମତ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣେର ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ ।
୮. ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ଓ ଧର୍ମୀୟ ଆଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନିୟମ-ନୀତି ସମ୍ପର୍କେ ବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାକା ।
୯. ପରିକାର-ପରିଚଳନ ଥାକା ।
୧୦. ଆଚରଗତ ଦିକ ଥେକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ, ସ୍ମୃତି, ନ୍ୟାୟପରାଯଣ ଏବଂ କଥା ଓ କାଜେର ସମସ୍ୟ ଥାକା ।
୧୧. ଶିଷ୍ଟାଚାରସମ୍ପଲ୍ ଓ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵେର ଅଧିକାରୀ ହେଁଯା ।

### ପାଠ ୨ : ଦେବ-ଦେବୀର ଧାରଣା

ଈଶ୍ୱର ସୀମାହୀନ ଶୁଣ ଓ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ । ତିନି ଯଥନ ନିଜେର କୋନୋ ଶୁଣ ବା କ୍ଷମତାକେ କୋନୋ ବିଶେଷ ଆକାର ବା ଝାପେ ପ୍ରକାଶ କରେନ, ତଥନ ତାଁକେ ଦେବତା ବଲେ । ଦେବତାରା ଆଲାଦା ଶୁଣ ବା ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହଲେଓ ଈଶ୍ୱର ନନ । ଈଶ୍ୱର ଏକ ଓ ଅଦ୍ଵିତୀୟ । ଦେବତାରା ଏକ ଈଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଶୁଣ ବା ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ । ଖାଗ୍ବେଦେର ଏକଟି ମତ୍ରେ ବଲା ହେଁଯେ ।

‘ଏକେ ସଦ୍ ବିଦ୍ଵା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି ।’

ଅର୍ଧାଂ ଏକ, ଅଖଣ୍ଡ ଓ ଚିରନ୍ତନ ବ୍ରାହ୍ମକେ ବିପ୍ରଗଣ ଓ ଜ୍ଞାନୀରା ବହୁ ନାମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେ । ଦେବତାଦେର ବିଭିନ୍ନ ଶୁଣ ବା କ୍ଷମତାର ଜଳ୍ୟ ତାଁଦେର ପୂଜା କରା ହୟ । ପୂଜାର ମାଧ୍ୟମେ ତାଁରା ଖୁଶି ହନ । ମାନୁଷ ଦେବତାଦେର କୃପା ଲାଭ ଏବଂ ସୁଖ-ଶାସ୍ତ୍ରିତେ ବସବାସ କରାର ଜଳ୍ୟ ପୂଜା କରେ । ଦେବତାଦେର ପୂଜା କରିଲେ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୃଷ୍ଟ ହନ ଏବଂ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦାନ କରେନ ।

দেব, দেবী বা দেবতা শব্দ 'দিব' থাকু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। দিব + অচ = দেব। জীবিতে দেবী বলা হয়। দিব ধাতুর অর্থ প্রকাশ পাওয়া। তাই বলা হয়েছে, যিনি প্রকাশ পান, যিনি ভাস্তু, তিনি দেবতা। দেব-দেবী ও দেবতা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যিনি দান করেন তিনি দেবতা। আবার যিনি নিজে প্রকাশ পেয়ে অন্যকে প্রকাশ করেন তিনিও দেবতা। পুরাণে খ্যানলক্ষ দেবতাদের বিশ্ব বা প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করার বিধান উন্নিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বেদে দেবতাদের দেহ অস্ত্রময়।

### দেবতাদের প্রেরণিভিত্তি

হিন্দুধর্মবলবীদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদের উপর ভিত্তি করে 'পুরাণ' গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে। বেদ ও পুরাণে বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপ, শক্তি, প্রভাব, সামাজিক গুরুত্ব এবং পূজা-প্রণালি বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দুধর্ম হঙ্গের উপর ভিত্তি করে দেব-দেবীদের নিম্নলিখিত ভাগ করা হয়েছে-

১. বৈদিক দেবতা
২. গৌরাণিক দেবতা এবং
৩. শোকিক দেবতা।

ক. বৈদিক দেবতা : বেদে যে-সকল দেবতার কথা বলা হয়েছে, তাঁদেরকে বৈদিক দেবতা বলা হয়। যেমন- অগ্নি, ইন্দ্ৰ, যিতা, রূদ্ৰ, বৰুণ, বায়ু, সোম প্রভৃতি। বৈদিক দেবী হিসেবে সরোবরী, উষা, অদিতি, রাত্রির নাম উল্লেখ করা যায়। বৈদিক দেব-দেবীর কোনো বিশ্ব বা মৃত্তি ছিল না। তবে বৈদিক মন্ত্রে সকল দেবতার রূপ, গুণ ও ক্ষমতার বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক পূজাপূজ্যতা ছিল যোগ বা হোম ভিত্তিক। বৈদিক উপাসনা ঝীতিতে প্রতিমা পূজা ছিল না। হোমানল বা অগ্নির মাধ্যমে বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে অন্যান্য দেবতাকে আহ্বান করা হতো। অগ্নিকে বলা হয়েছে- তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, দীক্ষিময়, দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক।



ଯଜ୍ଞେର ଜଳ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞଲିତ ଅଗିତେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାର ଜଳ୍ୟ ସୃତ, ପିଠେ, ପାଯେସ, ପ୍ରଭୃତି ଅର୍ପଣ କରା ହତୋ । ବୈଦିକ ଋସିରା ବିଶ୍ୱବିକ୍ଷାଣେର କର୍ମକାଣ୍ଡକେ ଏକାଟି ବୃହ୍ତ ଯଜ୍ଞ ବଲେ ମନେ କରତେନ । ତାଇ ତାଦେର ଯଜ୍ଞକର୍ମ ବିଶ୍ୱଯଜ୍ଞେର ପ୍ରତୀକ ହୁଏ ଉଠେଛିଲ । ଏ ସମୟ ଯଜ୍ଞଇ ଛିଲ ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମକର୍ମ । ଯଜ୍ଞେର ମାଧ୍ୟମେ ବୈଦିକ ଋସିରା ଦେବ-ଦେବୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରତେନ ।

**ଖ. ପୌରାଣିକ ଦେବତା :** ପୁରାଣେ ଯେ-ସକଳ ଦେବତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହୁଯେଛେ, ତାଦେର ପୌରାଣିକ ଦେବତା ବଲା ହୁଯ । ଯେମନ, ବ୍ରହ୍ମ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା, ସରସ୍ଵତୀ ପ୍ରଭୃତି ।

ପୌରାଣିକ ଯୁଗେ ବୈଦିକ ଦେବତାଦେର ଅନେକେରଇ ରୂପେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେଛେ ଏବଂ ଅନେକ ନତୁନ ଦେବତାର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେଛେ । ବେଦେ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ବିକ୍ଷୁକେ ପୁରାଣେ ଦେଖା ଯାଇ ଶଞ୍ଚ-ଚଞ୍ଚ-ଗଦା-ପଦ୍ମଧାରୀରାପେ । କିନ୍ତୁ ବେଦେ ବିକ୍ଷୁର ଆକୃତି ଓ ପ୍ରକୃତି ମଞ୍ଚମଯ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ମାତ୍ର । ବେଦେର ବିକ୍ଷୁ ମୂଳତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ।

**ଘ. ଲୌକିକ ଦେବତା :** ବେଦେ ଓ ପୁରାଣେ ଯେ-ସକଳ ଦେବତାର କଥା ବଲା ହୁଯ ନି, କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗଗଣ ତାଦେର ପୂଜା କରେନ, ତାଦେର ବଲା ହୁଯ ଲୌକିକ ଦେବତା । ଯେମନ- ମନସା, ଶୀତଳା, ଦକ୍ଷିଣ ରାଯ ପ୍ରଭୃତି । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ମନସା ଦେବୀସହ ଆରା ଅନେକ ଲୌକିକ ଦେବତା ପୁରାଣେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଯେଛେ ।

### ଦେବ-ଦେବୀର ପୂଜା

ସକଳ ଦେବ-ଦେବୀର ପୂଜା ଏକଇ ସମୟ କରା ହୁଯ ନା । ଅନେକ ଦେବ-ଦେବୀର ଜଳ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସ, ସମୟ, ତିଥି ରଯେଛେ । ଯେମନ ବିକ୍ଷୁ, ଶିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପୂଜା ପ୍ରତିଦିନଇ କରା ହୁଯ । ଆବାର ବ୍ରହ୍ମା, କାର୍ତ୍ତିକ, ସରସ୍ଵତୀ ପ୍ରଭୃତି ଦେବ-ଦେବୀର ପୂଜା ବିଶେଷ ବିଶେଷ ତିଥିତେ କରା ହୁଯ । ସାମାଜିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣଗତ ଦିକ ଥେକେ ପୂଜା ଦୁଇଭାବେ କରା ହୁଯ- ପାରିବାରିକ ପୂଜା ଓ ସର୍ବଜନୀନ ପୂଜା । ପାରିବାରିକ ସକଳ ମାନୁଷେର ଅଂଶଗ୍ରହଣେର ମାଧ୍ୟମେ ଯେ ପୂଜା କରା ହୁଯ ତାକେ ପାରିବାରିକ ପୂଜା ବଲେ । ସମାଜେର ସକଳ ମାନୁଷେର ଅଂଶଗ୍ରହଣେ ଯେ ପୂଜା କରା ହୁଯ ତାକେ ସର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ବଲେ । ମୂଳତ ସର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ଉଦ୍ୟାପନେର ମାଧ୍ୟମେ ଉତ୍ସବେର ସୃଷ୍ଟି ହୁଯ ।



### ପାଠ ୩ : ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା : ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାର ପରିଚୟ ଓ ରୂପ

ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଦୈତ୍ୟରେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ । ତିନି ଅଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମହାମାୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି । ତିନି ଜୟଦୁର୍ଗା, ଜଗନ୍ନାଥୀ, ଗନ୍ଧେଶ୍ୱରୀ, ବନଦୁର୍ଗା, ଚନ୍ଦ୍ରୀ, ନାରାୟଣୀ ପ୍ରଭୃତି ନାମେଓ ପୂଜିତା ହନ ।

### ଦୂର୍ଗା ନାମର ବୃଦ୍ଧପଣ୍ଡିଗତ ଅର୍ଥ

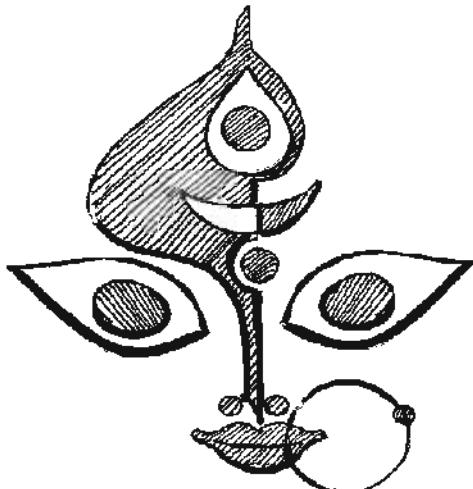
ଦୂଃ - ଗମ + ଅ = ଦୂର୍ଗ । ସେ ହାଲେ ଗମନ କରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରୁତ୍ୱ ତାକେ ଦୂର୍ଗ ବଲେ । ଦୂର୍ଗ ଶବ୍ଦର ସଙ୍ଗେ ଆ ଅତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରେ ଦୂର୍ଗା ଶବ୍ଦଟି ଗଠନ କରା ହେଲେ ଏବଂ ଜୀବିଜେ ସ୍ଵାଭାବିକ କରା ହେଲେ । ଯିନି ଯହାମାଆ ତିନି ଦୂର୍ଧିଗମ୍ୟ - ତାକେ ଦୂଷ୍ଟାଧ୍ୟ ସାଧନାର ଘାରା ପାଓଯା ଥାଏ । ତାଇ ତିନି ଦୂର୍ଗା । ତିନି ବ୍ରାହ୍ମର ଶକ୍ତି ବଳେର ଦୂର୍ଧିଗମ୍ୟ ଏବଂ ସାଧନ ସାପେକ୍ଷ । ଆବାର ଦୂର୍ଗମ ନାମକ ଅସୁରକେ ବଧ କରେଛେ ବଳେର ତାକେ ଦୂର୍ଗା ବଳା ହୁଏ । ଦୂର୍ଗା ଶବ୍ଦର ଆରୋକଟି ଅର୍ଥ ହଲୋ ଦୂର୍ଗାତିଳାଶିଳୀ ଦେବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯହାବିଶ୍ୱେର ସାବତୀୟ ଦୁଃଖ-କଟ୍ ବିନାଶକାରିଣୀ ଦେବୀ ।

ଏକବାର ମହିଷାସୁର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରେର କାହିଁ ଥେକେ ସ୍ଵର୍ଗରାଜ୍ୟ କେଡ଼େ ନିଯୋଜିଲ । ତଥାନ ଦେବତାଦେର ସମ୍ମିଳିତ ତେଜ ଥେକେ ଆବିର୍ଭୃତ ହେଲେଇଲେମ ଦେବୀ ଦୂର୍ଗା । ଦେବୀ ଦୂର୍ଗା ମହିଷାସୁରକେ ବଧ କରେଇଲେମ । ଏଜନ୍ୟ ଦେବୀ ଦୂର୍ଗାକେ ମହିଷମଦିନୀ ବଳା ହୁଏ । ହିନ୍ଦୁରା ପ୍ରାଚୀନକାଳ ଥେକେଇ ଭକ୍ତିଭରେ ତାର ପୂଜା କରେ ଆସିଲେ । ଦୂର୍ଗା ପୂଜାଯ ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷେ ସକଳ ଶ୍ରେଣିର ଜନସାଧାରଣ ନାନାଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭର୍ତ୍ତର କରେ ଥାକେ । ଏ କାରଣେଇ ଦୂର୍ଗା ପୂଜା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜେ ସର୍ବବୃଦ୍ଧ ଉତସର ହିସେବେ ବିବେଚିତ ।

### ଦେବୀ ଦୂର୍ଗାର ରୂପ

ଦେବୀ ଦୂର୍ଗା ଦଶଭୂଜୀ । ତାର ଦଶଟି ଭୂଜ ବା ହାତ ବଲେଇ ତାର ଏହି ନାମ । ତାର ଦଶଟି ହାତ ତିନଟି ଚୋଖ ରଯେଇଲେ । ଏ ଜନ୍ୟ ତାକେ ତିନିଯାନା ବଳା ହୁଏ । ତାର ବାଯ ଚୋଖ ଚନ୍ଦ୍ର, ଡାନ ଚୋଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବା କପାଳେର ଉପର ଅବହିତ ଚୋଖ - ଜାନ ବା ଅଗ୍ନିକେ ନିର୍ଦେଶ କରେ । ତାର ଦଶ ହାତେ ଦଶଟି ଅଞ୍ଚଳ ରଯେଇ ଯା ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଧର ପ୍ରାଣୀ ସିଂହ ତାର ବାହନ ।

ସିଂହ ଶକ୍ତିର ଧାରକ । ଦେବୀ ହିସେବେ ଦୂର୍ଗାର ଗାୟେର ରଖ ଅଭସୀ କୁଲେର ମତୋ ସୋନାଲି ହଲୁଦ । ତିନି ତାର ଦଶ ହାତ ଦିଯେ ଦଶଦିକ ଥେକେ ସକଳ ଅକଳ୍ୟାଣ ଦୂର କରେନ ଏବଂ ଆମାଦେର କଳ୍ୟାଣ କରେନ । ଦେବୀ ଦୂର୍ଗାର ଡାନଦିକେର ପୌଛ ହାତେର ଅନ୍ତରୁଲୋ ସଥାନରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ଥର୍ଦ୍ଗ, ଚଞ୍ଚ, ବାଣ ଓ ଶକ୍ତି । ବାଯଦିକେର ପୌଛ ହାତେର ଅନ୍ତରୁଲୋ ହଲୋ ଖେଟକ (ଢାଳ), ପୂର୍ଣ୍ଣଚାପ (ଧନୁକ), ପାଶ, ଅଛୁଟ, ଘର୍ତ୍ତା, ପରତ (କୁଠାର) । ଏ ସକଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେବୀ ଦୂର୍ଗାର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଓ ଶୁଣେର ପ୍ରତୀକ ।



## ପାଠ ୪ : ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଦ୍ଧତି

### ଉତ୍ସବେର ସମୟ ଓ ପୂଜାର ଉପକରଣ

ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶେର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପଦାଯେର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମୀୟ ଉତ୍ସବ । ବଚରେ ଦୁବାର ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବେର ପ୍ରଥା ରଯେଛେ । ଆଶ୍ରିତ ମାସେର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷେ ଶାରଦୀୟ ଏବଂ ଚୈତ୍ର ମାସେର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷେ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରା ହୁଏ । ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପଞ୍ଚମ ବାଂଲାୟ ମହାଲୟା ଉଦୟାପନେର ମାଧ୍ୟମେ ଦେବୀଦୁର୍ଗାର ଆଗମନୀ ଘୋଷିତ ହୁଏ । ଆଶ୍ରିତ ମାସେର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେର ସତ୍ତୀ ତିଥିତେ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ଶୁରୁ ହୁଏ ଏବଂ ପାଂଚ ଦିନବ୍ୟାପୀ ଚଲାତେ ଥାକେ । ଦଶମ ଦିନେ ଦଶମୀ ପୂଜାର ମାଧ୍ୟମେ ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବେର ସମାପ୍ତି ଘଟେ । କୋଣୋ କୋଣୋ ସ୍ଥାନେ ଆଶ୍ରିତ ମାସେର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେର ପ୍ରତିପଦ ତିଥି ଥେବେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଶୁରୁ କରାର ନୀତିଇ ଅଧିକ ଅନୁସ୍ରତ ।

ତିଥି ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ସମୟକେ ନିମ୍ନରୂପେ ଶ୍ରେଣିବିଭାଗ କରା ହୁଏ -

ପ୍ରଥମ ଦିନ : ଦୁର୍ଗାର ସତ୍ତୀ-ବୋଧନ, ଆମଞ୍ଚଳ ଓ ଅଧିବାସ;

ଦ୍ୱାତୀୟ ଦିନ : ମହାସଂଗ୍ମୀ ପୂଜା- ନବପତ୍ରିକା ପ୍ରବେଶ ଓ ସ୍ଥାପନ, ସଂଗ୍ମାଦିକଙ୍କାରାଷ୍ଟ, ସଂଗ୍ମୀବିହିତ ପୂଜା;

ତୃତୀୟ ଦିନ : ମହାଷଂଗ୍ମୀ ପୂଜା, କୁମାରୀ ପୂଜା, ସଂକଳିତ ପୂଜା; ଚତୁର୍ଥ ଦିନ : ନବମୀବିହିତ ପୂଜା; ପଞ୍ଚମ ଦିନ : ଦଶମୀପୂଜା, ବିସର୍ଜନ ଓ ବିଜୟ ଦଶମୀ ।

ବୃଦ୍ଧ ନନ୍ଦିକେଶର ପୂରାଣ, ଦେବୀ ପୂରାଣ ଓ କାଳିକା ପୂରାଣେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣନ କରା ହେଁବାକୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜାଯ ବହୁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହତ ହୁଏ ।

## ପାଠ ୫ : ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଦ୍ଧତି : ସତ୍ତୀ ଓ ସଂଗ୍ମୀ ପୂଜା

### ସତ୍ତୀପୂଜା

ମହାଲୟା ଅମାବସ୍ୟାର ପରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷେର ସତ୍ତୀ ତିଥିତେ ସତ୍ତୀ ପୂଜାର ଆୟୋଜନେର ମାଧ୍ୟମେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଶୁରୁ ହୁଏ ।

ସୁତ୍ତଭାବେ ପୂଜା ଉଦୟାପନ କରାର ଜନ୍ୟ ନିଜେକେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାର ସଂକଳ୍ପ କରା ହୁଏ । ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ ବୋଧନ, ତାରପର ଅଧିବାସ ଓ ଆମଞ୍ଚଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ।

### ସଂଗ୍ମୀପୂଜା

ସତ୍ତୀର ପର ଆସେ ମହାସଂଗ୍ମୀ । ଏ ତିଥିତେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସଂଗ୍ମୀବିହିତ ପୂଜା । ମତ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାସହ ସକଳ ପ୍ରତିମାର ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କରା ହୁଏ । ନାନା ଉପକରଣେ ଫୁଲ, ବେଳପାତା, ନୈବେଦ୍ୟ, ବଞ୍ଚାଦି ସାଜିଯେ ଦେବୀକେ ପୂଜା କରା ହୁଏ । ଏଦିନେର ପୂଜାଯ ନବପତ୍ରିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନ୍ୟତମ ।

ନବପତ୍ରିକ ମୂଲତ ନୟାଟି ଗାଛେର ସମାହାର । ଏଣୁଲୋ ହଲୋ-କଦଳୀ (କଳା), ଦାଡ଼ିମ (ଡାଲିମ), ଧାନ୍ୟ (ଧାନ), ହରିଦ୍ଵା (ହଲୁଦ), ମାନକ (ମାନକଚୁ), କଚୁ, ବିଞ୍ଚ (ବେଳ), ଅଶୋକ ଏବଂ ଜୟନ୍ତୀ । ଏକଟି କଳାଗାଛେର ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଗାଛେର ଚାରା ବେଁଧେ ଦେଇବା ହୁଏ । ତାରପର ଏକଟି ଶାଢ଼ି କାପଢ଼ ପରାନ୍ତେ ହୁଏ । ଏକେ ବଳା ହୁଏ କଳାବୌ । ନବପତ୍ରିକାର ମଧ୍ୟେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ନୟାଟି ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଅଧିଷ୍ଠିତ । ମୂଲତ ନବପତ୍ରିକା ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଆମରା ଆମାଦେର ଜୀବନଦାୟୀ

बृक्षके पूजा करि । बृक्षके संतुष्टिपूजा करि । आर एই बृक्षके मध्ये आहे इश्वरारे शक्ति, देवीर शक्ति । नवपत्रिकार मध्ये दिये आमरा देवी दुर्गाकैइ पूजा करि । देवीदुर्गाके विर्दिष्ट प्रधामवत्रे प्रधाम करा हर ।

अंगाम मंत्र-

ॐ सर्वमदलायदल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।

श्रवण्ये अत्यधिक गोरि नारायणि नमोऽस्तु ते । (श्रीनीठडी, ११/१०/११)

वाह्ना अर्थ : हे देवी सर्वमदला, शिवा, सर्वार्थसाधिका, श्रवण्योग्या, गोरि, जिनरना, नारायणि- तोयाके नमकार ।



### अंगाम मंत्रेर शिक्षा

देवी दुर्गा विभिन्नक्षेत्रे आविर्भूत हये थाकेन एवं आमादेव मंदिल निश्चित करेल । ताहि तिनि सर्वमदला । तिनि शिवा अर्थात् महलमरी । शिवेर शक्ति वलेण तिनि शिवा । तिनि सकल प्रार्थना पूरण करेल, तांर असाध्य किछुइ नेहि । तिनि श्रवण्य । तिनि गोरी । तांर काहे शक्ति प्रार्थना करो आमरांश अन्यायारे विरक्ते दाँडाव एवं लिङ्गेर उ समाजेर जल्य महलजनक काज करव । दुर्गापूजार प्रधामवत्र आमादेव ए शिक्षाइ देय ।

### पाठ ६ उ ७ : महा अष्टमी पूजा ओ कुमारी पूजा

शारदीय दुर्गा उत्सवे अष्टमी पूजा अत्यन्त उत्तमपूर्ण पूजा । ए दिने देवी दुर्गा यजिरासुराके वध करेव विजय लाभ करेलिलेन । ए पूजार दिने उत्तम विष्णस्यतत्त्वाबे अष्टमीविहित पूजा करो देवी दुर्गार कृपा प्रार्थना करेल । पूजार शेवे पूजारीपांश देवीर उद्देशे पुस्पाशुलि घोदान करो ।

### कुमारी पूजा

अष्टमी पूजार दिन कुमारी पूजा करा हय । आमादेव देशे केवल रामकृष्ण मठे कुमारी पूजा अनुष्ठित हर । पाठिमवहेण श्रधान्त रामकृष्ण मठे कुमारी पूजा हर । नारीके मातृज्ञपे इश्वरीक्षेत्रे भावना हिन्दूसाधना-पूजार एकटा बड दिक । कुमारीर मध्ये दिये देवी दुर्गारहि पूजा करा हय । कुमारी पूजार नारीर श्रिति सम्मान प्रदर्शन करा हय ।



এর মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়। এভাবে পারিবারিক ও সমাজজীবনে প্রভৃতি কল্যাণ সাধিত হয়।

### নবমী ও দশমী পূজা

#### নবমী পূজা

নবমী তিথিতে দেবী দুর্গার নবমীবিহিত পূজা করা হয়। অষ্টমী ও নবমী তিথির সঙ্গে সময় বিশেষভাবে সঙ্গ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গ পূজায় ১০৮টি মাটির প্রদীপ প্রজ্ঞলন করে দেবীর পূজা করা হয়। এ সময় দেবী দুর্গাকে বিভিন্ন ধরনের উপকরণে ভোগ লিবেদন করা হয় এবং ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

#### দশমী পূজা

দশমী তিথিতে পূজাবিধি অনুসারে দেবী দুর্গার দশমীবিহিত পূজা করা হয়। দশমীর দিনে হয় দেবী দুর্গার প্রতিমা বিসর্জন। পূজার দশমীকে বলা হয় বিজয়া দশমী। দেবী দুর্গা যেন ঘরের মেয়ে। তিনি শঙ্কুর বাড়ি থেকে বাবার বাড়ি আসেন। চারদিন থেকে তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে কৈলাস ভবনে যাত্রা করেন। দুর্গাপ্রতিমা নদী, পুকুর প্রভৃতি জলাশয়ে বিসর্জনের মাধ্যমে শারদীয় দুর্গা উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

### বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতা ও আচার

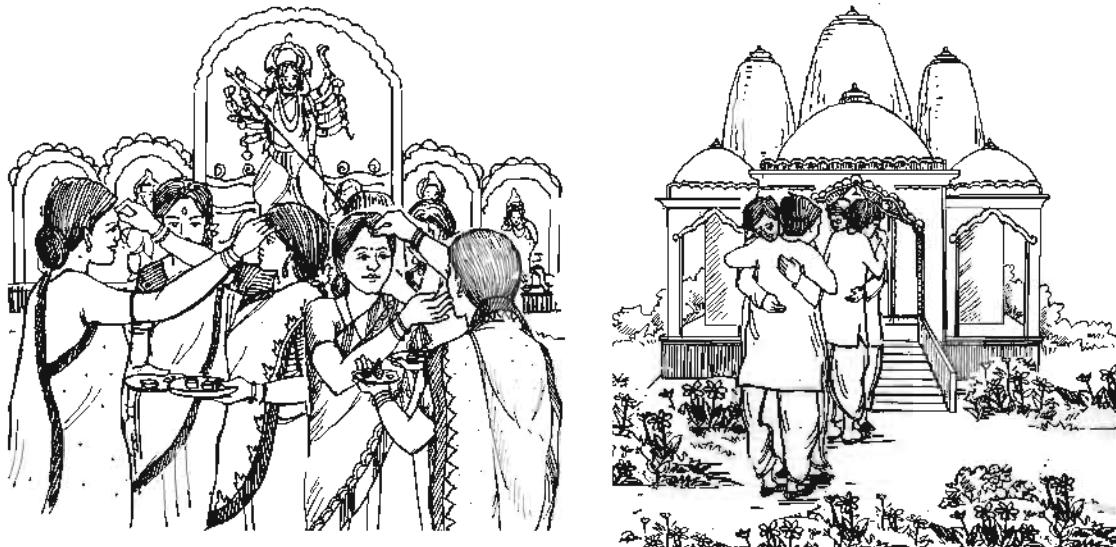
দেবী দুর্গার প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়েই শুরু হয় বিজয়া দশমী। বিজয়া দশমীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা ও আচার পালন করা হয়। বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতা ও প্রধান প্রথান আচারের মধ্যে আছে-

১. দেবীকে সিদুর পরানো, মিষ্টি মুখ করানো এবং বিদায় সন্তান্ত জানানো।
২. সধবা নারীরা একে অন্যের কপালে সিদুর পরান ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।
৩. পরস্পর আলিঙ্গন করা এবং মিষ্টিমুখের মাধ্যমে একে অপরকে ভালোবাসার বঙ্গনে আবন্ধকরণ।
৪. আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে মিছিল করে ঢাক, কাঁসর, সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে দেবীর প্রতিমা বিসর্জন।
৫. বাড়িতে ফিরে ছেলেমেয়ে ও পাড়া-পড়শিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও ধান- দূর্বা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা।
৬. আত্মীয়স্বজন ও দরিদ্রদের মধ্যে নতুন জামা-কাপড় বা অর্থ ও উপহার প্রদান প্রভৃতি।

বিসর্জনের দিন বা পরের দিন কোন কোন অঞ্চলে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

### বিজয়া দশমীর তাৎপর্য

১. মহিষাসুরকে বধ করার মধ্য দিয়ে বিজয় উৎসব পালিত হয়। সুতরাং এ দশমী বিজয়ের দিন। অন্যায়কে প্রতিহত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার দিন।
২. দেবী দুর্গা দেবতাদের সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ। তাই দুর্গাপূজা তথা বিজয়া দশমী ঐক্যের প্রতীক।
৩. বিজয়া দশমী পারিবারিক ও সামাজিক জীবন থেকে সকল প্রকার অশঙ্খভিকে দূর করতে উদ্দুক্ষ করে এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দান করে।



### বিজয়া দশমীর প্রভাব

দূর্গাপূজার প্রভাবে অন্যায়-অবিচারকে প্রতিরোধ করার শক্তি জাগ্রত করে।

সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃক্ষি করে। দূর্গাপূজাকে অবলম্বন করে পত্র-পত্রিকায় পূজাসংখ্যা প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পূজাসংগঠন শারদীয় পূজার স্মরণিকা প্রকাশ করে। পূজামণ্ডপে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। পূজামণ্ডপ এবং প্রতিমায় নানা নান্দনিক কল্পকল্পনার প্রতিফলন হয়। সার্বিকভাবে দুর্গাপূজা এক মিলন মহোৎসব এবং আনন্দ ও সৃষ্টিশীলতার অপূর্ব সম্মিলন।

### আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে দুর্গাপূজার প্রভাব

আবহমানকাল থেকেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সর্বাপেক্ষা বড় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব। এ উৎসব তাদের প্রাণ। শারদীয় দেবীর পূজা মানে দেবী দুর্গার আরাধনা। তিনি বিশ্বের আদি কারণ এবং ঈশ্বরের শক্তির রূপ। দুর্গাপূজা আমাদের আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

### পাঠ ৮ ও ৯ : দেবী কালী—কালী দেবীর পরিচয়

দেবী কালী দুর্গাদেবীর মতো শক্তির দেবী। তিনি অসুর বিনাশে ভয়ঙ্করী। পৃথিবীর সকল অন্যায় ও অত্যাচার দূর করার জন্য দেবী কালী অগুর্ণ শক্তিকে ধ্বংস করেন।

কালী ভগবান শিবের সহধর্মী এবং বিশেষ শক্তি। তিনি কাল ও মৃত্যুর দেবীরূপে আত্মপ্রকাশ করার কারণে তাকে শৃশান কালী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ ছাড়াও দেবী কালীর অনেক নাম রয়েছে। যেমন অদ্রকালী, দক্ষিণাকালী, মা তারা, শ্যামা, মহাকালী ইত্যাদি।

### দেবী কালীর উৎপত্তি

দেবী কালী শিবের শক্তিরপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হিন্দু পুরাণ অনুসারে কালী দেবীর নাম বর্ণনা আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লেখ আছে, তিনি বিভিন্ন রূপে অসুরদের ধ্বংস করে স্বর্গের দেবতাদের রক্ষা করেন। ইন্দ্রসহ সকল দেবতা, শুল্ক ও নিশুল্ক নামক অসুরের হাত থেকে পরিআশ পাওয়ার জন্য দেবী অমিকার কাছে প্রার্থনা করেন। অমিকা ক্রোধে উন্মত্ত হলেন। তখন দুই রূপ হলো তাঁর- অমিকা ও কালিকা বা কালী। শুল্ক ও নিশুল্কের অনুচর চও ও মুণ্ডকে দেবী কালী বধ করেন। এ কারণে তাঁর আর এক নাম হয় চামুণ্ডা।

### কালী পূজার সময় :

কালীপূজা সাধারণত অমাবস্যার রাতে করা হয়। কালীপূজা দুর্গাপূজার পর কার্তিক-অগ্রাহয়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। পূজার দিন সন্ধ্যার সময় দীপাবলির আয়োজন করা হয় যা দেয়ালী নামে পরিচিত। বিভিন্ন ধরনের মহামারীর (বসন্ত, কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব, বড়, বন্যা, খরা প্রভৃতির) সময় রক্ষা কালী বা শ্যামা কালীর পূজা করা হয়।

### কালীপূজা পদ্ধতি

দুর্গা পূজার মতো কালী পূজাও গৃহে বা মণ্ডপে প্রতিমা নির্মাণ করে সম্পন্ন করা হয়। দেবীর চঙ্গ দান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই কালী পূজা শুরু হয়। দেবী কালীকে ধ্যান, পূজা, আরতি, ভোগ প্রভৃতি কর্ম সম্পাদন করে সবশেষে প্রণাম করা হয়।

### কালীপূজার প্রণাম মন্ত্র, সরলার্থ ও শিক্ষা

#### কালী পূজার ধ্যান

ওঁ শ্বারুচাং মহাভীমাং ঘোর-দংস্ত্রাবরপ্রদাম্ ।  
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাখণ কপালকর্তৃকাকরাম ॥  
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রংধিরং মুহুঃ ।  
চতুর্বীহ্যুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ ॥



**সরলার্থ :** দেবী কালী শবারুচা, ভীমা ভয়ঙ্করী, তিনি ত্রিনয়নী, ভয়ানক তাঁর দাঁত, লোল জিহ্বা তাঁর। তিনি মুক্তকেশী, হাতে নরকপাল ও কর্তৃকা (কাটারি)। অপর দুহাতে বর ও অভয় মুদ্রা, দেবী আবার হাস্যময়ী।

এখানে কোমল ও কঠোর রূপে দেবী কালীর রূপ বর্ণিত হয়েছে।

#### শিক্ষা

১. দেবী কালী অন্যায় প্রতিরোধ করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর ভক্তদের কল্যাণে নিয়োজিত। তাঁর

কাছ থেকে আমরা মঙ্গল সাধন করার শিক্ষা পাই। দেবী কালীর কাছে আমরা অন্যায়ের কাছে কঠোর, সহজের কাছে কোমল হওয়ার শিক্ষা পাই।

২. অন্যায়কারীর কাছে দেবী রাগী, ভয়ংকরী। ভক্তের কাছে মেহময়ী জননী।

### আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে কালী পূজার প্রভাব

দেবী কালী ক্ষমতা ও শক্তির আধার। তিনি একাধারে কঠোর, অপরদিকে ক্ষমতাময়ী মা। তিনি এ বিশ্বের সকল অশুভ শক্তি ধ্বংস করে সকলের মধ্যে মঙ্গলবার্তা ছড়িয়ে দিয়ে থাকেন। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা দেবী কালীকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে পূজা করে থাকেন। এ পূজার মাধ্যমে আমাদের আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে অনেক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

### কার্তিক

#### পাঠ ১০ : কার্তিক দেবের পরিচয়, পূজার ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র

কার্তিক একজন পৌরাণিক দেবতা। তিনি ভগবান শিব ও মা দুর্গার পুত্র। দেবতা কার্তিক অত্যন্ত সুন্দর, সূঠাম দেহ এবং অসীম শক্তির অধিকারী।

পুরাণে আছে, তারকাসুরের আধিপত্য থেকে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করার জন্য স্বর্গের দেবতারা তাঁকে সেনাপতিবৃপ্তে বরণ করেন। তাঁর দেহবর্ণ তন্ত স্বর্ণের মতো।

মুদ্রান্তর হিসেবে কার্তিকের হাতে তীর, ধনুক ও বল্লম দেখা যায়। তার বাহন সুদৃশ্য পাখি ময়ূর। কার্তিক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। এ সকল যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছিলেন। পুরাণ অনুসারে তারকাসুরকে বধ করার জন্য কার্তিকের জন্ম হয়েছিল। তিনি বলির পুত্র বাণাসুরকেও পরাজিত করেছিলেন। কার্তিকের অন্য নাম ক্ষন্দ, মহাসেন, কুমার শুহ ইত্যাদি। ক্ষন্দপুরাণ কার্তিককে নিয়ে রচনা করা হয়েছে।

### কার্তিক পূজা

কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্তিক পূজার আয়োজন করা হয়। কার্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পত্তিরা সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করে থাকেন। কথিত আছে, দেবকী কার্তিকের ব্রত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন।



### କାର୍ତ୍ତିକ ଦେବତାର ଧ୍ୟାନ

ଓ କାର୍ତ୍ତିକେଯେଂ ମହାଭାଗେ ମୟୁରୋପରିସଥ୍ବିତମ୍ ।  
ତଞ୍ଚକାଷ୍ଠନବର୍ଣ୍ଣଭ୍ୟଂ ଶକ୍ତିହଞ୍ଚଂ ବରପ୍ରଦମ୍ ॥  
ଦିଲ୍ଲିଜଂ ଶକ୍ରହଞ୍ଚାର୍ବଂ ନାନାଳଙ୍କାରଭୂଷିତମ୍ ।  
ପ୍ରସମ୍ବଦନ୍ତଂ ଦେବଂ କୁମାରଂ ପୁତ୍ରଦାୟକମ୍ ॥

**ସରଳାର୍ଥ :** କାର୍ତ୍ତିକଦେବ ମହାଭାଗ, ମୟୁରେର ଉପର ତିନି ଉପବିଷ୍ଟ । ତଞ୍ଚ ସର୍ବେର ମତୋ ଉଞ୍ଜ୍ଜଳ ତାର ବର । ତାର ଦୂଢି ହାତେ ଶକ୍ତି ନାମକ ଅନ୍ତ୍ର । ତିନି ନାନା ଅଳ୍କାରେ ଭୂଷିତ । ତିନି ଶକ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀ । ପ୍ରସମ୍ବ ହାସ୍ୟାଜ୍ଜ୍ବଳ ତାର ମୁଖ ।

### ପ୍ରଗାମ ମୟ

ଓ କାର୍ତ୍ତିକେଯ ମହାଭାଗ ଦୈତ୍ୟଦର୍ପନିସୁଦନ ।  
ପ୍ରଣୋତୋ ୨୧ ମହାବାହୋ ନମକେ ଶିଥିବାହନ ॥  
ରକ୍ତପୁତ୍ର ନମକ୍ଷତ୍ୟଂ ଶକ୍ତିହଞ୍ଚ ବରପ୍ରଦ ।  
ଘାନାତ୍ମୁର ମହାଭାଗ ତାରକାନ୍ତକର ପ୍ରଭୋ ।  
ମହାତପସ୍ତୀ ଭଗବାନ୍ ପିତୁର୍ମାତୁଃ ପ୍ରିୟ ସଦା ॥  
ଦେବାନାଂ ସଜ୍ଜରକ୍ଷାର୍ଥେ ଜାତସ୍ତ୍ରଂ ଗିରିଶିଖରେ ।  
ଶୈଳାତ୍ମଜାୟାଂ ଭବତେ ତୁଭ୍ୟଂ ନିତ୍ୟଂ ନମଃ ॥

**ସରଳାର୍ଥ :** ହେ ମହାଭାଗ, ଦୈତ୍ୟଦଲନକାରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ଦେବ ତୋମାଯ ପ୍ରଗାମ କରି । ହେ ମହାବାହୁ, ମୟୁର ବାହନ, ତୋମାକେ ନମକ୍ଷାର । ହେ ରକ୍ତଦ୍ରେବ (ଶିବ) ପୁତ୍ର, ଶକ୍ତି ନାମକ ଅନ୍ତ୍ର ତୋମାର ହାତେ । ତୁମି ବର ପ୍ରଦାନ କର । ଛୟ କୃତିକା ତୋମାର ଧାତ୍ରୀମାତା । ଜନକ-ଜନନୀ ପ୍ରିୟ ହେ ମହାଭାଗ, ହେ ଭଗବାନ, ତାରକାସୁର ବିନାଶକ, ହେ ମହାତପସ୍ତୀ ପ୍ରଭୁ ତୋମାକେ ପ୍ରଗାମ । ଦେବତାଦେର ସଜ୍ଜ ରକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ପର୍ବତେର ଚାନ୍ଦାଯ ତୁମି ଜନ୍ୟହଣ କରେଛ । ହେ ପାର୍ବତୀ ଦେଵୀର ପୁତ୍ର ତୋମାକେ ସତତ ପ୍ରଗାମ କରି ।

### କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜାର ଶୁରୁତ୍ୱ ଓ ଅଭାବ

- କଥାଯ ବଲେ କାର୍ତ୍ତିକେର ମତୋ ଚେହାରା । ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକେର ଦେହାକୃତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ସୁଠାମ ଓ ବଲିଷ୍ଠ । ଏ କାରଣେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜାର ମାଧ୍ୟମେ ଦମ୍ପତ୍ତିରା ସୁନ୍ଦର, ସୁଠାମ ଓ ବଲିଷ୍ଠ ଚେହାରାର ସଂତାନାଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଥାକେନ ।
- କାର୍ତ୍ତିକ ଦେବତାଦେର ମେଲାପତ୍ର । ତିନି ଅସୀମ ଶକ୍ତିଧର ଦେବତା । ଏହାର ତାକେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହିସେବେ ପୂଜା କରା ହୁଏ ।
- କାର୍ତ୍ତିକ ନମ୍ର ଓ ବିନୟୀ ସଭାବେର ଦେବତା । କିନ୍ତୁ ସମାଜେର ନ୍ୟାୟ, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅବିଚାର ନିର୍ମୂଳେ ତିନି ଅବିଚିଲ ଯୋଦ୍ଧା । ତିନି ତାରକାସୁର ପରାଭୂତ କରେ ସ୍ଵର୍ଗରାଜ୍ୟ ଉନ୍ଧାର କରେ ସ୍ଵର୍ଗେଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଛିଲେନ । ଆମରା କାର୍ତ୍ତିକେର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣେ ନୀତିମାନ ହତେ ପାରି । ତାକେ ଅନୁସରଣ କରେ ବିନୟୀ ମାନୁଷ ହିସେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରାତେ ପାରି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ଗଠନେ ଶୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପାଲନ କରାତେ ପାରି ।

৪. আমাদের সকলকেই কার্ত্তিকের মতো নম্ব ও বিনয়ী হওয়া উচিত এবং অন্যায়, অভ্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচার হওয়া উচিত।

### পাঠ ১১ : দেবী শীতলা

#### শীতলা দেবীর পরিচয়

- শীতলা লৌকিক দেবী। শীতলা পুরাণে গৃহীত হয়ে পৌরাণিক দেবীতে পরিণত হয়েছেন। সাধারণভাবে এ দেবী বসন্ত রোগের জ্বালা নিবারণ করে শীতল করেন বলে শীতলা নামে পরিচিত হয়েছেন। বসন্ত ও চর্মরোগ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে শীতলা পূজা করা হয়।
- দেবী শীতলাকে ঠাকুরানি জাগরণী, করণাময়ী, দয়াময়ী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। শীতলা কুমারী, মাথায় কূলাকৃতির মুকুট এবং গর্ডভের উপর উপবিষ্ট। গর্ডভ তাঁর বাহন। ক্ষন্দপুরাণে শীতলা দেবী শ্বেতবর্ণ ও দুহাত বিশিষ্ট। তাঁর দুহাতে রয়েছে পূর্ণকুস্ত ও সম্মাঞ্জনীধারণী। কথিত আছে সম্মাঞ্জনীর মাধ্যমে তিনি অমৃতময় শীতল জল ছিটিয়ে রোগ, তাপ, শোক দূর করেন। কখনো কখনো তিনি নিমের পাতা বহন করে থাকেন। নিম রোগ প্রতিরোধকারী উদ্ধিদ।

#### শীতলা পূজা

সাধারণত শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে দেবী শীতলার পূজা করা হয়। পূজামন্দিরে বা শীতলা পূজার নির্দিষ্ট স্থানে পূরোহিতের মাধ্যমে শীতলা পূজা করা হয়। পূজার পদ্ধতি অন্যান্য পূজার অনুরূপ হলেও এ পূজার সময় ঠাণ্ডা জাতীয় ফলের প্রয়োজন হয়। পেঁপে, নারিকেল, তরমুজ, কলা ও অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় উপকরণ দেবীর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হয়। এ পূজায় সকল শ্রেণির ভক্ত অংশগ্রহণ করে থাকে।

#### পূজার প্রণাম মন্ত্র

ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্ত্রাং দিগম্বরীম্ ।  
মাঞ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমন্তকাম্ ।

**সরলার্থ :** গর্ডভ বাহন মাঞ্জনী (বাঁটা) ও কলস-হস্তা শীতলা দেবীকে প্রণাম করি।

#### শীতলা পূজার গুরুত্ব

- শীতলা দেবী বসন্ত রোগ থেকে আমাদের মুক্ত করে আমাদের শীতল করেন। এ কারণে তিনি সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছেন।



୨. ଦେବୀ ଶୀତଳାକେ ସାନ୍ତ୍ୟବିଧି ପାଲନ ବା ପରିଷକାର-ପରିଚଛନ୍ନତାର ଦେବୀ ବଲା ହୟ । ଶୀତଳା ପୂଜାର ମାଧ୍ୟମେ ଆମରା ସାନ୍ତ୍ୟ ବିଧି ଓ ପରିଷକାର-ପରିଚଛନ୍ନତା ବିଷୟେ ସଚେତନ ହୟେ ଥାକି ।
୩. ଦେବୀ ଶୀତଳାର ଦୁଇ ହାତେ ରଯେଛେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁଳ୍ପ ଓ ସମ୍ମାଞ୍ଜନୀ । କଥିତ ଆହେ ସମ୍ମାଞ୍ଜନୀର ମାଧ୍ୟମେ ତିନି ଅମୃତମ୍ଯ ଶୀତଳ ଜଳ ଛିଟିଯେ ରୋଗ, ତାପ, ଶୋକ ଦୂର କରେ ଶୀତଳ କରେନ । ଆମରାଓ ବସନ୍ତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀଦେଇ ସେବା କରେ ତାଦେଇ ଶୀତଳ କରବ । ଶୀତଳା ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଆମରା ଏ ଧରନେର ସେବାମୂଳକ କାଜ କରାର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ସୁକ ହେଇ । କଥନେ କଥନେ ତିନି ନିମ୍ନେ ପାତା ବହନ କରେ ଥାକେନ । ନିମ୍ନ ବୃକ୍ଷ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଉତ୍ସିଦ । ଆମରା ବାଡ଼ିର ଆଙ୍ଗିନାୟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧେର ଜନ୍ୟ ନିମ୍ନ ଗାଛ ରୋଗଣ କରାତେ ପାରି ।

### ଅନୁଶୀଳନୀ

ବହୁନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଶ୍ନ :

୧ । କୋନ୍ ଦେବତାକେ ସଡାନନ୍ଦ ବଲା ହୟ ?

- |              |           |
|--------------|-----------|
| କ. ଗଣେଶ      | ଘ. ଅର୍ଜୁନ |
| ଗ. କାର୍ତ୍ତିକ | ଘ. ଶିଵ    |

୨ । କୋନ୍ ତିଥିତେ ଶୀତଳା ଦେବୀର ପୂଜା କରା ହୟ ?

- |            |           |
|------------|-----------|
| କ. ପଦ୍ମମୀ  | ଘ. ସତୀ    |
| ଗ. ସଂକ୍ଷମୀ | ଘ. ଅଷ୍ଟମୀ |

୩ । ଦୁର୍ଗା ସ୍ନାନେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରୋଜନ ହୟ କୋନ ମିଳିତ ହାନେର ମାଟି -

- i. ତିନ ରାତ୍ରା
- ii. ଦୁଇ ରାତ୍ରା
- iii. ଚାର ରାତ୍ରା

ନିଚେର କୋନଟି ସଠିକ ?

- |        |                |
|--------|----------------|
| କ. i   | ଘ. i           |
| ଗ. iii | ଘ. i, ii ଓ iii |

ନିଚେର ଅନୁଜ୍ଞେଦଟି ପଡ଼ ଏବଂ ୪ ଓ ୫ ନଂ ପ୍ରଶ୍ନେର ଉତ୍ତର ଦାଓ :

ଶୁକ୍ରା ଏ ବହର ବୃକ୍ଷମେଳା ଥେକେ ଏକଟି ବେଳ ଗାଛେର ଚାରା ତ୍ରୟ କରେ ବାଡ଼ିର ଆଙ୍ଗିନାୟ ରୋଗଣ କରେ । ପ୍ରତିଦିନ ମେ ସଠିକ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମେ ଗାଛଟି ବଡ଼ କରେ ତୋଳେ ।

୪ । ଶୁକ୍ରାର ତ୍ରୟକୃତ ଗାଛଟି କୋନ ଦେବତାର ସଙ୍ଗେ ସଂପଦିତ ?

- |               |         |
|---------------|---------|
| କ. କାର୍ତ୍ତିକ  | ଘ. ଶିଵ  |
| ଗ. ବିଶ୍ୱକର୍ମୀ | ଘ. ଗଣେଶ |

৫। শক্তার বৃক্ষ পরিচর্যার মধ্য দিয়ে মূলত প্রকাশ পেয়েছে –

- i. ইংৰেজ প্রতি ভালোবাসা
- ii. বৃক্ষপ্রীতি
- iii. সৌন্দর্য বৰ্ধন

নিচের কোনটি সঠিক?

- |        |                |
|--------|----------------|
| ক. i   | খ. ii          |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

পলাশগুৰু গ্রামে হঠাতে বসন্ত ও কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় গ্রামবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফলে তারা একত্রিত হয়ে এক বিশেষ পূজার আয়োজন করে এবং ভক্তিপূর্ণ মনে বিভিন্ন উপচারে পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণাম মন্ত্রের মধ্য দিয়ে পূজার কাজ সম্পন্ন করে।

- ক. দেবতা বলতে কী বোঝা ?
- খ. সৌক্রিক দেবতার ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
- গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত গ্রামবাসীরা কোন বিশেষ পূজার আয়োজন করে ? উক্ত পূজার পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে উক্ত পূজার প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### যোগসাধনা

হিন্দুধর্মশাস্ত্রে ‘যোগ’ মানে মিলন। সংবলপূর্বক সাধনার মাধ্যমে আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে সমাধির লাভকে যোগ বলা হয়। যোগ অভ্যাস করার জন্য যেভাবে রাখলে শরীর ছির থাকে অথচ কোনো কষ্টের কারণ ঘটে না তাকে যোগাসন বলে। আর যোগের মাধ্যমে ইশ্বর আরাধনার প্রক্রিয়াকে যোগসাধনা বলে। ইশ্বর আরাধনার ক্ষেত্রে দেহ ও মন উভয়েরই গুরুত্ব রয়েছে। সূত্রাং দেহকে সুস্থ রাখা, মনকে শান্ত রাখা এবং ধর্ম সাধনার জন্য যোগের গুরুত্ব অপরিসীম। এ অধ্যায়ে যোগসাধনা, অষ্টাঙ্গ যোগ ও যোগাসন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।



এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী যোগসাধনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- মানসিক স্বাস্থ্য ও ধর্মানুষ্ঠানে যোগসাধনার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব
- অষ্টাঙ্গ যোগের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- বৃক্ষাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- বৃক্ষাসনের অনুশীলন করতে পারব এবং প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- অর্ধকূর্মাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- অর্ধকূর্মাসনের অনুশীলন করতে পারব এবং প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- গরুড়াসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- গরুড়াসন অনুশীলন করতে পারব এবং প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- হলাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- হলাসন অনুশীলন করতে পারব এবং প্রভাব বর্ণনা করতে পারব।

## পাঠ ১ : যোগসাধনার ধারণা ও গুরুত্ব

### যোগসাধনার ধারণা

‘যোগ’ শব্দটি সাধারণভাবে মিলনের অর্থই ব্যক্ত করে। একের সঙ্গে অপরের মিলন বা একত্রিত হওয়া বা তাদের একত্রিত করাকে যোগ বলা হয়। কিন্তু সাধন ক্ষেত্রে এর অর্থ আরো গভীরে নিহিত। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগই যোগসাধন।

ব্রহ্ম এক হয়েও বহু, নির্গুণ হয়েও সংগুণ, অরূপ হয়েও রূপময়, নৈর্ব্যক্তিক হয়েও ব্যক্তিস্বরূপ, অব্যক্ত হয়েও চরাচরে ব্যক্ত। ব্রহ্মের সঙ্গে সংযোগের প্রচেষ্টার নাম যোগসাধন। তাঁর অস্তিত্বও অনন্ত, চেতনাও অনন্ত, আনন্দও অনন্ত। তিনি বিশ্বময়, আবার তিনি বিশ্বাতীত- সচিদানন্দ। এ ব্রহ্মের সঙ্গে চাই যোগ। সুতরাং যোগের মাধ্যমে ব্রহ্ম বা ইশ্বরের আরাধনার প্রক্রিয়াকে যোগসাধনা বলে।

যোগসাধনা মুক্তি লাভের একটি বিশেষ উপায়। মুক্তি লাভের জন্য প্রথমে প্রয়োজন আত্মাপলব্ধির। আর এই আত্মাপলব্ধির জন্য প্রয়োজন শুদ্ধি, স্থির ও প্রশান্ত মন। এজন্য শরীর ও মনকে উপযোগী করতে হয়। তাই শরীর সুগঠিত, সুস্থ ও মনকে নিরুদ্ধেগ রাখার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তার নামও যোগ। বিশেষভাবে একে হঠযোগ বলে। হঠযোগ হচ্ছে পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগের প্রথম সোপান।

### যোগসাধনার গুরুত্ব

দেহকে সুস্থ ও মনকে শান্ত রাখতে এবং ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে যোগের গুরুত্ব অপরিসীম। যোগের মাধ্যমে পাচনতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে ওঠে, যার ফলে শরীর সুস্থ, হালকা এবং স্ফূর্তিদায়ক হয়ে ওঠে। যোগ সাধনা দ্বারা হৃদরোগ, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, এ্যালার্জি ইত্যাদির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা মেদের পাচন হয়ে শরীরের ওজন কমে এবং শরীর সুস্থ ও সুন্দর হয়। স্তুলকায় মানুষের শরীর ও মন সুস্থ ও সুন্দর রাখার জন্য যোগের বিকল্প নেই। যোগ দ্বারা ইন্সুলিন এবং মনের নিপিহ হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাসের দ্বারা সাধক পরমাত্মা পর্যবেক্ষণ পৌছতে সক্ষম হয়ে ওঠেন। ব্যাসদেব বলেছেন,- ‘যোগই হলো এক অর্থে সমাধি।’ পুরাকালে মুনিখ্যিগণ যোগসাধনার বলেই শরীরকে সুস্থ সবল রাখতেন। যোগাসনের মাধ্যমে তাঁরা নীরোগ থাকতেন ও ধ্যানে, তপ-জ্পে এবং প্রাণায়ামে নিজেদের দেহ সুস্থ-সবল রাখতেন ও দুষ্পিত্তাইন মনের অধিকারী হতেন।

যোগীদের মধ্যে কেউ কেউ যোগসাধনায় কেবল যোগ ঐশ্বর্য লাভ করেই তৃণ হন; আবার কেউ কেউ কেউ কর্তৃর তপস্যায় মায়াপাশ ছিঁড় করে পুনরায় যোগশক্তির মাধ্যমে বিশ্বজগতের হিতে কল্যাণ সাধনে ব্রহ্মী হন। তাঁরা আত্মসমাহিত হয়ে মোক্ষলাভ করেন। যোগসাধনাবলে এই আত্মসমাধি ও যোগধারণার সূচনা নির্দেশন সম্বন্ধে মহাপ্রাঞ্জ ভীম্ব বলেছেন, ধনুর্ধারী যোদ্ধারা যেমন অপ্রমত্ব সমাহিত চিন্তে লক্ষ্যভূদে করে তেমনি যোগীরা অনন্যমনে একনিষ্ঠ সাধনায় মোক্ষলাভ করেন। যোগতত্ত্ববিদ মহাত্মারা একাগ্রাচিন্তে সংসারের মায়াতরঙ্গ উত্তীর্ণ হয়ে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে এক করে দুর্লভ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। যে যোগী অহিংসাত্মক পরায়ণ হয়ে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগ করতে পারেন তিনি যোগবলে মুক্তি লাভ করতে পারেন।

ମହର୍ଷି ଯାଜ୍ଞବଳ୍କ୍ୟ ବଲେଛେନ, ଯୋଗୀରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକେ ମନେର ମଧ୍ୟେ ସମାହିତ କରେ ମନକେ ଅହଂକାରକେ ମହିନ୍ଦ୍ରେ, ମହାତ୍ମକେ ପ୍ରକୃତିର ରାଜ୍ୟ ବିଲୀନ କରେ ପରମବ୍ରହ୍ମର ଧ୍ୟାନେ ତନ୍ୟ ହନ । ସେଇ ପରମବ୍ରହ୍ମର ଜ୍ୟୋତି ତାଁର ପାପମୁକ୍ତ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟେ ସର୍ବଦା ଅନୁଭୂତ, ସେ ଜ୍ୟୋତି ତାଁର ଚୋଖେ-ମୁଖେ ପ୍ରତିଭାତ ଓ ଉତ୍ସାହିତ ହୟେ ଓଠେ । ଯୋଗୀ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସତତ ପ୍ରସରାଚିତ । ତିନି ପ୍ରଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାସୁଖତଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିର ମତୋ ପ୍ରଶାନ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ହୟେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଆନନ୍ଦେର ଅମିଯାସାଗରେ ଭାସେନ । ତିନି ନିର୍ବାତ ନିଷକ୍ଷମ ପ୍ରଦୀପେର ମତୋ ହିଂର ଏବଂ ତିନି ଜଗତେର କୋନୋ ଆସନ୍ତି, କୋନୋ ମମତାତେଇ ବିଚାରିତ ହନ ନା । ଦେହ ଅବସାନେ ତିନି ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ବିଲୀନ ହନ ।

**ଦଲୀଯ କାଜ :** ଯୋଗସାଧନାର ପ୍ରଭାବ ଲିଖେ ଏକଟି ତାଲିକା ତୈରି କର ।

**ନତୁନ ଶବ୍ଦ :** ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରସନ୍ତା, ଚରିତାର୍ଥତା, ଗତାନୁଗତିକ, ଚରାଚର, ପାଚନତତ୍ତ୍ଵ, ସୁଡୋଲ, ନିଗ୍ରହ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଆତ୍ମସମାହିତ, ତନ୍ୟ, ଅପ୍ରମାଣ, ପ୍ରସରାଚିତ, ପ୍ରଗାଢ଼, ଅମିଯ, ନିର୍ବାତ, ନିଷକ୍ଷମ, ବିଲୀନ ।

## ପାଠ ୨, ୩ ଓ ୪ : ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ୍ୟୋଗେର ଧାରଣା ଓ ଶୁରୁତ୍ୱ

### ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ୍ୟୋଗେର ଧାରଣା

ପ୍ରତିଟି ମାନୁଷଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନେ ସୁଖ ଚାଯ । ଯୋଗସାଧନା ଏମନ ଏକ ପଥ ଯାତେ ପ୍ରତିଟି ମାନୁଷ ନିର୍ଭୟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଧୀନତାର ସଙ୍ଗେ ଚଲତେ ପାରବେ ଏବଂ ନିଜେଦେର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦେର ମାଧ୍ୟମେ କାଟାତେ ପାରବେ । ସେଇ ପଥ ହଚେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗେର ପଥ ।

ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଲି ମାନୁଷେର ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନେ ଯୋଗେର ଆଟଟି ଧାପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେଛେ । ତିନି ବଲେଛେ, ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣ୍ୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି ଏହି ଆଟଟି ଯୋଗେର ଅଙ୍ଗ । ଏଗୁଲୋ ଏକତ୍ର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ବଲେ ପରିଚିତ । ଆମରା ଏଥିଲ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗେର ପ୍ରତିଟି ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କେ ସଂଜ୍ଞେପେ ଆଲୋଚନା କରାଇ :

### ୧. ଯମ

ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗେର ପ୍ରଥମ ଧାପ ହଚେ ଯମ । ଯମ ଅର୍ଥ ସଂୟମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନକେ ହିଂସା ଅନୁଭବବାବ ଇତ୍ୟାଦି ଥେକେ ସରିଯେ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିତ କରା । ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅନ୍ତେଯ, ବ୍ରକ୍ଷାଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅପରିହାହ- ଏହି ପାଚ ପ୍ରକାର ଯମ ।

### କ. ଅହିଂସା

ଅହିଂସା ଶବ୍ଦଟାର ଅର୍ଥ ହଚେ କୋନୋ ପ୍ରାଣୀକେ ମନ, କଥା ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କଟ୍ଟ ନା ଦେଉୟା । ମନେ ମନେଓ କାରଣ ଅନିଷ୍ଟ ନା ଭାବା, କାଉକେ କୁଟୁ କଥା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କଟ୍ଟ ନା ଦେଉୟା ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କୋନୋ ଅବସ୍ଥାତେ କୋନୋ ସ୍ଥାନେ, କୋନୋ ଦିନ କୋନୋ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରତି ହିଂସା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନା କରା । ଏକ କଥାଯ ଭାଲୋବାସା । ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବେର ପ୍ରତି ଭାଲୋବାସା ନୟ, ନିଖିଲ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଟି ବନ୍ତୁର ପ୍ରତି ଭାଲୋବାସା ।

### খ. সত্য

যেমন দেখেছি, যেমন শুনেছি এবং যেমন জেনেছি, ঠিক তেমনটাই মনে, কথায় ও কাজে করাকে সত্য বলে। মন যদি সত্য চিন্তা করে, জিহ্বা যদি সত্য কথা বলে এবং সমগ্র জীবন যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

### গ. অন্তেয়

অন্তেয় অর্থ চুরি না করা। অপরের জিনিস না বলে অধিকার করাকে স্তেয় (চুরি) বলে। তাই যোগী তাঁর জাগতিক প্রয়োজন সর্বনিম্ন মাত্রায় আবক্ষ রাখেন। যোগীর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বর সান্নিধ্য।

### ঘ. ব্রহ্মচর্য

ব্রহ্মচর্য শব্দের আভিধানিক অর্থ বেদাদি শাস্ত্রানুশীলন এবং পবিত্র সংযত জীবনযাপন। জীবনে ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠা করলে দেহে শক্তি পাওয়া যায়, মনে সাহস পাওয়া যায়, বুদ্ধি বিকশিত হয়। ব্রহ্মচর্যে যোগীর জীবনে জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠে, তখন তাঁর ঈশ্বরদর্শন সহজ হয়।

### ঙ. অপরিগ্রহ

অপরিগ্রহ মানে গ্রহণ না করা। অপ্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ না করা যেমন তেমনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুও গ্রহণ না করা। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম ধন, বস্তু ইত্যাদি পদার্থ গ্রহণ করে এবং গৃহে সন্তুষ্ট থেকে জীবনের মুখ্য লক্ষ্য ঈশ্বর আরাধনা করাই হচ্ছে অপরিগ্রহ।

### ২. নিয়ম

অষ্টাঙ্গযোগের দ্বিতীয় হচ্ছে নিয়ম। মহর্ষি পতঞ্জলি শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন।

### ক. শৌচ

শৌচ বলে শুনিকে, পবিত্রতাকে। এই শৌচ দুই প্রকারের হয় : এক বাহ্য এবং দ্বিতীয় অভ্যন্তরীণ। সাধকের প্রতিদিন জল দ্বারা শরীরের শুনি, সত্যাচারণ দ্বারা মনের শুনি, বিদ্যা আর তপ দ্বারা আত্মার শুনি এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধির শুনি করা উচিত।

### খ. সন্তোষ

সন্তোষ অর্থ সম্যক তৃষ্ণি। এই সন্তোষ হঠাত আসে না, একটু একটু করে তাকে মনের মধ্যে জাগাতে হয়। মনে সন্তোষ না থাকলে কোনো কিছুর প্রতি মনোনিবেশ করা যায় না। যোগীর অভাব বোধ থাকে না, তাই তাঁর মনে কোনো অসন্তোষও থাকে না। তাঁর মনে যে সন্তোষ থাকে তাতে তিনি স্বর্গসুখ অনুভব করেন।

### গ. তপ

তপ হচ্ছে কোনো সঙ্কল্পসন্ধির উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনা। সেই সাধনায় প্রয়োজন আত্মশন্তি, আত্মশাসন ও আত্মসংযম। যোগে তপ বলতে বোঝায় ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তিম মিলনের জন্য সচেতন চেষ্টা।

### ୩. ସାଧ୍ୟାୟ

ସାଧ୍ୟାୟ ମାନେ ବେଦ-ଅଧ୍ୟୟନ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଭଗବଦ୍-ବିଷୟକ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନଙ୍କ ବଲା ଯେତେ ପାରେ । ସାଧ୍ୟାୟ ଥେକେ ଯେବେ ମହାନ ଚିନ୍ତା ଉଡ଼ୁତ ହୁଯ ତା ସାଧ୍ୟାୟୀର ରଙ୍ଗପ୍ରାତେ ମିଶେ ଯାଇ ଏବଂ ତାର ଜୀବନେ ଓ ସନ୍ତାଯ ଅନ୍ତିଭୂତ ହୁଯ ।

### ୪. ଈଶ୍ୱର-ପ୍ରଣିଧାନ

ପ୍ରଣିଧାନ ଅର୍ଥ ଅର୍ପଣ । ସମନ୍ତ କର୍ମ ଓ ଇଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱରେ ଅର୍ପଣ କରାର ନାମ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ । ଈଶ୍ୱରେ ସବ ଅର୍ପଣ କରଲେ ଅହଂ ବା ଅହଂକାର ନାଶ ହୁଯ । ଈଶ୍ୱରେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଛେ ତାର ଜୀବନେ କଖନଙ୍କ ହତାଶା ଆସେ ନା । ତାର ଜୀବନ ତେଜେ ଭରେ ଉଠେ । ଯୋଗୀ ତାର ସମନ୍ତ କର୍ମ ଈଶ୍ୱରେ ଅର୍ପଣ କରେନ । ତାଇ ତାର ସମନ୍ତ କର୍ମେ ତାର ଭିତରକାର ଦେବତା ଫୁଟେ ଉଠେ ।

### ୫. ଆସନ

ଆସନ ଅର୍ଥ ଛିର ହୁଯେ ସୁଖେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥାକା - ଛିରସୁଖମ୍‌ଆସନମ୍ । ଦେହମନକେ ସୁହ ଓ ଛିର ରାଖାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦେହତଳି ବା ଦେହବଞ୍ଚାନ ତାକେ ଆସନ ବଲେ । ଆସନେ ଶରୀରେ ଦୃଢ଼ତା ଆସେ, ଶରୀର ନୀରୋଗ ଓ ଲୟଭାର ହୁଯ । ଏକଟା ଛିର ଓ ସୁଖକର ଭଞ୍ଜିବାକୁ କିଛୁକ୍ଷଣ ଅବଞ୍ଚାନ କରଲେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଯ । ଆସନେ ଶରୀରେ ଓ ମନେ ସମସ୍ୟା ଘଟେ । ଯୋଗୀ ଆସନେ ଦେହକେ ଜୟ କରେ ତାକେ ଆଭାର ବାହନ ହିସେବେ ଗଡ଼େ ତୋଳେନ । ଆସନ ନାନା ପ୍ରକାର । ସେମନ- ପଦ୍ମାସନ, ସୁଖାସନ, ଗୋମୁଖାସନ, ହଲାସନ ଇତ୍ୟାଦି । ଏହି ଆସନ ଅନୁଶୀଳନେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଯୋଗୀପୂରୁଷ ନିଜ ଦେହ ଓ ମନକେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାଯ ଲିବିଷ୍ଟ କରାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରେନ । ଯୋଗସାଧନାୟ ଆସନ ଅନୁଶୀଳନ ଏକଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାପାର । ତବେ କୋଣୋ ଶୁରୁ ବା ଯୋଗୀର ନିକଟ ଏହି ଆସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷା କରା ଦରକାର ।

### ୬. ପ୍ରାଣାୟମ

ପ୍ରାଣାୟମ ଅର୍ଥ ପ୍ରାଣେର ଆୟାମ । ପ୍ରାଣ ହଲୋ ଶାସକରପେ ଗୃହୀତ ବାଯୁ ଆର ଆୟାମ ହଲୋ ବିଭାର । ସୁତରାଂ ପ୍ରାଣାୟମ ବଲତେ ବୋକ୍ତା ଶାସ-ପ୍ରଶାସେର ବିଭାର । ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ-ପ୍ରଶାସେର ସାଭାବିକ ଗତିକେ ନିୟମଣ୍ଣ ଏବଂ ନିଜ ଆଯାମେ ଆଲାଇ ପ୍ରାଣାୟମ । ପ୍ରାଣାୟମେ ଶାସ-ପ୍ରଶାସ ବିଭାରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘତର କରା ହୁଯ । କାରଣ, ଯୋଗୀର ଆୟୁ ଦିଲଗଣନାୟ ଛିର ହୁଯ ନା, ଛିର ହୁଯ ଶାସ ଗଣନାୟ । କତବାର ତିନି ଶାସ ଗ୍ରହଣ କରଲେନ ତା ଦିଯେଇ ତାର ଆୟୁ ପରିମାପ କରା ହୁଯ । ସତ ବେଶି ତିନି ଶାସ ଗ୍ରହଣ କରବେଳ ତତ ବେଶି ତାର ଆୟୁକ୍ଷଯ ହବେ । ସେହି କାରଣେ ତିନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତୀରଭାବେ ଓ ଛନ୍ଦୋବନ୍ଧଭାବେ ଶାସ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ଏହିକମ ଛନ୍ଦୋବନ୍ଧଭାବେ ଶାସ ଗ୍ରହଣ କରଲେ ଶ୍ଵସନତତ୍ତ୍ଵ ବଲିଷ୍ଠ ହୁଯ, ମ୍ଲାୟୁତତ୍ତ୍ଵ ଶାନ୍ତ ଥାକେ ଏବଂ କାମନାବାସନା ହ୍ରାସ ପାଇ । ରେଚକ, ପୂରକ ଓ କୁଷ୍ଟକ-ଏହି ତିନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣାୟମ ସମ୍ପଲ୍ଲ ହୁଯ । ଶାସ ଗ୍ରହଣକେ ବଲେ ପୂରକ, ଶାସତ୍ୟାଗକେ ବଲେ ରେଚକ ଏବଂ ଶାସ ଧାରଣକେ ବଲେ କୁଷ୍ଟକ । ପ୍ରାଣାୟମକେ ଏକଧରନେର ବିଜ୍ଞାନ ବଲା ଯେତେ ପାରେ, ଶାସ-ପ୍ରଶାସେର ବିଜ୍ଞାନ । ତବେ ସଦ୍ଗୁରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵବିଧାନ ଛାଡ଼ା କଖନଙ୍କ ପୂରକ-ରେଚକ-କୁଷ୍ଟକ ସମସ୍ତିତ ପ୍ରାଣାୟମ କରା ଉଚିତ ନାହିଁ ।

## ୫. ପ୍ରତ୍ୟାହାର

ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅର୍ଥ ଫିରିଯେ ନେଓଯା । ବାହ୍ୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥେକେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟସମୂହକେ ଭିତରେ ଦିକେ ଫିରିଯେ ନେଓଯାକେ ଯୋଗେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବଲେ । ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଓ ଅଭ୍ୟାସେର ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍ଗଲୋକେ ଅନ୍ତମୁଖୀ କରା ଯାଏ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍ଗଲୋ ଅନ୍ତମୁଖୀ ହଲେ ଚିନ୍ତେ ବିଷୟ ଆସନ୍ତି ନଟ ହୁଏ । ଏମତାବଞ୍ଚାୟ ଚିନ୍ତ ଆରାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁତେ ନିବିଟ ହତେ ପାରେ ।

## ୬. ଧାରଣା

ମନକେ ବିଶେଷ କୋନୋ ବିଷୟେ ଛିର କରା ବା ଆବନ୍ଦ ରାଖାର ନାମ ଧାରଣା । ଧାରଣା ଅର୍ଥ ଏକାଗ୍ରତା । ଏକାଗ୍ରତା ଛାଡ଼ା ଜଗତେ କିଛିହୁ ଆଯନ୍ତ କରା ଯାଏ ନା । କୋନୋ ବିଷୟ ଆଯନ୍ତ କରତେ ହଲେ ଚିନ୍ତବ୍ୟନିକେ ବିଷୟାନ୍ତର ଥେକେ ପ୍ରତ୍ୟାହାତ କରେ ଏହି ବିଷୟେ ସ୍ଥାପନ କରତେ ହୁଏ । ଈଶ୍ୱର ଲାଭ କରତେ ଈଶ୍ୱରେ ଏକାଗ୍ରଚିନ୍ତ ହତେ ହୁଏ । ଏକାଗ୍ରଚିନ୍ତ ହତେ ହଲେ ଏକ-ତତ୍ତ୍ଵ ଅଭ୍ୟାସ କରତେ ହୁଏ । ନିଜ ଦେହର ଅଗ୍ରବିଶେଷେ ଯେମନ- ନାଭି, ନାକେର ଅଗ୍ରଭାଗ ବା ଆ-ଯୁଗଲେର ମଧ୍ୟଥାନେ ଅର୍ଥବା କୋନୋ ଦେବମୂର୍ତ୍ତି ବା ଯେ କୋନୋ ବସ୍ତୁତେ ମନକେ ନିବିଟ କରା ଯେତେ ପାରେ । ମନକେ କୋନୋ ବିଷୟେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରେ ନିବିଟ ରାଖାର ଅଭ୍ୟାସେର ଦ୍ୱାରା ଯୋଗୀ ଅଭିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୌଛାନୋର କରାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରେ । ଧାରଣା ହଜ୍ଜେ ଧ୍ୟାନେର ଭିତ୍ତିରେରିବାପାଇଁ ।

## ୭. ଧ୍ୟାନ

ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ନିରବଚିନ୍ନ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା । ମନ ଯଦି ନିରବଚିନ୍ନଭାବେ ଈଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତା କରେ ତାହଲେ ଦୀର୍ଘ ଚିନ୍ତନେର ପର ଅନ୍ତିମ ଈଶ୍ୱରୋପମ ହତେ ପାରେ । ଧ୍ୟାନେ ଯୋଗୀର ଦେହ ଶ୍ଵାସ-ପ୍ରଶ୍ଵାସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବିଚାରଣକୁ ଅହଂକାର ସବକିଛୁ ଈଶ୍ୱରେ ଲୀନ ହେଁ ଯାଏ ଏବଂ ତିନି ଏମନ ଏକ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥା ଚଲେ ଯାଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ଯାଏ ନା । ତଥନ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଛାଡ଼ା ତାର ଆର କୋନୋ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ନା । ତିନି ତାର ଆପନ ଅନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା ଦେଖିତେ ପାନ ।

## ୮. ସମାଧି

ସମାଧି ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଈଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତୁ ସମପର୍ଣ୍ଣ କରତେ ପାରିଲେ ପରମାତ୍ମାର ମଧ୍ୟେ ଜୀବାତ୍ମାର ନିବେଶ ଘଟେ, ସାଧକେର ଅନ୍ୟେଷଣେର ଶେଷ ହୁଏ । ଧ୍ୟାନେର ଉତ୍ୟନ୍ତ ଶିଖରେ ଉଠେ ସାଧକ ସମାଧି ଲାଭ କରେନ । ତଥନ ତିନି ମନଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ, ଅହଂଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ନିରାମୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ତଥନ ପରମାତ୍ମାର ସଙ୍ଗେ ତାର ମିଳନ ଘଟେ । ତଥନ ତାର ‘ଆମି’ ବା ‘ଆମାର’ ଜ୍ଞାନ ଥାକେ ନା, କାରଣ ତଥନ ତାର ଦେହ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଵର୍ଗ ଥାକେ । ସାଧକ ତଥନ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ଲାଭ କରେନ ।

## ପାଠ ୫ : ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଯୋଗେର ଶୁରୁତ୍ୱ

ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଯୋଗ ଅନୁସରଣ ଓ ଅନୁଶୀଳନେ ମାନୁଷେର ଅଶାନ୍ତ ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଓ ତାର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ପ୍ରମତ୍ତା ନଦୀତେ ବୀଧି ଦିଯେ, ଖାଲ ଖନନ କରେ ଯଥନ ତାକେ ସଠିକଭାବେ ବଶେ ଆନା ହୁଏ ତଥନ ଏକ ବିଶାଳ ଜଳାଧାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇ ଜଳାଧାରେର ଜଳେ ଫସଲ ଫସେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ମାନୁଷେର ଜୀବନ ସୁଖ ଓ ସମ୍ମଦ୍ଦିତେ ଭରେ ଓଠେ । ଠିକ ତେମନି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଯୋଗ ପାଲନ କରେ ଅଶାନ୍ତ ମନକେ ବଶେ ଆନନ୍ଦେ ପାରା ଯାଏ ବିଧାୟ ଶାନ୍ତିର ପାରାବାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆତ୍ମୋଭ୍ରାନ୍ତରେ ଅପରିମ୍ଯେ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରା ଯାଏ ।

ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଯୋଗ ପାଲନ ନା କରେ କୋମୋ ସ୍ଵକ୍ଷିଳେ ଯୋଗୀ ହତେ ପାରେ ନା । ସମ ଏବଂ ନିଯମ ହଚେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଯୋଗେର ଆଧାର । ସମ ଆର ନିଯମେ ସାଧକେର ଭାବ ଆର ଆବେଗ ନିଯାତ୍ରିତ ହୁଏ, ଜଗତେର ଅନ୍ୟସବ ମାନୁଷେର ସଙ୍ଗେ ତାଁର ଏକଟା ଏକତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଆସନେ ଦେହ ଓ ମନ ସୁହୁ ସବଳ ଓ ସତେଜ ହୁଏ, ତଥନ ପ୍ରକୃତିର ସଙ୍ଗେ ତାଁର ଏକଟା ଏକତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଶେଷେ ତାଁର ଦେହଚେତନତା ଲୁଣ ହେଁ ଯାଏ । ଦେହକେ ତିନି ଜୟ କରେ ଆଜ୍ଞାର ବାହନ ହିସେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେନ । ପ୍ରାଣୀଯାମ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସାଧକେର ଶ୍ଵାସ-ପ୍ରଶ୍ଵାସ ନିୟମିତ କରେ ତାଁର ମନକେ ବଶେ ଆନେ । ତାତେ ତାଁର ଇନ୍ଦ୍ରିୟସମୂହ ବୈଷୟିକ ଆକାଙ୍କ୍ଷାର ଦାସତ୍ୱବକ୍ଷଣ ଥେକେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ । ଧ୍ୟାନ, ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧି ସାଧକକେ ତାଁର ଆଜ୍ଞାର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶେ ନିୟେ ଯାଏ । ସାଧକ ତଥନ ଈଶ୍ଵରାନୁସନ୍ଧାନେ ସ୍ଵର୍ଗେର ଦିକେ ତାକାନ ନା । ତଥନ ତାଁର ଉପଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଏ ଈଶ୍ଵର ଆଛେନ ତାଁରଇ ଅନ୍ତରୀତ୍ତା ନାମେ ।

ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଯୋଗ ଧର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମା, ମାନବତା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନେର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରେଇ ନିଜେକେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ରୂପେ ପ୍ରମାଣ କରିରୁଛେ । ପୃଥିବୀ ଥେକେ ଖୂନ, ସଂଘର୍ଷ ସାଥେ କୋମୋ ଉପାରେ ବନ୍ଧ କରତେ ହୁଏ, ତାହଲେ ସୌଟା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଯୋଗେର ମାଧ୍ୟମେଇ ସମ୍ଭବ । ସାଦି ପୃଥିବୀର ସବ ଲୋକ ବାସ୍ତବେ ଏଇ ବ୍ୟାପାରଟା ନିୟେ ଏକମତ ହୁଏ ଯେ, ବିଶେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହେଁଯା ଉଚିତ, ତାହଲେ ତାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନଇ ହଚେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଯୋଗେର ଚର୍ଚା । ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଯୋଗେ ଜୀବନେର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ଥେକେ ଶୁରୁ କରେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସମାଧି ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥାଙ୍ଗଲୋର ଅନୁପମ ସମାବେଶ ରହେଛେ । ସାଦି କୋମୋ ସ୍ଵକ୍ଷିଳେ ନିଜେର ଅନ୍ତିତ୍ରେ ଥୋଜ କରେ ଏବଂ ଜୀବନେର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟେର ସଙ୍ଗେ ପରିଚିତ ହତେ ଚାଯ, ତାହଲେ ତାଁର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଯୋଗେର ପାଲନ ଅବଶ୍ୟାଇ କରା ଉଚିତ ।

ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଯୋଗ ଦ୍ଵାରାଇ ସ୍ଵକ୍ଷିଳିତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଏକତା, ଶାରୀରିକ ସୁହୁତା, ବୌଦ୍ଧିକ ଜାଗରଣ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦେର ଅନୁଭୂତି ହତେ ପାରେ ।

**ଏକକ କାଜ : ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଯୋଗ ପାଲନେର ଉପକାରିତା ଲିଖେ ଏକଟି ତାଲିକା ତୈରି କର ।**

**ନତୁନ ଶବ୍ଦ : ପ୍ରତିପାଦିତ, ଆଜ୍ଞାକେନ୍ଦ୍ରିତ, ଜାଗତିକ, ସମ୍ୟକ, ଶ୍ଵସନତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟାହତ, ଈଶ୍ଵରୋପମ, ଲୀନ, ଅମେଷଣ, ଉତ୍ୟୁଜ, ନିରାମୟ, ପ୍ରମତ୍ତା, ପାରାବାର, ଏକତାନ, ବୈଷୟିକ ।**

## ପାଠ ୬ : ବୃକ୍ଷାସନେର ଧାରଣା, ପଦ୍ଧତି ଓ ପ୍ରଭାବ

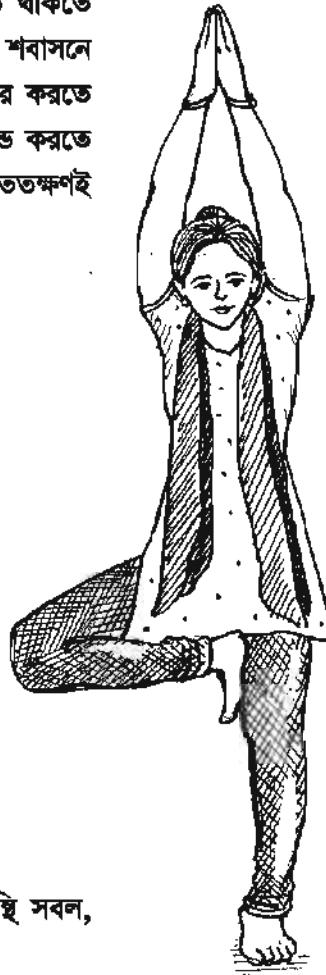
### ବୃକ୍ଷାସନେର ଧାରଣା ଓ ପଦ୍ଧତି

ଏହି ଆସନେ ଆସନକାରୀର ଦେହ ବୃକ୍ଷେର ନ୍ୟାୟ ହୁଏ ବଲେ, ଏକେ ବୃକ୍ଷାସନ ବଲେ ।

ଦୁଇପା ଜୋଡ଼ା କରେ ସୋଜା ହେଁ ଦାଁଡାତେ ହବେ, ପାଯେର ପାତା ମାଟିତେ ସମାନଭାବେ ଲେଗେ ଥାକବେ । ଏବାର ଡାନ ପା ହାଁଟୁତେ ଭେଙେ ଗୋଡ଼ାଲି ବା ଉର୍କମୂଲେ ରାଖତେ ହବେ, ପାଯେର ପାତା ଉର୍କର ସଙ୍ଗେ ଲେଗେ ଥାକବେ, ପାଯେର ଆଙ୍ଗୁଲଙ୍ଗଲୋ ଥାକବେ ନିଚେର ଦିକେ ଫେରାନୋ । ଏଥିଲ କେବଳ ବା ପାଯେର ଉପର ଭର ଦିଯେ ଦାଁଡିଯେ ଥାକତେ ହବେ । ଏବାର ନମକାରେର ଭାଙ୍ଗିତେ ହାତେର ତାଲୁ ଦୁଇଟି ଜୋଡ଼ା କରେ ବୁକେର କାହେ ଆନତେ ହବେ, ତାରପର ତାଲୁ ଦୁଇଟି ଜୋଡ଼ା ରେଖେ ହାତ ଦୁଇଟି ସୋଜା ମାଥାର ଉପର ନିତେ ହବେ । ଶ୍ଵାସ-ପ୍ରଶ୍ଵାସ ସ୍ଵାଭାବିକ ରେଖେ ଏହିଭାବେ ନିଶ୍ଚଳ ହେଁ ୧୦ ମେଟେ ଥାକତେ ହବେ । ପରେ ହାତ ନାମିଯେ ହାତେର ତାଲୁ ଦୁଇଟି ଛେଡ଼େ ଦିଯେ ଡାନ ପା ସୋଜା କରେ ଆବାର ଆଗେର ମତୋ ଦୁପାଯେ ସୋଜା ହେଁ ଦାଁଡାତେ ହବେ । ଏବାର ଠିକ ଏକଇଭାବେ ଡାନ ପାଯେ ଦାଁଡିଯେ ଆସନଟି କରତେ ହବେ ।

এবারও শ্বাস-প্রশ্বাস স্থাভাবিক রেখে এইভাবে নিশ্চল হয়ে ১০ সেকেন্ড থাকতে হবে। আবার আগের মতো দুইপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। শেষে শ্বাসনে ১০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে হবে। এই হলো একবার। এই ইকম তিনবার করতে হবে। ১০ সেকেন্ডে অভ্যন্ত হয়ে গেলে আজ্ঞে আজ্ঞে বাড়িয়ে ৩০ সেকেন্ড করতে হবে। বাঁ পায়ে যতক্ষণ করা হবে ডান পায়েও ততক্ষণ করতে হবে এবং ততক্ষণই শ্বাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

**একক কাজ : বৃক্ষাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।**



### প্রভাব

বৃক্ষাসন নিরমিত অনুশীলন করলে -

১. শরীরের ভারসাম্য বজার রাখার ক্ষমতা বাঢ়ে।
২. পায়ের পেশির দৃঢ়তা ও ছিত্তিষ্ঠাপকতা বৃদ্ধি পায়।
৩. পায়ের জ্বেল পাওয়া যায়, চলাকেরা করার ক্ষমতা বাঢ়ে।
৪. উরুর সংযোগস্থলের ছিত্তিষ্ঠাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।
৫. কোমরের ও মেরুদণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়।
৬. হাতের ও পায়ের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়।
৭. হাঁটু, কল্পুর, বগল সমস্ত ম্লায়তজ্জীবিতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় ও গ্রহিণী সুবল, নমনীয় হয়।
৮. পায়ের ব্যাথায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায় এবং পায়ে কোনোদিন বাত হতে পারে না।
- ৯। ঘাঁটের হাত-পা কাঁপে, পা দুর্বল তাঁদের খুব উপকার হয়।
- ১০। রক্তে অত্যধিক কোলেস্টেরল থাকার দরকান বা অন্য কোনো কারণে পায়ের ধমনীতে যে শক্ত হলদে চর্বিজ্ঞাতীয় পদার্থ জমে, যাকে অ্যাথেরোমা বলে, তা রোধ হয়। ফলে প্রোগ্রেসিস হতে পারে না।

**একক কাজ : বৃক্ষাসন অনুশীলনের পাঁচটি উপকারিতা লেখ।**

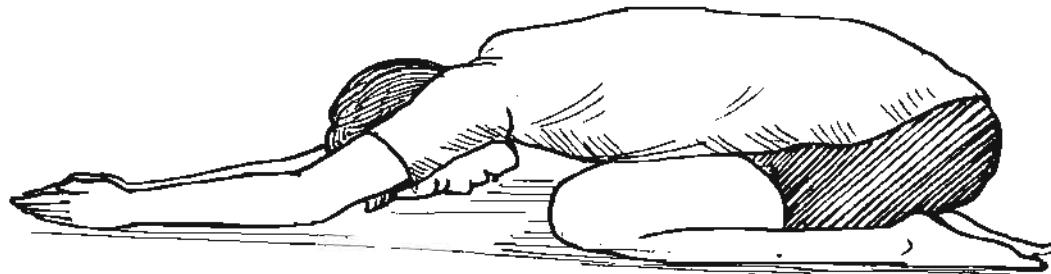
**নতুন শব্দ :** বৃক্ষাসন, দৃঢ়তা, ছিত্তিষ্ঠাপকতা, ম্লায়তজ্জীবী, গ্রহিণী, কোলেস্টেরল, ধমনী, অ্যাথেরোমা, প্রোগ্রেসিস, নিশ্চল।

### ପାଠ ୭ : ଅର୍ଧକୂର୍ମାସନେର ଧାରଣା, ପଞ୍ଜତି ଓ ଥିବାବ

#### ଅର୍ଧକୂର୍ମାସନେର ଧାରଣା ଓ ପଞ୍ଜତି

'କୂର୍ମ' ଅର୍ଥ କଛୁପ । ଏହି ଆସନେ ଆସନକାରୀର ଦେହ ଦେଖିବେ ଅନେକଟା କଛୁପେର ପିଠେର ନ୍ୟାଯ ହୁଯ ବଲେ ଏକେ ଅର୍ଧକୂର୍ମାସନ ବଲେ । ହାଁଟୁ ଗେଡ଼େ ବସନ୍ତେ ହୁବେ । ଦୁଇ ହାଁଟୁ ଆର ଦୁଇ ପାଯେର ପାତା ଜୋଡ଼ା ଥାକବେ, ନିତମ୍ ଥାକବେ ଗୋଡ଼ାଳିର ଉପର । ପାଯେର ତଳା ଉପର ଦିକେ ଫେରାନୋ ଥାକବେ । ହାତ ହାଁଟୁର ଉପର ଆରାୟ କରେ ପାତା ଥାକବେ । ହାଁଟୁ ଥିକେ ପାଯେର ଆଙ୍ଗୁଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମନ ଅଣ୍ଟେ ମାଟିତେ ଲେଗେ ଥାକବେ । ଏବାର ହାତ ଦୁଟୋ ସୋଜା କରେ ଦୁଇ କାନେର ପାଶ ଦିଯେ ମାଥାର ଉପର ଭୁଲାନ୍ତେ ହୁବେ ।

ନମ୍ବକାର କରାର ଭକ୍ଷିତେ ଏକ ହାତେର ତାଳୁ ଆର ଏକ ହାତେର ତାଳୁର ସଙ୍ଗେ ଲାଗିଯେ ଏକ ହାତେର ବୁଡ୍ଢୋ ଆଙ୍ଗୁଳ ଦିଯେ ଆର ଏକ ହାତେର ବୁଡ୍ଢୋ ଆଙ୍ଗୁଳ ଜଡ଼ିଯେ ଧରନ୍ତେ ହୁବେ । ହାତ ଦୁଟୋ ଦୁଇ କାନେର ସଙ୍ଗେ ଲେଗେ ଥାକବେ । ମେରଦଣ ସୋଜା ଥାକବେ । ଶ୍ରୀରେର ଉପରେର ଆଙ୍ଗୁଳ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତେ ହୁବେ । ତଥନ ଦେଖାବେ ଏକଟା ମନ୍ଦିରେର ଚଢ଼ାର ମତୋ । ଏବାର ହାତ ସୋଜା ରେଖେ ନିଷ୍ଠାସ ଛାଡ଼ନ୍ତେ ଛାଡ଼ନ୍ତେ କୌମର ଥିକେ ଥିଶାମ କରାର ମତୋ ଭକ୍ଷିତେ କପାଳ ମାଟିତେ ଠେକାନ୍ତେ ହୁବେ ଏବଂ ହାତେର ସଂୟୁକ୍ତ ତାଳୁ ଯତନ୍ଦ୍ର ସନ୍ତବ ଦୂରେ ମାଟିତେ ରାଖନ୍ତେ ହୁବେ । ଏ ସମୟ ଯାତେ ନିତମ୍ ଗୋଡ଼ାଳି ଥିକେ ଉଠେ ନା ପଡ଼େ ଏବଂ ପେଟେ, ବୁକେ, ପୌଜରେର ଦୁଇପାଶେ ଓ ଉର୍ମନ୍ତେ ହାଙ୍କା ଚାପ ପଡ଼େ ସେଦିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖନ୍ତେ ହୁବେ । ଖାସ-ପ୍ରଥାସ ସାଭାବିକ ରେଖେ ଏହି ଅବହ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ ହୁଯେ ୩୦ ମେନ୍‌କେନ୍ଦ୍ର ଥାକନ୍ତେ ହୁବେ । ଏରପର ନିଷ୍ଠାସ ନିତେ ନିତେ ଆଗେର ମତୋ ବସନ୍ତେ ହୁବେ । ତାରପର ହାତ ପା ସୋଜା କରେ ୩୦ ମେନ୍‌କେନ୍ଦ୍ର ଶବାସନେ ବିଶ୍ରାମ ନିତେ ହୁବେ । ଏହିଭାବେ ତିନବାର କରନ୍ତେ ହୁବେ । ଉଚ୍ଚରଙ୍ଗଚାପ ଆଛେ ଏମନ ରୋଗୀଦେର ଏହି ଆସନ କରା ନିଷେଧ ।



#### ଥିବାବ

ଅର୍ଧକୂର୍ମାସନ ନିୟମିତ ଅନୁଶୀଳନ କରିଲେ-

୧. ଶ୍ରୀର ଅନେକ ଶିଥିଲ ହୁଯ ।
୨. ମେରଦଣ ସତେଜ ହୁଯ ।
୩. ପେଟେର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶଗୁଲୋ ସବଳ ଓ ସଜ୍ଜିତ ହୁଯ ।
୪. ଆସନକାରୀ ଅନେକ ବେଶ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଓ ସୁର୍ବାହ୍ୟ ଲାଭ କରେ ।
୫. ମନ୍ତ୍ରିକ ଶାନ୍ତ ହୁଯ ।
୬. ଯକୃତ ଭାଲୋ ଥାକେ ।
୭. ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଅଷଳ, କୃଧାମାନ୍ଦ୍ୟ, କୋଷ୍ଟକାଠିନ୍ୟ, ଆମାଶୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦୂର ହୁଯ ।
୮. ହଜମ ଶକ୍ତି ବାଡ଼େ ।

৯. পেটে বায়ু থাকলে তার প্রকোপ কমে।
১০. হাঁপানি আর ডায়াবেটিসে উপকার হয়।
১১. পায়ের পেশির ব্যথা ও হাঙ্গের বাত সারে।
১২. কাঁধের পেশির ব্যথা ভালো হয়।
১৩. পেটের ও নিতব্যের চর্বি কমে।
১৪. পেট ও উরুর পেশি সবল হয়।
১৫. মন অনেক ধীর, হিঁর ও শান্ত হয় এবং সুর্খ ও দুঃখ সমানভাবে নিতে পারে।
১৬. ভাবাবেগ, ভয়-ভীতি আর ক্ষেত্র আলগা হয়।
১৭. আসনকারীকে আস্তে আস্তে দৃঢ়-যত্নগা থেকে শুক্ত করে, ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীন করে।
১৮. যোগীকে তাঁর যোগ সাধনায় মনোনিবেশের জন্য প্রস্তুত করে।

**দলীল কাজ :** অর্ধকূর্মসনের উপকারিতা লিখে পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : কূর্ম, শিথিল, অঙ্গীর্ণ, অবল, কোষ্ঠকাঠিল্য, নিতব্য, পৌজ্য, প্রকোপ, ঘৃণ্ণ।

### পাঠ ৮ ও ৯ : গুরুড়াসনের ধারণা, পক্ষতি ও প্রভাব

#### গুরুড়াসনের ধারণা ও পক্ষতি

এই আসনে দেহভঙ্গী গুরুড়-এর মতো হয়। তাই এর নাম গুরুড়াসন।

দুইপা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ডান হাত কনুইয়ের কাছে ভেঙ্গে বাঁ কনুইয়ের নিচ দিয়ে নিয়ে গিয়ে ডান হাতের তালু বাঁ হাতের তালুতে নমস্কারের ভঙ্গিতে রাখতে হবে। এবার বাঁ গা মাটিতে রেখে ডান পা দিয়ে বাঁ গা পেঁচিয়ে ধরতে হবে। তারপর স্বাভাবিকভাবে দম নিতে ও ছাড়তে হবে। এ অবস্থানে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। হাত গা বদল করে আসনটি ৪ বার অভ্যাস করতে হবে এবং শ্বাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

**একক কাজ :** গুরুড়াসন অনুশীলন করে দেখাও।

#### প্রভাব

গুরুড়াসন নিয়মিত অনুশীলন করলে-

১. পায়ের ও হাতের গঠন সুন্দর হওয়ার সাথে সাথে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়।
২. পায়ে বাত হতে পারে না।
৩. পায়ের পেশিতে খিল ধরতে পারে না।



୪. ଡକ, ନିତସ, ପେଟ ଆର ହାତେର ଉପରେର ନିକ ମଜ୍ବୁତ ହସ ।
୫. ନିତସ, ହାତୁ ଆର ଗୋଡ଼ାଲିର ଗୋଟିର ନମନୀଯତା ବାଢ଼େ ।
୬. କାଥ ଶକ୍ତ ହସେ ଗିଯେ ଥାକଲେ ତା ଭାଲୋ ହସ ।
୭. ବୀକା ମେରମନ୍ତ ସୋଜା ହସ ।
୮. ବ୍ରାହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରକ୍ତା କରା ସହଜ ହସ ।
୯. ଦେହ ଶବ୍ଦା ହସ ।
୧୦. ଦେହେର ଭାରସାମ୍ୟ ଠିକ ଥାକେ ।
୧୧. କିଭଣି ଭାଲୋ ଥାକେ ।

ଦଲୀଯ କାଙ୍ଗ : ଗର୍ଜାସନେର ଉପକାରିତାଙ୍କୋ ଲେଖ ।

**ନାହନ ଶକ୍ତି : ବ୍ରାହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ନମନୀଯତା, ଭାରସାମ୍ୟ ।**

**ହଳାସନେର ଧାରণା, ପରିପ୍ରକାଶ ଓ ଅଭ୍ୟାସ**

**ହଳାସନେର ଧାରণା ଓ ପରିପ୍ରକାଶ**

'ହଳ' ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲାଙ୍ଘନ । ଏହି ଆସନେ ଦେହଭଙ୍ଗି ଆନେକଟା ହଳେର ଅର୍ଥାଂ ଲାଙ୍ଘନେର ମତୋ ଦେଖାଇ ବଳେ ଏକେ ହଳାସନ ବଳେ ।



ପା ଦୂଟୋ ସୋଜା କରେ ଚିକ ହସେ ତମେ ପଢ଼ିବେ । ଡକ, ହାତୁ ଓ ପାରେର ପାତା ଜୋଡ଼ା ଥାକବେ । ହାତ ଦୂଟୋ ସୋଜା କରେ ଶରୀରେର ଦୁ ପାଶେ ରାଖିବେ । ଏବାର ନିଃଶ୍ଵାସ ଛାଡ଼ିବେ ଛାଡ଼ିବେ ପା ଦୂଟୋ ଜୋଡ଼ା ଓ ସୋଜା ଅବଶ୍ୟାଯ ଆଣେ ଉପରେ ଭୁଲିବେ ହସେ ଏବଂ ମାଥାର ପେଣ୍ଠିଲେ ସତଦୂର ସମ୍ଭବ ଦୂର ନିତେ ହସେ ଯେବେ ପାରେର ଆନ୍ତରିକ ଆଣ୍ଟି ମାତ୍ରା କରିବେ । ଶାସ-ଶାସନ ବ୍ୟାଜବିକ ରେଖେ ଏହି ଅବଶ୍ୟାଯ ୩୦ ସେକେନ୍ଟ ଥାକିବେ ୧୨ ହସେ । ଏକପର ଆଣେ ଆଣେ ପା ନାଥିରେ ଆଗେର ଅବଶ୍ୟାଯ ଫିରେ ଯେତେ ହସେ ଏବଂ ଶବ୍ଦାମ୍ୟ ୩୦ ସେକେନ୍ଟ ବିଶ୍ୱାମ୍ୟ

নিতে হবে। এভাবে আসনটি তিনবার অনুশীলন করতে হবে। যাদের আমাশয়, হদরোগ, উচ্চরক্তচাপ আছে এবং যাদের পীহা, যকৃৎ অস্থাভাবিক বড় তাদের আসনটি করা উচিত নয়।

একক কাজ : হলাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।

### প্রভাব

হলাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে -

১. মেরুদণ্ডকে সুস্থ ও নমনীয় করে তোলে।
২. মেরুদণ্ডের ছিঁতি-স্থাপকতা বজায় থাকে।
৩. মেরুদণ্ড সংলগ্ন মাঝুকেন্দ্র ও মেরুদণ্ডের দুপাশের পেশি সতেজ ও সক্রিয় হয়।
৪. কোষ্ঠবন্ধতা, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা প্রভৃতি পেটের যাবতীয় রোগ দূর হয়।
৫. পীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
৬. থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, টনসিল প্রভৃতি গ্রহিত স্বল্প ও সক্রিয় হয়।
৭. পেট, কোমর ও নিতম্বের মেদ কমিয়ে দেহকে সুঠাম ও সুস্নদর করে গড়ে তোলে।
৮. ডায়াবোটিস, বাত বা সায়টিকা কোনো দিন হতে পারে না।
৯. পিঠে ব্যথা থাকলে তা দূর হয়।
১০. যাদের কাঁধ শক্ত হয়ে গেছে তাদের উপকার হয়।

নতুন শব্দ : হল, পীহা, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, কোষ্ঠবন্ধতা।

### অনুশীলনী

বহনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। 'যোগই হলো আধ্যাত্মিক কামধেনু' - কে বলেছেন ?

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| ক. ব্যাসদেব       | খ. ডক্টর সম্পূর্ণানন্দ |
| গ. মহর্ষি পতঙ্গলি | ঘ. মহর্ষি যাজ্ঞবক্ষ্য  |

২। অন্তেয় অর্থ কী ?

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| ক. সম্যক তৃষ্ণি | খ. নিজেকে জানা |
| গ. একাগ্রতা     | ঘ. চুরি না করা |

৩। কোনটি ধ্যানের ভিত্তি স্বরূপ ?

- |          |               |
|----------|---------------|
| ক. নিয়ম | খ. আসন        |
| গ. ধারণা | ঘ. প্রত্যাহার |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নবম শ্রেণির ছাত্র সৌরভ সহজ-সরল ও সদালাপী। সে কখনো কাউকে কষ্ট কথা বলে না এবং অন্যের ক্ষতির চিন্তা করে না। এমনকি বিড়াল এসে টেবিলে রাখা তার গ্লাসের দুধটুকু পান করতে থাকলে সে রাগ করে না। বরং আদর করে বিড়ালটিকে বাকি দুধটুকু পান করায়।

৪। সৌরভের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যথের কোনটি লক্ষণীয় ?

- |              |               |
|--------------|---------------|
| ক. অস্ত্রেয় | খ. ব্রহ্মচর্য |
| গ. অহিংসা    | ঘ. অপরিগ্রহ   |

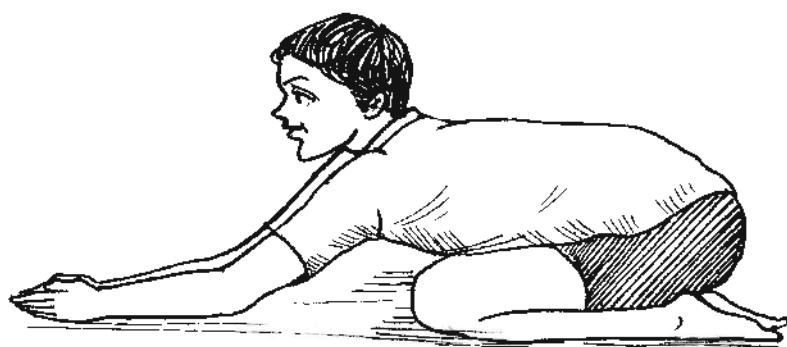
৫। যথের উক্ত গুণটির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এর দ্বারা -

- i. আত্মান্নয়ন ঘটে
- ii. সমাজের শান্তি বজায় থাকে
- iii. বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত হয়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. i ও ii      |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন :



- ক. যোগের মাধ্যমে ইশ্বর আরাধনার প্রক্রিয়াকে কী বলে ?
- খ. অষ্টাঙ্গযোগের একটি ধাপ ব্যাখ্যা কর।
- গ. যোগাসনটিতে কী ক্রটি রয়েছে তা নিরূপণ কর।
- ঘ. মানসিক শান্তি এবং শারীরিক সুস্থিতা আনয়নে চিত্রের আসনটির সঠিক অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ- বিশেষণ কর।

## সন্তুষ্ট অধ্যায়

### ধর্মগ্রন্থে নৈতিক শিক্ষা

ধর্ম শব্দটির অর্থ, ‘যা ধারণ করে’। ধ্ ধাতু + মন् (প্রত্যয়) = ধর্ম। ধ্ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। যা হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে, তাকেই বলে ধর্ম। মানবজীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য বিভিন্ন উপদেশ, নির্দেশ রীতিনীতি, আধ্যান-উপাধ্যান যে-গুলো লিপিবদ্ধ আছে, তাই ধর্মগ্রন্থ। ধর্মের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা রয়েছে এবং ধর্মগ্রন্থের প্রতিও সকলেরই শ্রদ্ধা-ভক্তি রয়েছে। আর এজন্যই মানুষ ধর্মগ্রন্থ পাঠ অথবা শ্রবণ করা ধর্মের অঙ্গ বলে অভিহিত করে।



ধর্মগ্রন্থে ধর্মতত্ত্ব, ধর্মচার, ধর্মীয় সংক্ষার, ধর্মানুষ্ঠান অনুকরণীয় উপাখ্যান প্রভৃতি সম্বিবেশিত থাকে। কাজেই আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। এই ধর্মগ্রন্থগুলো হলো বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি। এ অধ্যায়ে উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, উপনিষদের গুরুত্ব ও শিক্ষা, উপনিষদ থেকে একটি উপদেশমূলক উপাখ্যান ও তার শিক্ষা উপস্থাপন করব। একই সঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারতের শিক্ষাও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ও ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্মগ্রন্থ হিসেবে উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করতে পারব
- ধর্মাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে উপনিষদের গুরুত্ব ও শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- উপনিষদের একটি উপাখ্যান ও এর শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব
- ধর্মাচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে রামায়ণ ও মহাভারতের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- রামায়ণ-মহাভারতে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে উদ্দৃষ্ট হব।

### পাঠ ১ : আদর্শ জীবনচারণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ও ভূমিকা

মানুষ জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধিতে সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের সক্ষজ্ঞান হাজার হাজার বৎসর ধরে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে। তারপর লিপি আবিক্ষারের পর থীরে থীরে এ সমস্ত জ্ঞান প্রস্থাকারে সম্প্রবেশিত হয়েছে। বেদ, উপনিষদ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে মানুষের কল্যাণে ঐশ্বরিক তত্ত্ব, ইহলোক ও পরলোকের কথা, শ্রেয় ও প্রেয়ের কথা, নানা আখ্যান ও উপাখ্যানের মাধ্যমে মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-উচ্ছ্বাস, মৃদ্ধ-বিগ্রহ, রাজা-রাজবংশের কথা, সৃষ্টিতত্ত্ব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে নানা রহস্যের কথা, এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা যে ব্রহ্ম প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। বেদ হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ। তাই হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয়। বেদকে আশ্রয় করেই হিন্দুধর্মের বিকাশ।

এর পূর্বে আমরা ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য অবগত হয়েছি। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কেও কিছু কিছু তথ্য জেনেছি। আমাদের সকলেরই ধর্ম মেনে চলা উচিত। মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। যার মনুষ্যত্ব নেই, সে পশুর সমান। ধর্ম পালন করলে পশুপ্রবৃত্তির বিনাশ ঘটে। জেগে ওঠে মানবিকতা ও পৰিত্বার এক বিশুদ্ধ কল্যাণ অনুভূতি। এ কল্যাণবোধই ধর্ম। আমরা জানি, মনুসংহিতায় বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং বিবেকের বাণী এ চারটিকে বলা হয়েছে ধর্মের বিশেষ লক্ষণ-

‘বেদ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মানঃ।

এতচ্চতুর্বিধৎ প্রাচ্ছঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্ ॥’ (মনুসংহিতা, ২/১২)

অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বাণী এ চারটি ধর্মের বিশেষ লক্ষণ। বেদে বিশ্বাস রেখে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন মেনে এবং মহাপুরুষদের আচরিত কার্যক্রম তথা সদাচার থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে জীবনে চলতে হয়। আর এতেও যদি সমস্যার সমাধান না হয় তখন নিজের বিবেকের দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কাজে লাগাতে হয় নিজের অভিজ্ঞতালক্ষ কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞানকে।

একক কাজ : ধর্মের লক্ষণ কয়টি ও কী কী? লেখ।

মনুসংহিতায় ধর্মের আরও দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে :

‘ধৃতিঃ ক্ষমা দমোৎস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ।

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ।’

অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংয়ম, শুদ্ধ বুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য এবং ক্রোধহীনতা এ দশটি লক্ষণের মধ্য দিয়ে ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পায়। সব কিছুর মূলে ইশ্বর। সুতরাং ধর্মের মূলও ইশ্বর। ইশ্বরকে ভক্তি করা ধর্মের মূল কথা। ইশ্বরের নির্দেশিত পথে চলা সকলেরই কর্তব্য। যা ধর্মের বিপরীত তাই অধর্ম। যেমন চুরি না করা ধর্ম। সুতরাং চুরি করা অধর্ম। অতএব চুরি করা উচিত নয়। কারণ এতে অধর্ম হয়। অধর্ম নৈতিকতা-বিরোধী। ধর্ম নৈতিক শিক্ষার সহায়ক।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা ধর্ম ও অধর্ম সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করেছি এ সমস্ত কিছুই ধর্মগ্রন্থে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ধর্মগ্রন্থে আছে বিভিন্ন কাহিনী বা উপকাহিনী, আখ্যান-উপাখ্যান। আর এ সমস্ত বর্ণনাতে

দেখানো হয়েছে কীভাবে ধর্মের জয় হয় আর অধর্ম কীভাবে পরাজিত ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ধর্মগ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে কী করলে মানবের কল্যাণ হবে, কী করলে নেতৃত্ব উন্নতি হবে। আর একথাও বর্ণিত হয়েছে কীভাবে মানুষ নিজের ধৰ্মস নিজেই ডেকে আনে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আদর্শ জীবন ও নেতৃত্বিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে আমরা আমাদের জীবনকে নেতৃত্বের অধিকারী করে গড়ে তুলব। এভাবেই আমাদের সমাজ তথা জাতি ও দেশ হবে উন্নত ও সমৃদ্ধ।

**একক কাজ :** ধর্মের যে দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, তা লেখ।

## পার্ট ২ : উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আমরা বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীচতুর্ণি প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের পরিচয় জেনেছি। এবার আমরা বৈদিক সাহিত্য থেকে উপনিষদ নিয়ে আলোচনা করব।

### উপনিষদ

‘বেদ’ একটি বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার। বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানতে হলে বেদই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ। বেদ এক অখণ্ড জ্ঞানরাশি, যা দ্বারা মানবজাতি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বর্গের সন্ধান লাভ করতে পারে। প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, আচার-নিষ্ঠা, সবই এই বেদের মধ্য দিয়ে প্রতিভাবত হয়েছে। মনুসংহিতায় লিখিত হয়েছে, ‘বেদঃ অখিলধর্মমূলম্’- অর্থাৎ ‘বেদ ধর্মের মূল।’

বৈদিক সাহিত্য বলতে সাধারণত চার প্রকার ভিন্ন ধরনের অথচ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত রচনার সমষ্টি বোঝায়। যেমন- (১) মন্ত্র বা সংহিতা, (২) ব্রাহ্মণ, (৩) আরণ্যক ও (৪) উপনিষদ। এ রচনা সমষ্টিকে দুইটি কাণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে; যথা- (ক) কর্মকাণ্ড ও (খ) জ্ঞান কাণ্ড। কর্মকাণ্ডে আছে মন্ত্র, যাগ-যজ্ঞ, অনুষ্ঠান, আচার-নিয়ম পালনের নির্দেশনা। আর জ্ঞান কাণ্ডে রয়েছে ঈশ্বরের কথা, ব্রহ্মের কথা, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি রহস্যের কথা। উপনিষদ এই জ্ঞান কাণ্ডেরই অংশ। ব্রহ্মকে নিয়ে এ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যা গুহ্যতম বিদ্যা যা মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কারণ নিয়ে আলোচনায় ভরপুর। জন্ম আর মৃত্যু মানুষের নিকট এক বিরাট রহস্য। তাই উপনিষদকে রহস্য বিদ্যাও বলা হয়। উপ-নি-সদ যোগে কঢ়িপ=উপনিষদ্ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ‘উপ’ অর্থ-সমীক্ষে, নি’ অর্থাৎ নিশ্চয়ের সাথে, সদ অর্থাৎ বিনষ্ট করা, সুতরাং সামগ্রিক অর্থ দাঁড়ায় গুরুর নিকট উপস্থিত হয়ে নিশ্চয়ের সাথে যে গুহ্যবিদ্যা শিক্ষাদ্বারা অবিদ্যা প্রভৃতিকে বিনাশ করে তাই উপনিষদ। উপনিষদ সম্পর্কে অন্যরূপ ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। যেমন- জনসাধারণ যেখানে চারদিকে (পরি) বসে (সদ) তাকে বলে পরিষদ; এভাবে লোকেরা যেখানে একসঙ্গে (সম) বসে (সদ) তাকে বলে সংসদ। অন্যরূপভাবে শিষ্যগণ গুরুর নিকট (উপ) গিয়ে যেখানে বসতেন (নি-সদ) মূলত সেই ছোট-ছোট বৈঠকের নাম ছিল উপনিষদ। কালক্রমে এসব বৈঠকে বা উপনিষদে যে বিদ্যার অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা হতো তারও নাম হয় উপনিষদ। এরপর যে গ্রন্থে এই বিদ্যা লিপিবদ্ধ হলো তার নামও হলো উপনিষদ।

ଉପନିଷଦେର ଆରା ଏକଟି ଅର୍ଥ ହଲୋ ରହସ୍ୟ । ଅତିଶ୍ୟ ଗଭୀର ଏବଂ ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟ ବଳେ ଏହି ଉପନିଷଦ ବା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାକେ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାର ନ୍ୟାୟ ଯତ୍ତତ୍ତ୍ଵ ସକଳେର ନିକଟ ପ୍ରକାଶ କରା ହତୋ ନା ତାଇ ଏହି ଏକ ନାମ ରହସ୍ୟ । ଏଜନ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଓ ରହସ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଦୁଟି ସମାର୍ଥକ ହୁଏ ପଡ଼େ । ଜଗତେର ସର୍ବକାଳେର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବନାର ଚରମରୂପ ଏହି ଉପନିଷଦ । ପ୍ରତିଟି ବେଦେର ପୃଥିକ ପୃଥିକ ଉପନିଷଦ ବିଦ୍ୟମାନ । ଉପନିଷଦେର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଶତାଧିକ । ଏହି ମଧ୍ୟେ ବାରଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନିଷଦ ।

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନିଷଦ ବଲତେ ଯେ ବାରଟି ଉପନିଷଦକେ ବୋକାୟ ସେଙ୍ଗଲୋ ହଲୋ- ଐତରେୟ, କୌରୀତକି, ବୃଦ୍ଧାରଣ୍ୟକ, ଈଶ, ତୈତ୍ତିରୀୟ, କଠ, ଶେତାଶ୍ଵତର, ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ, କେନ, ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଣ୍ଡକ ଓ ମାଣ୍ଡକ୍ୟ । ଏହି ମଧ୍ୟେ ମାଣ୍ଡକ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟଗୁଲୋ ଶକ୍ତରାଚାର୍ୟ କର୍ତ୍ତ୍ତକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ହୁଏହେ ବିଧାୟ ଏଗୁଲୋକେ ପ୍ରଧାନ ଉପନିଷଦ ବଲା ହୁଏ ।

**ଏକକ କାଙ୍ଗ :** ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦ ସମ୍ପର୍କେ ତିନଟି କରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖ ।

### ପାଠ ୩ : ଉପନିଷଦେର ଶୁରୁତ୍ୱ ଓ ଶିକ୍ଷା

ଆଗେଇ ବଲେଛି, ବେଦେର ଦୁଟି କାଣ୍ଡ । ଯଥା କର୍ମକାଣ୍ଡ ଓ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ । ଉପନିଷଦ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡେର ଅଭିର୍ଗତ । କାରାଓ କାରାଓ ଯତେ, ବେଦେର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଶେଷ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବା ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏତେ ସଂଗ୍ରହୀତ, ସେଜନ୍ୟ ଏହି ବେଦାନ୍ତ । ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାଇ ବେଦେର ସାର, ଏଜନ୍ୟ ଏହି ନାମ ବେଦାନ୍ତ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ନିବୃତ୍ତି ଓ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାଣିର ଉପାୟ ବଳେ ଏହି ଅପର ନାମ ହୁଏହେ ଉପନିଷଦ । ଅବିଦ୍ୟା ବା ଅଜ୍ଞାନକେ ନାଶ କରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୁଦ୍ଧିକାରୀ ଜୀବକେ ପରମବ୍ରଦ୍ଧେର ନିକଟେ ନିଯେ ଯାଇ । ପରମବ୍ରଜ୍ଞପ୍ରାଣି ସାଧନ ବା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ଆଲୋଚନା ରହେହେ ଏ ଉପନିଷଦ ପ୍ରତ୍ସମ୍ଭୁତେ ।

ଉପନିଷଦ ବା ବେଦାନ୍ତ ରହସ୍ୟାବୃତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ଶାସ୍ତ୍ର । ଯାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତେ ବ୍ରକ୍ଷନିଷ୍ଠ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରେର ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ ବ୍ରତୀ ହନ, ଏକମାତ୍ର ତାରାଇ ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ଵକେ ଅନ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରତେ ପାରେନ । ଉପନିଷଦଗୁଲୋ ସାଧାରଣତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଆରଣ୍ୟକେର ଅଂଶ, ତବେ ଈଶ୍ୱରପାଦନିଷଦଟି ସଂହିତାର ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ । ତାଇ ଏହି ଏକିକିଏ ସଂହିତାପନିଷଦ ବଲା ହୁଏ; ଆର ଅନ୍ୟଗୁଲୋକେ ବଲା ହୁଏ ବ୍ରକ୍ଷୋପନିଷଦ ।

ସାଂସାରିକ ଜୀବନେର ଧନ, ମାନ, ପ୍ରତିପତ୍ତିର ପ୍ରତି ବୀତମ୍ପ୍ରତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍‌ଦୀନୀନ ଏକଶ୍ରେଣିର ଲୋକ ଜୀବନେର ପ୍ରକୃତ ଗୃହ ଅର୍ଥ ନିର୍ଧାରଣେ ଉତ୍ସୁକ ହୁଏ ସଂମାର ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ଅରଣ୍ୟେ ବସେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ-ଧାରଣା କରତେନ, ତାଦେର ଚିନ୍ତାପ୍ରସୂତ ଉତ୍କିଞ୍ଚଲୋଇ ଉପନିଷଦେ ଥାନ ପେହେହେ । ତାଦେର ଶିଷ୍ୟ-ପ୍ରଶିଷ୍ୟେରା ତାଦେର ପାଦପ୍ରାଣେ ବସେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରତେନ ଏବଂ ନିଜେରାଓ ଶୁରୁର ନିକଟ ଲକ୍ଷ ଜ୍ଞାନେର ଓ ସାଧନାର ଅନୁଶୀଳନ କରେ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରେନ ।

ଉପନିଷଦେର ଶିକ୍ଷା ମାନୁସକେ ଜୀବନ ବିମୁଖ କରେ ନା, ବରଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନେର କଥା ବଳେ, ଯେ ଜୀବନ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ଓ ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରେମେର ଦ୍ୱାରା ବ୍ରକ୍ଷେର ସାଥେ ସର୍ବଦାଇ ଯୁକ୍ତ । ବ୍ରକ୍ଷଇ ସତ୍ୟ, ଏ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଜୀବ ବ୍ରକ୍ଷ ଛାଡ଼ା କିଛୁଇ ନନ୍ତ । ଜଗତେର ସର୍ବକିଛୁଇ ବ୍ରକ୍ଷମଯ ଉପନିଷଦେର ଏ ଉପଲବ୍ଧି ଥେକେ ବଲା ହୁଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରକ୍ଷାତ୍ମେର ଯା କିଛୁ ଆଛେ ସବୁଇ ଏକ । କାରୋ ସାଥେ କାରୋ କୋମୋ ଭେଦ ନେଇ । ସୁତରାଂ କେଉଁ କାଉକେ ହିଂସା କରା ମାନେ ନିଜେକେଇ ହିଂସା କରା । କାରୋ କ୍ଷତି କରା ମାନେ ନିଜେରାଇ କ୍ଷତି କରା । ଅତଏବ ଆମାଦେର ସକଳେରାଇ ଉଚିତ ଏକେ

অপরকে হিংসা না করে সাহায্য ও সহযোগিতা করা। সকলকে নিজের মতো করে দেখা। আর এভাবেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে, রাষ্ট্রে, সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি।

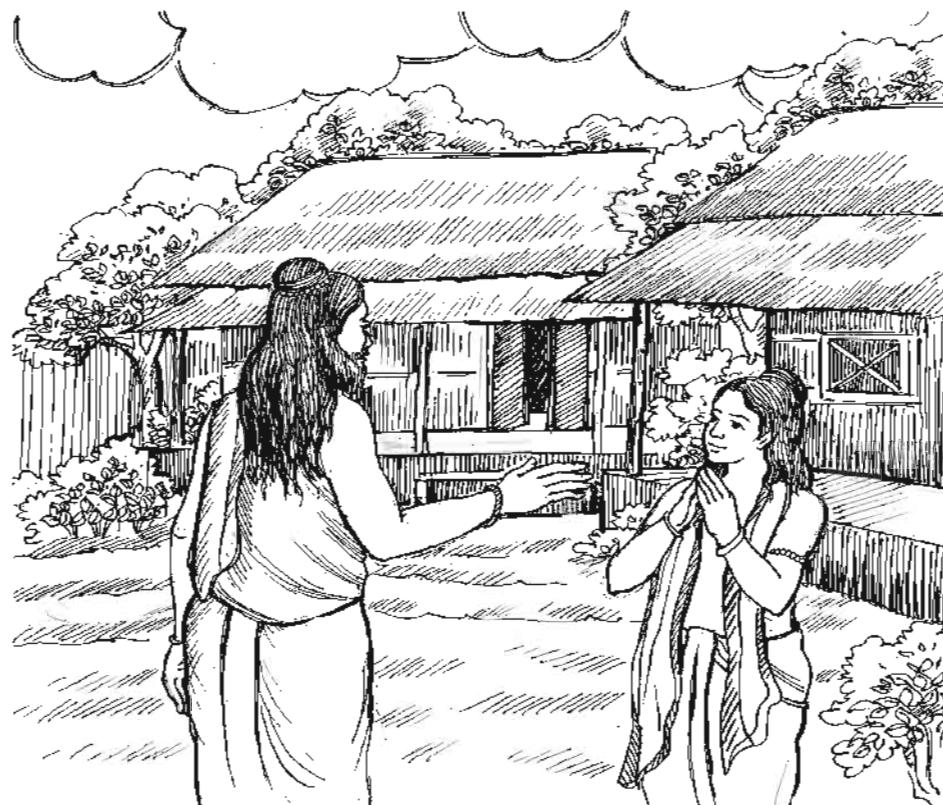
**একক কাজ :** সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি কীভাবে গড়ে উঠতে পারে তোমার ভাবনার আলোকে একটি পোস্টার তৈরি কর।

## পাঠ ৪ : উপাধ্যান

### আরুণি- শ্বেতকেতু সংবাদ

পুরাকালে আরুণি নামে মহাজ্ঞানী এক খবি ছিলেন। শ্বেতকেতু নামে তাঁর এক পুত্র ছিল। শ্বেতকেতুর যখন বার বছর বয়স হলো তখন খবি আরুণি তাকে ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য শুরুগৃহে প্রেরণ করেন। বার বছর শুরুগৃহে থেকে শ্বেতকেতু সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করে অহংকারী, অবিনীত ও পঙ্গিত হয়ে গৃহে ফিরে এলেন। পিতা তাকে বললেন, ‘শ্বেতকেতু, তুমি ত মহামনা, পঙ্গিত হয়ে ফিরে এসেছ। কিন্তু তুমি কি সেই আদেশের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে, যাতে অশ্রুত বিষয় শোনা যায়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তা করা যায় এবং অজ্ঞাত বিষয় জানা যায়?’ শ্বেতকেতু বললেন, ‘ভগবান, কি সেই উপদেশ?’ পিতা বললেন, ‘হে সৌম্য! একটি মৃৎপিণ্ডকে জানলেই সমস্ত মৃত্যু বন্ধ সম্পর্কে জানা যায়। কারণ একটা ঘট একটা সরা, ইত্যাদি মৃত্তিকার বিকার মাত্র। ভাষা দ্বারা পার্থক্য না করলে সবই মৃত্তিকা। অনুরূপ একটি সুবর্ণপিণ্ডকে জানলেই সকল সুবর্ণময় বন্ধকে জানা যায়। কুণ্ডল, বলয় প্রভৃতি সুবর্ণের বিকার মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সুবর্ণই সত্য। এসবই মৃত্তিকার বা সুবর্ণের বিকার ছাড়া কিছুই নয়। মৃত্তিকা বা সুবর্ণই সত্য। তেমনি হে শ্বেতকেতু, সেই উপদেশ শ্রবণ করলে অশ্রুত বিষয় শোনা হয়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তা করা যায় এবং অজ্ঞাত বিষয় জানা যায়।’ শ্বেতকেতু বললেন, ‘পূজনীয় উপাধ্যায়গণ নিশ্চয়ই এ বিষয়ে অবগত ছিলেন না। যদি অবগত হতেন, তবে বললেন না কেন?’

সুতরাং আপনি আমাকে এ বিষয়ে উপদেশ দিন।’ আরুণি বললেন, ‘হে সৌম্য, তা-ই হোক।’ আরুণি বলতে সাগলেন— শোন, এ জগৎ পূর্বে এক ও অদ্বিতীয় সত্ত্বপেই বিদ্যমান ছিল। তিনি চিন্তা করলেন, ‘বহু স্যাম’ অর্থাৎ বহু হব। তারপর তিনি তেজ সৃষ্টি করলেন। তেজ থেকে জল উৎপন্ন হলো। জল থেকে অন্ন সৃষ্টি হলো। এজন্যই যেখানে বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে বহু অন্ন জনো। অন্ন থেকে মন, জল থেকে প্রাণ এবং তেজ থেকে বাক-এর উৎপত্তি। শ্বেতকেতু বললেন,- ‘আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিন।’ আরুণি বললেন, ‘শোন, পুরুষ মোলকলা যুক্ত। পনের দিন ভোজন করো না, কিন্তু যতটা ইচ্ছা জল পান করো, কারণ প্রাণ জলময়। জলপান করলে প্রাণ বিয়োগ হয় না।’



ଶେତକେତୁ ପନେର ଦିନ ଭୋଜନ କରଲେନ ନା । ତାରପର ପିତାର ନିକଟ ଗିଯେ ବଲଲେନ, ‘ପିତା, ଆମି କି ବଲବ?’ ପିତା ବଲଲେନ, ‘ଝକ, ଯଜୁ ଓ ସାମ ମଞ୍ଜ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ।’ ଶେତକେତୁ ବଲଲେନ, ‘ଏ ସବ ଆମାର ମନେ ଆସଛେ ନା ।’ ଆରଣ୍ଯ ବଲଲେନ, - ‘ସୌମ୍ୟ ପନେର ଦିନ ଅନାହାରେ ଥେକେ ତୋମାର ସୋଲଟି କଲାର ମାଡ଼ ଏକଟି କଲା ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଛେ । ଏର ଦ୍ୱାରା ବେଦ ସମୃଦ୍ଧ ବୁଝାତେ ପାରଛ ନା । ତୁମି ଆହାର କର । ପରେ ଆମାର କଥା ବୁଝାତେ ପାରବେ ।’

ଶେତକେତୁ ଭୋଜନ କରେ ପିତାର ନିକଟ ଗେଲେନ । ପିତା ତାଙ୍କେ ଯା କିଛୁ ବଲଲେନ, ତିନି ସେ ସବଇ ଆନାଯାସେ ବୁଝାଲେନ । ତିନି ବଲଲେନ, ହେ ସୌମ୍ୟ, ଜଳ ଭିନ୍ନ ଦେହେର ମୂଳ କୋଥାୟ? ଜଳରୂପ ଅକ୍ଷୁରଦ୍ଧାରା କାରଣରୂପ ତେଜକେ ଅସ୍ଵେଷ କର । ବିଶ୍ୱ ଚରାଚର ଏ ସବଇ ସଂ ଥେକେ ଉତ୍ପନ୍ନ, ସଂ-ଏ ଆଶ୍ରିତ ଓ ସଂ-ଏ ଲୀନ ହୁଏ । ଏହି ସଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ।

ଶେତକେତୁ ବଲଲେନ, ‘ହେ ପିତା, ବୁଝାତେ ପାରଲାମ ନା ।’

ଆରଣ୍ଯ ବଲଲେନ, ‘ହେ ସୌମ୍ୟ, ଏ ଆତ୍ମାକେ ଜ୍ଞାନତେ ପାରଲେଇ ବ୍ରକ୍ଷକେ ଜ୍ଞାନ ଯାଇ । କାରଣ, ‘ସର୍ବ ଖଲ୍ଲିଦଂ ବ୍ରକ୍ଷ’- ଅର୍ଥାତ୍ ସବ କିଛୁଇ ବ୍ରକ୍ଷମୟ ।’

ଶେତକେତୁ ବଲଲେନ, ‘ତାହଲେ ଆପଣି କେ?’

ଆରଣ୍ଯ ବଲଲେନ, ‘ବ୍ରକ୍ଷାଶ୍ମି- ଅର୍ଥାତ୍ ଆମି ବ୍ରକ୍ଷ ।’

ଶେତକେତୁ - ତାହଲେ, ଆମି କେ?

আরুণি- ‘তত্ত্বমসি অর্থাং তুমিই সেই (ব্রহ্ম)।’

শ্বেতকেতু- যদি আমি, আপনি এবং জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময় তাহলে আমরা তাকে দেখতে পাই না কেন? তখন আরুণি শ্বেতকেতুকে এক গ্রাস জলে এক চামচ লবণ রেখে পরের দিন আসতে বললেন। শ্বেতকেতু তাই করলেন। পরের দিন সকালে আরুণি শ্বেতকেতুকে বললেন, ‘কাল যে লবণ রেখেছিলে, তা আন।’ শ্বেতকেতু লবণ খুঁজে পেলেন না। আরুণি শ্বেতকেতুকে বললেন, গ্রাস থেকে জল পান কর। শ্বেতকেতু জলপান করলেন।

আরুণি বললেন, ‘কি রকম?’

শ্বেতকেতু বললেন, ‘লবণাঙ্গ।’

আরুণি বললেন, ‘হে শ্বেতকেতু, লবণ জলে জীন হয়ে আছে; তাই দেখা যায় না। কিন্তু সর্বদা জলের সর্বত্র বিদ্যমান। অনুরূপভাবে ব্রহ্ম সর্বদা সকল স্থানে বিদ্যমান, তাকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু জানা যায়। এ ব্রহ্মাই জানার বিষয়। তিনিই সৎ, তিনিই আত্ম। আর এই ব্রহ্মকে জানা মানে আত্মাকে জানা, নিজেকে জানা। এটাই প্রকৃত জ্ঞান।’

### উপাধ্যায়ের শিক্ষা

‘জগতের সব কিছুই ব্রহ্মময়’ উপনিষদের এ উপলক্ষ থেকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সবকিছুকে ব্রহ্মজ্ঞান করা উপনিষদের শিক্ষা। জীবের মধ্যে আজ্ঞাবূপে ব্রহ্ম অবস্থান করেন। তাই কারও সাথে কারও কোনো ভেদ নেই; কেউ কাউকে হিংসা করা মানে নিজেকেই হিংসা করা। কারও ক্ষতি করা মানে ব্রহ্মের ক্ষতি করা। সুতরাং আমাদের সকলেরই উচিত একে অপরকে হিংসা না করে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

### পাঠ ৫ : ধর্মাচরণ এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে রামায়ণের শিক্ষা

রামায়ণ আদি কবি বাণিকী মুনি রচিত। রামায়ণকে বলা হয় আদিকাব্য। রামায়ণ অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। মূল রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কৃতিবাস বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করেন। এ ধর্মগ্রন্থে আছে আদর্শ রাজার কথা। আছে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়ের কথা। আছে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের কথা। এখানে আছে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনের শিক্ষামূলক নানা কাহিনী ও উপাধ্যান। এ সকল আধ্যাত্মিক ও উপাধ্যায় আমাদের ধর্মাচরণে উত্তুক্ষ করে, মূল্যবোধ সৃষ্টিতে প্রেরণা যোগায় আর নৈতিকতা গঠনে শিক্ষা দেয়।

কৃতিবাসের রামায়ণে রঞ্জকর দস্যুর কাহিনী থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, যদি কেউ পাপ কার্য করে, সেটার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে। পিতা-মাতা-স্তু-পুত্র-কন্যা কেউই তার ভাগীদার হবে না। দস্যু রঞ্জকর ব্রহ্মার উপদেশ গ্রহণ করে একজন খারিতে পরিণত হন। শুধু উপদেশ প্রদানই নয়, গ্রহণ করার মানসিকতাও শুরুত্বপূর্ণ। এ কাহিনিটি আমাদের উপদেশ গ্রহণ করার জন্য উত্তুক্ষ করে। সুতরাং আমাদের

ଉଚିତ ସଦା ସଂପଥେ ଚଲା, ସତ୍ୟ କଥା ବଲା, ମାନୁଷେର ସାଥେ ଭାଲୋ ବ୍ୟବହାର କରା, କାଉକେ ଦୁଃଖ ନା ଦେଇବା । ଧର୍ମଗ୍ରହ୍ସମୂହେ ମାନୁଷେର ଯାତେ ଆଣ୍ଡିକ ଉପାଦି ହୁଏ, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗଡ଼େ ଓଠେ, ଏ ସବ କଥାଇ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଯେଛେ । ରାମାଯଣେ ରହେଇ ପିତାର ପ୍ରତି ପୁତ୍ରେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା, ଆତ୍ମପ୍ରେମ, ପତିପ୍ରେମେର ପରାକାର୍ତ୍ତା, ଦେଶପ୍ରେମେ ନିଷ୍ଠା, ପ୍ରଜାର ପ୍ରତି ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାତାର ପ୍ରତି କନିଷ୍ଠ ଭାତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ । ସେମନ- ରାଜା ଦଶରଥେର ସତ୍ୟରଙ୍ଗା କରତେ ରାମେର ରାଜତ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ଓ ଚୌଦ୍ର ବନସରେର ଜଳ୍ୟ ବନବାସେ ଗମନ । ରାମେର ସାଥେ ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣେର ବନବାସ ଗମନ- ପତିପ୍ରେମେର ପରାକାର୍ତ୍ତା ଓ ଆତ୍ମପ୍ରେମେର ଜ୍ଞାନଶିଳ୍ପ ଉଦାହରଣ ।

ବନବାସେର କାଳେ ଲକ୍ଷାର ରାଜା ରାବଣ କର୍ତ୍ତ୍ରକ ସୀତା ହରଣ ଏବଂ ରାମ କର୍ତ୍ତ୍ରକ ଲକ୍ଷା ଆକ୍ରମଣ ଓ ରାବଣକେ ସବଧିଶେ ନିଧନ କରେ ସୀତାକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦୁଷ୍ଟେର ଦମନ ଓ ଶିଷ୍ଟେର ପାଲନ ଏବଂ ସତ୍ୟେର ଜୟୋତିଷ ପ୍ରମାଣ ହୁଯେଛେ । ମାତା କୈକେଯୀର ଆଚରଣେ ଭରତ କୁନ୍ଦ ହେଁ ବଡ଼ଭାଇ ରାମକେ ଫିରିଯେ ଆନତେ ବନେ ଗମନ କରେନ । ରାମ ଫିରେ ନା ଏବେ ଭରତ ତାର ପାଦୁକା ନିଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଫିରେ ଆସେନ ଏବଂ ରାମେର ନାମେ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରେନ । ଭରତ ରାଜ୍ୟ ହେଁ ଏବଂ ଭୋଗବିଳାସେ ଜୀବନଯାପନ କରେନ ନି । ରାଜସିଂହାସନେ ବସେଥିବା ବଡ଼ଭାଇର ପ୍ରତି ଭାଲୋବାସାର ବଶବତ୍ତି ହେଁ ବନବାସୀର ମତୋ ଜୀବନଯାପନ କରେଛେନ । ଭରତ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣେର ଆଚରଣେ ଆମରା ଆତ୍ମପ୍ରେମେର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ।



ରାମ ଛିଲେନ ଆଦର୍ଶ ରାଜା । ତାଁର ରାଜତ୍ୱେ କେଉଁ କଥିମେ କୋନରାପ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ନା କରେ ଏ ବ୍ୟାପାରେ ତିନି ସର୍ବଦା ସଚେଷ୍ଟ ଛିଲେନ । ତିନି ତାଁର ଜ୍ଞାନ ସୀତାକେ ଭାଲୋବାସତେନ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାଦେର ଘନୋରଜନେର ଜଳ୍ୟ ତିନି ସୀତାକେ ତ୍ୟାଗ କରତେବେଳେ ଦ୍ଵିତୀୟ କରନ୍ତୁ ଆମରା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ ଧାର୍କି । ରାମେର ରାଜତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କେ ପ୍ରବାଦ ଆଛେ ଯେ, ରାମେର ମତୋ ରାଜା କଥିମେ ଛିଲ ନା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତେବେ ହବେ ନା । ତାଇ ଧର୍ମଚରଣେର ପାଶାପାଶି ଆମାଦେର ଧର୍ମଗ୍ରହ୍ସ ରାମାଯଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭବେ ପାଠ କରା ଏବଂ ରାମାଯଣେର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରା ଉଚିତ ।

#### ପାଠ ୬ : ଧର୍ମଚରଣ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ନୈତିକତା ଗଠନେ ମହାଭାରତେର ଶିକ୍ଷା

ମହାଭାରତ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଗ୍ରହ୍ସ । କୃଷ୍ଣହିସ୍ତେପାୟନ ବେଦବ୍ୟାସ ମହାଭାରତ ରଚନା କରେନ । ମୂଳ ମହାଭାରତ ସଂକୃତ ଭାଷାଯ ରଚିତ । କାଶୀରାମ ଦାସ ବାଂଲାଯ ମହାଭାରତ ରଚନା କରେନ । ମହାଭାରତର ବିସ୍ୟବକ୍ତ୍ଵ କୌରବ ଓ ପାଞ୍ଚବଦେର ଯୁଦ୍ଧର କାହିନି । କୁରକ୍ଷେତ୍ରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘଟିତ ହୁଯେଛି । ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ହୁଯେଛେ 'ସ୍ଥା-ଧର୍ମ ତଥା-ଜୟ' । କୌରବ ଓ ପାଞ୍ଚବଦେର ଯୁଦ୍ଧକେ ଉପଜୀବ୍ୟ କରେ ରଚିତ ହଲେବ ଏ ଗ୍ରହେ ସଂଯୋଜିତ ହୁଯେଛେ ନାନା ଆଖ୍ୟାନ-ଉପାଖ୍ୟାନ । ଏ ସମ୍ମତ ଆଖ୍ୟାନ ଉପାଖ୍ୟାନେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଯେଛେ ଧର୍ମର କଥା, ଧାର୍ମିକଗଣେର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକ ଦୁଃଖ-କଟେର ପର ପରିଣାମେ ତାଦେର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳେର କଥା । ଆର ଆଛେ ଅଧର୍ମର କଥା, ଅଧାର୍ମିକର କଥା ଏବଂ ପରିଣାମେ ତାଦେର ପରାଜ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ହେଁ ଯାଓଯାଇ କଥା । ମହାଭାରତେ ଏ ରକମ ବହୁ କାହିନି ଉପକାହିନି ରହେଇଛେ । ଏ ସମ୍ମତ କାହିନି ଉପକାହିନି ମାନୁଷକେ ଧର୍ମର ପଥେ ପରିଚାଲିତ କରେ । ମାନୁଷକେ ଅଧର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟାଯ ପଥ ପରିହାର କରତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ।

মানুষের মনে নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। এ জন্য সকলেরই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে- ‘যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে।’ অর্থাৎ ভারতবর্ষে এমন কোনো ঘটনা নেই যা মহাভারতে বিবৃত হয়নি। মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলে রয়েছে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার দণ্ড, রাজনীতির কূটকৌশলের আশ্রয়ে যেনতেন প্রকারে প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধন করা এবং ন্যায়, ধর্ম ও সত্যকে পরিহার করে অন্যকে তাঁর ন্যায়প্রাপ্তি থেকে বাধিত করা। তাই আমরা দেখি মহাভারতে দুর্যোধনের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে ধর্মের জয় হয়েছে, সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; কুরু বংশ ধৰ্মস হয়েছে, পাণ্ডবগণ তাঁদের হতরাজ্য উদ্ধার করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয়েছে যাঁরা ধার্মিক ও ন্যায়ের পথে যাকে ভগবান তাঁদের সাহায্য করেন। আর যাঁরা অধর্ম ও অন্যায়ভাবে অপরের বন্ধ কেড়ে নিতে চায় ভগবান তাঁদের ক্ষমা করেন না। সাময়িকভাবে তাঁদের প্রভাব প্রতিপক্ষি, ক্ষমতার দণ্ড দেখা গেলেও পরিণামে তাঁদের পতন অনিবার্য। মহাভারতে যে সমস্ত আধ্যাত্মিক উপাধ্যান সন্নিবেশিত হয়েছে, তাতে হিংসার বিষময় ফল আর অহিংসার যে শুভ ফলপ্রাপ্তি তার প্রতিফলন ঘটেছে।

মহাভারত পাঠ করে আমরা রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা গঠনে উত্তুল্লুক হই। মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়কে তাঁর পূর্বপুরুষের বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে মহামতি ব্যাসদেব এ মহাভারত বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে নানা কাহিনি উপকাহিনি। এসকল কাহিনির দ্বারা তৎকালীন সমাজ, রাষ্ট্র, মানুষ, মানবিকতা, সকলই বর্ণিত হয়েছে। এখানে বর্ণিত হয়েছে- রাজার কর্তব্য, প্রজাপালন, অতিথি সেবা, ক্ষমতার চেয়ে ভক্তির উৎকর্ষতার প্রমাণ। বারবার প্রমাণিত হয়েছে- ‘রাখে হরি মারে কে’, অর্থাৎ হরি যাকে রক্ষা করেন, কেউ তাকে ধৰ্মস করতে পারে না। তাই মহাভারত পাঠে আমরা ধর্মাচরণে উত্তুল্লুক হই, মানবিকতা ও নৈতিকতা শিক্ষা লাভ করি, জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার প্রয়াস পাই। সুতরাং আমাদের উচিত মহাভারত অধ্যয়ন করা এবং এর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করা।

**নতুন শব্দ :** বৈদিক, শ্রেয়, প্রেয়, অনুশাসন, উপনিষদ, মোক্ষ, পাণ্ডব, কৌরব, আত্মিক, মৃত্তিকা, সুবর্ণ, ঘট, সরা।

### অনুশীলনী

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। বৃহদারণ্যক উপনিষদ কোন বেদের অন্তর্গত ?

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| ক. শুক্রব্রজুবেদ | খ. কৃষ্ণব্রজুবেদ |
| গ. সামবেদ        | ঘ. ঋক্বেদ        |

২। খেতকেতু কত বছর শুরু গৃহে ছিলেন ?

- |          |        |
|----------|--------|
| ক. দশ    | খ. বার |
| গ. চৌদ্দ | ঘ. ষোল |

୩ । ରତ୍ନା ଶିକ୍ଷକରେ ଉପଦେଶମତ ମନୋଧୋଗ ସହକାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ସାଫଲ୍ୟ ଲାଭ କରେ । ରତ୍ନାର ଆଚରଣେ ପ୍ରକାଶ ପେଯେଛେ -

- i. ଆନୁଗତ୍ୟ
- ii. ଉପଦେଶ ପ୍ରହଳେର ମାନସିକତା
- iii. ଭାଲୋ ଫଲେର ଆକାଙ୍କ୍ଷା

ନିଚେର କୋନ୍ଟି ସଠିକ୍ ?

- |            |                |
|------------|----------------|
| କ. i ଓ ii  | ଘ. ii ଓ iii    |
| ଗ. i ଓ iii | ଘ. i, ii ଓ iii |

ନିଚେର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଡ଼ ଏବଂ ୪ ଓ ୫ ନମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦାଓ :

ଶ୍ରେସୀର ବାବା ଏକଜନ ଶିଳ୍ପପତି । ତିନି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଓ ଧାର୍ମିକ । ତିନି ସବସମୟ ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀଦେର ସୁବିଧା-ଅସୁବିଧାର ଦିକେ ଦୃଷ୍ଟି ରାଖେନ ଏବଂ ଉପୟୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରେନ । ତାଦେର ସାର୍ଥରକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ଯେ କୋନୋ ତ୍ୟାଗ ସ୍ଥିକାର କରେନ ଏବଂ କଥା ଦିଲେ ତା ରାଖାର ଚେଷ୍ଟା କରେନ । ଶ୍ରେସୀଓ କଥନଓ ବାବାର ଅବାଧ୍ୟ ହୁଯ ନା । ସେ ବାବାର ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଙ୍ଗା କରାର ଜନ୍ୟ ଯେ କୋନୋ କାଜ କରତେ ପ୍ରକ୍ଷତ ଥାକେ ।

୪ । ଶ୍ରେସୀର ଚରିତ୍ରେ ତୋମାର ପଠିତ କୋନ ଅବତାରେର ଆଚରଣେର ପ୍ରତିଫଳନ ଲକ୍ଷ କରା ଯାଇ ?

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| କ. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ    | ଘ. ରାମଚନ୍ଦ୍ର |
| ଗ. ଶ୍ରୀଚିତ୍ତନ୍ୟ | ଘ. ବଲରାମ     |

୫ । ଶ୍ରେସୀର ଆଚରଣେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ -

- i. ଭାଲୋବାସା
- ii. ପିତୃଭକ୍ତି
- iii. ଅନୁକର୍ମସା

ନିଚେର କୋନ୍ଟି ସଠିକ୍ ?

- |           |                |
|-----------|----------------|
| କ. i      | ଘ. ii          |
| ଗ. i ଓ ii | ଘ. i, ii ଓ iii |

ସୂଜନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ :

୧ । ଅମିଯ ତାର ବନ୍ଧୁଦେର ନିଯେ ଏକଟି ସମିତି ଗଠନ କରେ ନାଲା ଥାକାର ସମାଜସେବାମୂଳକ କାଜେର ପାଶାପାଶ ଏକଟି ଶିଶୁଦେର ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରେ । ଆଶ୍ରମେର ଜନ୍ୟ ତାଙ୍କା ଚାଁଦା ଦେଇ । କଥନ ଓ ବା ପ୍ରୋଜନେ ଜୋର କରେ ଚାଁଦା ତୋଲେ କିଂବା ଚୁରି କରେ ପ୍ରୋଜନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଟାକା ସଂଗ୍ରହ କରେ । କାରଣ ମନେ କରେ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କଲୋକେ ବାଁଚାତେ ହଲେ ସବସମୟ ନ୍ୟାୟ-ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରଲେ ଚଲବେ ନା । କିନ୍ତୁ

অমিয়র বাবা বলেন, ‘চুরি করা বা জোর করে চাঁদা আদায় উচিত নয়, সৎপথে উপার্জনের মাধ্যমেই ভালো কাজ করতে হয়’।

- ক. কোন্ গ্রন্থ পাঠ করলে ধর্মের লক্ষণগুলো সমझে জানা যায় ?
- খ. নেতৃত্বকৃত গঠনে উদ্বীপকের শুরুত্ব ব্যাখ্যা কর ।
- ঝ. অমিয়র আচরণে ধর্মের যে লক্ষণগুলো প্রকাশ পেয়েছে তা তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর ।
- ঘ. ‘অমিয়র বাবার উপদেশ নেতৃত্বকৃত গঠনে একান্ত সহায়ক’- তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে কথাটি মূল্যায়ন কর ।

২। মিতালীর মধ্যে নেতৃত্বের শুণাবলি দেখে শিক্ষক তাকে শ্রেণি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেন। কিছু শিক্ষার্থী মিতালীকে সমর্থন জানালে তাদের সহযোগিতায় মিতালী যোগ্যতার সাথে সুস্থভাবে দায়িত্ব পালন করে। এতে শিক্ষক এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থীই খুশী। কিন্তু প্রিতম ও কিছু শিক্ষার্থী এটা মেনে নিতে না পারায় তাদের মধ্যে বাক-বিতঙ্গ হয়। তারা মিতালীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়ালে শিক্ষক মিতালীকে সরিয়ে প্রিতমকে দায়িত্ব দেন। কিন্তু পরে অকৃত ঘটনা জানতে পেরে মিতালীকে দায়িত্বে ফিরিয়ে দেন এবং অভিযোগকারীদের সংশোধিত হতে বলেন।

- ক. কে বাংলায় মহাভারত রচনা করেন ?
- খ. মহাভারতে কুরু ও পাঞ্চবন্দের যুদ্ধ শুরুত্বপূর্ণ কেন বুঝিয়ে লেখ ।
- গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রিতমের আচরণিক বৈশিষ্ট্য তোমার পঠিত মহাভারতের বিষয়বস্তুর কোন চরিত্রের প্রতিফলন ব্যাখ্যা কর ।
- ঘ. অনুচ্ছেদের ঘটনায় বর্ণিত শিক্ষকের ভূমিকা তোমার পঠিত মহাভারতের বিষয়বস্তু শিক্ষার আলোকে মূল্যায়ন কর ।

## অষ্টম অধ্যায়

### ধর্মীয় উপাখ্যান ও নৈতিক শিক্ষা

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা ধর্মগ্রন্থ থেকে কীভাবে নৈতিক শিক্ষা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে জেনেছি। বর্তমান অধ্যায়ে ধর্মগ্রন্থে ধর্মীয় উপাখ্যান ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে জানব। ধর্মগ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের আধ্যান-উপাখ্যান ধর্মতত্ত্বের নানা বিষয়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং উপাখ্যানগুলো নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সুতরাং আমরা ধর্মীয় উপাখ্যান পাঠ করব এবং নৈতিক শিক্ষা আর্জন করব। এ অধ্যায়ে ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সন্নিবেশ করার গুরুত্ব, মানবতা ও সৎসাহস নামক দুইটি নৈতিক বিষয়ের ধারণা ব্যাখ্যা ও তার প্রতিফলনমূলক উপাখ্যান বর্ণনা করব।

**এ অধ্যায় শেষে আমরা-**

- ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সন্নিবেশ করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- মানবতার ধারণাটির ধর্মীয় ব্যাখ্যা করতে পারব
- মানবতার দৃষ্টান্তগুলক উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারব
- বর্ণিত উপাখ্যানের শিক্ষা চিহ্নিত করতে পারব
- সমাজ ও পারিবারিক জীবনে এ শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব
- নৈতিক সাহস ধারণার ধর্মীয় ব্যাখ্যা করতে পারব
- সৎ সাহসের দৃষ্টান্তগুলক উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারব
- বর্ণিত উপাখ্যানের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব।

#### পাঠ ১ : ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সন্নিবেশ করার গুরুত্ব

মানুষ সাধারণভাবে ধর্মভীকৃৎ। যে যত শক্তিশালী হোক না কেন, যত প্রভাব প্রতিপন্থি থাকুক না কেন, দৈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তাকে ডয় করে না এমন মানুষ সমাজে দুর্লভ। অর্থাৎ সমাজে যারা সজ্জন, তাঁরা সকলেই ধর্মকে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, সম্মান করেন এবং ধর্মের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলেন। আর এ ধর্মের বিধি-বিধান রয়েছে ধর্মগ্রন্থে। আমরা জানি, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভাগবত, গীতা, চণ্ডী ইত্যাদি। প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে রয়েছে নানা উপাখ্যানের মাধ্যমে মানুষকে সৎপথে, ন্যায়ের পথে চলার উপদেশ। আর এ সকল উপদেশ মানুষকে সত্যকারের মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ভূমিকা রাখে। আমরা যেমন ধর্মকে শ্রদ্ধা করি, তেমনি ধর্মগ্রন্থকেও শ্রদ্ধা করি।



ধর্মগ্রন্থে সন্নিবেশিত আদেশ-নির্দেশ মেনে চলতে হয়। এতেই সমাজে হিংসা-দেষ, হানাহানি ইত্যাদি তিরোহিত হয়ে শাস্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হতে পারে। মানুষ ধর্মগ্রন্থকে মান্য করে, শ্রদ্ধা করে, সম্মান দেয় এবং আগ্রহভরে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে বা শ্রবণ করে ধন্য হয়, সুতরাং মানব জীবনে নেতৃত্ব মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এবং নেতৃত্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মানবের কল্যাণে, সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বদ্ধন দৃঢ় করতেই ধর্মগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে নানা উপাখ্যান। আমরা এসব ধর্মীয় উপাখ্যান পাঠ করে নিজেকে নেতৃত্বিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলব। আর আমরা সবাই যদি এ নেতৃত্বিক শিক্ষায় উদ্বৃক্ষ হই, তাহলে সমাজেও তার প্রভাব পড়বে।

**একক কাজ :** ধর্মগ্রন্থে কী থাকে? ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে কী হয়? এ বিষয়ে পোস্টার তৈরি কর।

## পাঠ ২ : মানবতার ধারণা

মনু+ষ = মানব অর্থাৎ মানুষ। মানুষের সহজাত কিছু প্রবৃত্তি নিয়ে মানুষ জনগ্রহণ করে। যেমন- ক্ষুধা, ত্বক্ষণা, ক্রোধ, ভয়, হিংসা-দেষ, লোভ-লালসা, ইত্যাদি। এই প্রবৃত্তিগুলো থাকলে তাকে মানুষ বলে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ পশু-পাখি, জীব-জন্ম, এমনকি ইতর প্রাণীর মধ্যেও এ প্রবৃত্তিগুলো বিদ্যমান। সুতরাং মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষরূপে চিহ্নিত করা যাবে যখন কোনো একটি বিশেষ গুণের দ্বারা তাকে অন্যান্য জীব-জন্ম থেকে আলাদা করা যাবে। কী সেই গুণ? এক কথায় বলা যায়, এ গুণটির নাম মানবতা। মানবতার জন্যই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না। পাঠের প্রথমে যে সহজাত প্রবৃত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা পশুর মধ্যেও আছে; তাই এগুলোকে পাশবিক আচরণও বলা যেতে পারে। সুতরাং শুধু পাশবিক আচরণ দিয়ে মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানবিক গুণাবলি। যার মধ্যে এই মানবিক গুণ রয়েছে তাকেই প্রকৃত মানব বলে আখ্যায়িত করা যায়।

**একক কাজ :** (ক) মানুষ ধর্মকে কেন শ্রদ্ধা বা সম্মান করে? লেখ।  
 (খ) কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের নাম লেখ।

মানবতা একটি বিশেষ নেতৃত্বিক গুণ। মানবতা ধর্মেরও অঙ্গ। আমরা জানি, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংয়ম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রেণ্য (রাগ না করা) এ দশটি যার মধ্যে আছে তাকে আমরা প্রকৃত মানুষ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। কারণ মানবতার গঠন ও বিকাশে এ গুণগুলো অপরিহার্য। মানুষের সমাজবন্ধ জীব, সমাজে বাস করে এবং অপরের দৃঢ়ত্বে তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। মানুষের প্রতি মানুষের এই যে ভালোবাসা বা মমত্ববোধ, এরই নাম মানবতা। জীবসেবাও মানবতার অঙ্গ।

মানুষের প্রতি মানুষের রয়েছে দরদ, রয়েছে সংবেদনশীলতা। যুগে যুগে মানুষ সত্যের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছে। মানুষের মঙ্গলের জন্য দুঃখ বরণ করেছে। সেবায়, ত্যাগে, কর্মে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হয়েছে। মানুষের কল্যাণ কামনায় নিজের মেধা, শ্রম কর্জে লাগিয়ে নিজেকে সার্থক করেছে, করেছে মহান। মহত্বের উৎস হলো মানবতা বা মানবপ্রেম। মানবপ্রেমে উদ্বৃক্ষ হয়ে অসংখ্য মহৎপ্রাণ ব্যক্তি নিজের

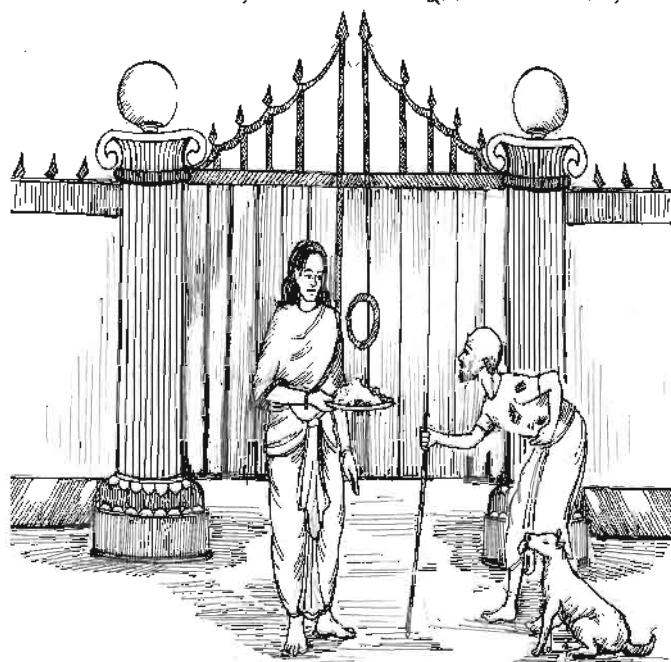
জীবনের সর্বস্থ অন্যের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। কেবল অর্থ দিয়ে নয়, নিজের জীবন দিয়েও বহু মহানুভব ব্যক্তি চরম ত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন। জীবে দয়াই মানব জাতির কল্যাণকর পথ। নিরন্তরকে অমৃ, বন্ধুহীনে বন্ধু, তৃষ্ণার্তকে জল, দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি, বিদ্যাহীনে ধর্মজ্ঞান, বিপন্নকে আশ্রয়, ভয়ার্তকে অভয়, রূপকে ঔষধ, গৃহহীনে গৃহ, শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করা মানবতারই আরেক নাম। আমরা আমাদের জীবনে মানবতার গুণগুলো অর্জন করব। আমরা প্রকৃত মানুষ হব।

**দলীয় কাজ :** মানবিক ও পাশ্চাত্যিক আচরণ বা গুণের তুলনা করে ছক তৈরি কর।

### পাঠ ৩ : রাষ্ট্রিয়বর্মার মানবতা

অনেক অনেক দিন আগের কথা। রাষ্ট্রিয়বর্মা নামে এক প্রজাবৎসল, কৃষ্ণতন্ত্র রাজা ছিলেন। তার রাজ্যের প্রজাগণ সুখে শান্তিতে বসবাস করতেন। তিনি শুধু রাজা ছিলেন না। ছিলেন রাজার রাজা, মহারাজা, সম্রাট। সম্রাট হয়েও রাষ্ট্রিয়বর্মা পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসত্ত নন। শ্রীকৃষ্ণের চরণকেই তিনি একমাত্র সম্পদ বলে জ্ঞান করেন। শ্রীকৃষ্ণের সবকিছু সমর্পণ করে তিনি একবার অ্যাচক বৃন্তি গ্রহণ করেন। অ্যাচক বৃন্তি হলো, কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোকে ইচ্ছে করে বা দয়া করে যা দেবে, তাই দিয়েই দিন যাপন করতে হবে। অ্যাচক বৃন্তি গ্রহণ কবার পর একে একে আটচল্লিশ দিন কেটে গেছে। এই আটচল্লিশ দিনে কেউ তাঁকে কিছুই দেয়নি। তিনিও খেতে চাননি, কেউ ইচ্ছা করে কিছু দেয়নি। উনপঞ্চাশতম দিবসে এক ভক্ত তাঁকে একটি খালায় করে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। এবার তাঁর উপবাস ভঙ্গ হবে। হঠাৎ তাঁর সামনে একজন ভিক্ষুক উপস্থিত; সাথে একটি কুকুর। উভয়ের শরীর খুবই কাহিল। দেখেই বোবা যাচ্ছে, কতদিন কিছুই খায়নি। ভিক্ষুক কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ‘কদিন ধরে কিছুই খেতে পাইনি, দয়া করে আমাকে কিছু খেতে দিন। আমার সাথে আমার কুকুরটিও না খেয়ে আছে।’ ‘ক্ষুধাত’ লোকটির করণ অবস্থা দেখে রাজা রাষ্ট্রিয়বর্মার চোখে জল এল। কুকুরটি ক্ষুধায় ধুঁকছে। রাজা কিছুক্ষণ পূর্বে খাবার ভিক্ষা পেয়েছেন, তার সবটাই ভিক্ষুক ও তার কুকুরটিকে দিয়ে দিলেন।

‘পেট ভরল না’, ভিক্ষুক জানাল। রাজা রাষ্ট্রিয়বর্মা হাতজোড় করে বললেন, ‘আর তো কিছুই নেই, ভাই।’ এরই নাম মানবতাবোধ। নিজে আটচল্লিশ দিন অনাহারে থেকে প্রাণ ওষ্ঠাগত; তবু অপরের দুঃখে নিজের ভিক্ষালক্ষ খাবার



কৃধার্ত ব্যক্তিকে দিয়ে নিজে কষ্ট সহ করা, এটা যে কত বড় মানবতা, তা যে কেউ অনুধাবন করতে পারেন।

**উপাখ্যানের শিক্ষা :** মানবতাই ধর্ম। মানবতা শুণের দ্বারা মানুষের মহসু প্রকাশ পায়, অন্যেরও উপকার হয়। আমরা মানবতা শুণ অর্জন করব। তাহলে নিজের পুণ্য হবে এবং অপরেরও কল্যাণ হবে।

**একক কাজ :** উপাখ্যানটি পড়ে তোমরা কী শিক্ষা পেলে? এ সম্পর্কে খাতায় লেখ।

## পাঠ ৪ ও ৫ : সৎসাহসের ধারণা

‘সাহস’ কথাটির অর্থ ভয়শূন্যতা বা নিভীকতা। ‘সৎ’ শব্দের অর্থ সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা। সুতরাং সৎসাহস কথাটির সামগ্রিক অর্থ হলো সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো অথবা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করার নামই সৎসাহস। অন্য কথায় নিজের জীবনের বুকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য বা অন্যের মঙ্গলের জন্য যে ব্যক্তি নিজের শক্তিদ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে, তাকেই বলে ‘সৎ সাহস’। যখন কেউ দুর্বলের উপর অত্যাচার করে, তখন সৎসাহস নিয়ে দুর্বলের পক্ষে দাঁড়ানো উচিত। দুর্বলকে বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করা এবং অত্যাচারীকে প্রতিহত করার জন্য সৎসাহসের প্রয়োজন হয়। যারা ভীরু-কাপুরুষ তারা কখনো কোনো কল্যাণকর বা মঙ্গলজনক কাজ করতে পারে না। সমাজ, দেশ ও জাতি এদের দ্বারা উপকৃত হয় না। এরা সমাজের জঙ্গল স্বরূপ। আর সৎসাহসী ব্যক্তি সমাজ, দেশ ও জাতির অহঙ্কার। তাঁরা সমাজের, দেশের বা জাতির যে কোনো বিপদে বাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেন না। সৎসাহস মানুষের একটি বিশেষ নৈতিকগুণ। সৎসাহস ধর্মেরও অঙ্গ।

ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা বীরের ধর্ম। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে সৎসাহস দেখানো বীরের কর্তব্য। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে অনেক বীরের কাহিনি আছে যাঁরা তাদের সৎসাহসের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন।

**একক কাজ :** সৎসাহস সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।

## সৎসাহসী বালক তরঙ্গীসেন

ত্রেতা যুগের কথা। অযোধ্যার রাজা দশরথ। তাঁর তিন রানি- কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার পুত্র রাম সকলের বড়। কৈকেয়ীর পুত্র ভরত। সুমিত্রার দুই পুত্র লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন। পুত্রদের মধ্যে রাম সকলের বড়। কৈকেয়ীর চক্রান্তে রাম পিতৃসত্য পালন করতে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে গমন করেন। তাঁর সাথে বনে যান স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষণ।

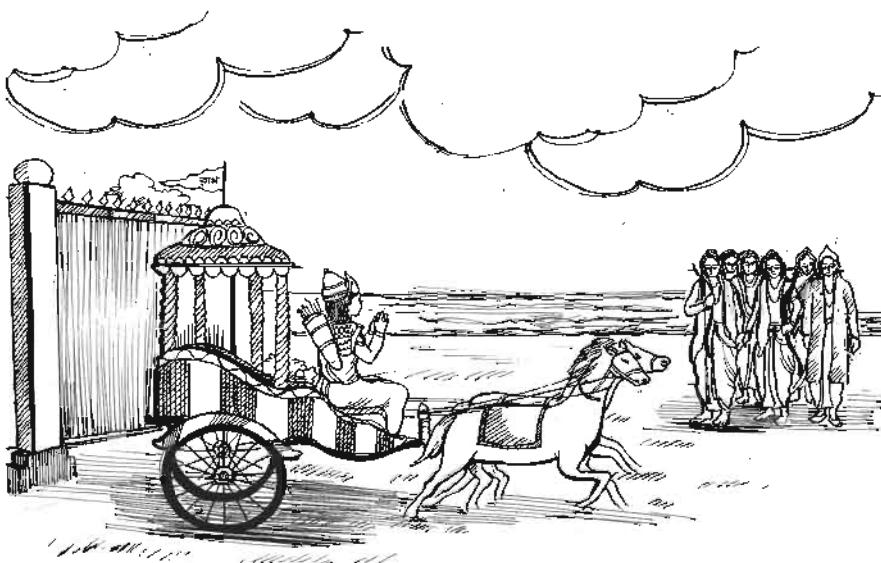
বনবাসকালে রাক্ষস রাজা রাবণ সীতাকে একা পেয়ে হরণ করে লক্ষ্য এনে অশোক বনে বন্দী করে রাখেন। রাম সীতাকে উদ্ধার করতে সাগরে সেতু বন্ধন করে বানর বাহিনী নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে লক্ষণ আক্রমণ করেন। রাবণের ভাই বিভীষণ রাবণকে অনুরোধ করেন রামের সাথে যুদ্ধ না করে সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে সংক্ষি করার জন্য। কিন্তু দুষ্টমতি লক্ষ্যপতি বিভীষণের কথায় কান না দিয়ে তাকে অপমান

করে লঙ্কা থেকে তাড়িয়ে দেন। বিভীষণ রামের আশ্রয়ে চলে আসেন এবং রামের পক্ষে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেন।

রাক্ষস বাহিনীর সাথে রাম-লক্ষণের ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধে রাক্ষসবাহিনীর বড় বড় বীর যোদ্ধারা সব প্রাণ ত্যাগ করল। রাবণের একলক্ষ পুত্র ও সোয়া লক্ষ নাতি ছিল। সকলেই এ যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেছে। সোনার লঙ্কা পরিণত হয়েছে শুশানে। রাবণ বিমর্শ হয়ে রাজসভায় বসে প্রমাদ শুনছেন। এখন কী করা যায়? যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য এমন কেউ নেই যে, যুদ্ধ করে লঙ্কাকে রক্ষা করে।

বিভীষণ লঙ্কাপুরী ত্যাগ করলেও তার স্ত্রী সরমা ও পুত্র তরণীসেন লঙ্কা পুরীতেই অবস্থান করছিলেন। তরণীসেন তখন দ্বাদশ বর্ষীয় বালক। তরণীসেনের কাছে সংবাদ পেল যুদ্ধে রাক্ষসবাহিনীর পরাজয়ের কথা, লঙ্কার বীরদের আত্মত্যাগের কথা। সে তখন রাবণের দরবারে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করে। রাবণ বালক তরণীকে কোনোমতেই এ ভয়কর যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিতে চাইলেন না। কিন্তু তরণীসেন রাবণকে রাজি করিয়ে যুদ্ধে যাত্রা করল।

তরণী ছিল পিতা বিভীষণের মতই ধার্মিক। সে তার রথের ছুঁড়া রামনাম খচিত পতাকায় শোভিত করল। নিজের সারা অঙ্গে রামনাম লিখে নামাবলি গায়ে দিয়ে রথে উঠে বসল। রথ ছুটে চলল যুদ্ধের ময়দানে। রাম তাকিয়ে দেখেন রামনাম খচিত ধন্বাধারী রথের উপর দ্বাদশ বর্ষীয় বালক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। রাবণের এহেন বিবেচনা দেখে রাম বিস্মিত হলেন। তার গায়ে রাম নামের নামাবলি জড়ানো।



তরণী যুদ্ধক্ষেত্রে এসে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে জয়রাম বলে ধ্বনি করে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। অনেক বানর সৈন্য হতাহত হলো। রাম বালক বিবেচনায় এবং তার মুখে রাম নামের ধ্বনি শুবণ করে তার প্রতি বাণ নিক্ষেপ না করে বিভীষণকে বললেন, ‘ওহে মিত্র বিভীষণ! কে এই বালক? সর্বদা মুখে রাম নাম জপ করছে। আমি কি করে এর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করি?’

তখন বিভীষণ তরণীর আসল পরিচয় রামকে বললেন না। বিভীষণ বললেন, ‘এ দুরস্ত রাক্ষস। হে প্রভু রাম, এ রাক্ষসের প্রতি তুমি বৈষ্ণব অন্ত নিষ্কেপ কর। তাহলেই এ রাক্ষসের মৃত্যু হবে।’

রাম ধনুতে বৈষ্ণব অন্ত যোজনা করলেন। তরণীসেনকে লক্ষ্য করে বাণ নিষ্কেপ করলেন রামচন্দ্র। বাণ তরণীর বক্ষে বিন্দু হলো। তরণী ‘জয়রাম, জয়রাম’ বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বিভীষণ তরণীর প্রাণহীন দেহ কোলে তুলে ‘হা পুত্র তরণীসেন’, বলে কেঁদে উঠলেন। এতক্ষণে রাম বুবাতে পারলেন এ বীর বালক আর কেউ নয়, মিত্র বিভীষণের পুত্র তরণীসেন। রাম মিত্র বিভীষণকে ভর্ত্সনা করলেন। শেষে তরণীর মস্তকে হস্ত রেখে রাম তাকে আশীর্বাদ করলেন। তরণী রাক্ষস দেহ পরিত্যাগ করে দিব্যদেহ ধারণ করে বৈকুণ্ঠে চলে গেল।

### উপাখ্যানের শিক্ষা

স্বাধীনতা রক্ষা করতে যার যতটুকু শক্তি আছে, তা প্রয়োগ করা বা কাজে লাগানোর সৎসাহস থাকা বাঞ্ছনীয়। আমরা তরণীসেনের মতো সৎসাহসী হব। দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে কখনো পিছপা হব না।

**দর্শীয় কাজ :** তরণীসেনের আদর্শ সম্পর্কে একটি পোস্টার তৈরি কর।

**নতুন শব্দ :** অযাচক, অলঙ্কার, সৎসাহস, উদ্ধার, পিতৃসত্য, দাদশ, বর্ষীয়, ধনুর্বাণ, বৈষ্ণব, বৈকুণ্ঠ, ভর্ত্সনা, দিব্যদেহ।

### অনুশীলনী

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। রামায়ণে কোন যুগের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে?

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ক. সত্য   | খ. দ্বাপর |
| গ. ব্রেতা | ঘ. কলি    |

২। তোমার পঠিত উপাখ্যানে তরণীসেনের চরিত্রে কোন শৃণ্টি প্রকাশ পেয়েছে?

- i. আত্মত্যাগ
- ii. দেশপ্রেম
- iii. নির্বুদ্ধিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii  | খ. ii ও iii    |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii I iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রামতনু টেলিভিশনের খবরে জানতে পারেন তাদের পার্শ্ববর্তী উপজেলা বন্যাকবলিত। প্রবল স্নোত ও দুর্ঘাগের কারণে উপদ্রুত এলাকার অধিবাসীদের উদ্ধার করা বা সাহায্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বিধায় তারা জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। রামতনু তখনই একটি নোকা নিয়ে তাদের উদ্ধার করতে যায় এবং সাধ্যমত উদ্ধারে ব্রতী হয়।

৩। অনুচ্ছেদে রামতনুর বন্যাকবলিতদের উদ্ধার করার কাজটি হলো -

- i. কর্তব্যনির্ণয়
- ii. জীবসেবা
- iii. সৎসাহস

নিচের কোনটি সঠিক?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i       | খ. iii         |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪। কোন মূল্যবোধটি রামতনুকে বন্যার্থদের উদ্ধার করার কাজটি করতে উত্তুল করে?

- |              |            |
|--------------|------------|
| ক. মানবতাবোধ | খ. দয়া    |
| গ. সহিষ্ণুতা | ঘ. স্ক্রমা |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

পৃথিবীর আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। একদিন পৃথি মায়ের সাথে এক আত্মীয়ের বাড়ি যাবে বলে বের হয়ে পথের ধারে রিক্ষার জন্য অপেক্ষা করছে। এমন সময় এক ভিস্কু এসে ভিস্কা চাইল। পৃথির মা তাকে ভিস্কা দিলেন। তা দেখে আরো কয়েকজন ভিস্কু এগিয়ে এল। সবাইকে ভিস্কা দেওয়ার পর মা দেখলেন তাদের কাছে রিক্ষা ভাড়ার আর কোনো টাকা নেই। তখন তারা পায়ে হেঁটেই আত্মীয়ের বাড়ি পৌঁছালেন। এতে একটু কষ্ট হলেও এবং সময় বেশি লাগলেও তাদের মন মানুষের জন্য কিছু করতে পারার আনন্দে ভরে গেল।

- ক. রাজা রাষ্ট্রবর্মী কোন দেবতার ভক্ত ছিলেন ?
- খ. সকল জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ কেন বুঝিয়ে লেখ ?
- গ. রাষ্ট্রবর্মার আচরণের যে দিকটি পৃথির মায়ের আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. পৃথি ও তার মায়ের অনুভূতি যেন রাষ্ট্রবর্মার অনুভূতিরই প্রতিফলন- বিশ্লেষণ কর।

## ନବୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଧର୍ମପଥ ଓ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ

ଧର୍ମପଥ ହଜେ ନ୍ୟାୟର ପଥ, ସତ୍ୟର ପଥ, ଅହିସୋ ଏବଂ କଳ୍ୟାଣେର ପଥ । ଆମରା କେବେ ଧର୍ମ ପାଲନ କରି, ଦେ ସମ୍ପର୍କେ ବଳା ହୁଯେଛେ: ‘ଆଜ୍ଞାମୋହାୟ ଉଗନ୍ଧିତାୟ ଚ’ ନିଜେର ଚିରମୁକ୍ତି, ଆର ଉଗନ୍ଧର ହିତ ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍ୟାଣସାଧନେର ଜନ୍ୟ । ଜୀବନେର ସେ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଲେ ନିଜେର ମୋହ ବା ଚିରମୁକ୍ତି ଘଟେ ଏବଂ ସକଳେର କଳ୍ୟାଣ ହୁଏ, ଦେ ପଥରୀ ଧର୍ମପଥ ।

ଧର୍ମପଥେର ମଜେ ନୈତିକ ମୂଳ୍ୟବୋଧେର ସଂରକ୍ଷଣ ହୁଯେଛେ । ଯା ନୈତିକ ତା ଧର୍ମ, ଯା ଅନୈତିକ ତା ଅଧର୍ମ । ଯିବେଳେ ଧର୍ମପଥେ ଚଲେନ, ତିନିଇ ଧାର୍ମିକ । ଧାର୍ମିକ ପାନ ବର୍ଗ ଓ ମୋହ । ଅଧାର୍ମିକ ପାନ ନରକ ବୟଙ୍ଗା । ବାରବାର ଜନ୍ୟ, ଜନ୍ୟା ଓ ମୃତ୍ୟୁର କଟ । ଧର୍ମରୀ ଧାର୍ମିକଙ୍କ ରକ୍ତା କରେ ଏବଂ ଧର୍ମରୀ ଜୟ ହୁଏ । ଧର୍ମହାତ୍ମେ ଅନେକ ଉପାଖ୍ୟାନେର ମଧ୍ୟ ଦିର୍ଘେ ଏକଥା ବଳା ହୁଯେଛେ ।



ଧର୍ମ ଅନୁଶୀଳନେର କେତେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନେର ବଲିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ହୁଯେଛେ । ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନେ ସତତା ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅନୁଶୀଳନେର ଉତ୍କଳ ଅପରିସୀମ । ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ଶ୍ରୀକାନ୍ତା ଧର୍ମକ୍ଷଣର ଅନ୍ୟତମ ଉପାୟ ହଜେ ପ୍ରଗମ ଓ ନମକାର । ଆମରା ଜାନି ମାଦକାସତ୍ତ୍ଵ ବା ମାଦକ ଏହଥ ସୁହୁ ଜୀବନେର ପରିପଣ୍ଡା ଏବଂ ଏ ପଥ ଅଧର୍ମର ପଥ । ଧୂମଗ୍ରାନ୍ ଓ ମାଦକପାତାହପେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜେର କ୍ଷତି ହୁଏ । ଧର୍ମପଥେ ଚଲିଲେ ମାଦକାସତ୍ତ୍ଵକେ ପ୍ରତିରୋଧ କରା ସମ୍ଭବ । ଆମରା ଧର୍ମପଥେ ଚଲିବ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ପଥ ପରିହାର କରିବ । ଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉତ୍ସାହିତ ବିଷୟମୁହଁ ସଂକ୍ଷକ୍ଷେପେ ଆଲୋଚନା କରିବ ।

ଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶେଷେ ଆମରା—

- ଧର୍ମପଥେର ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ପାଇବ
- ନୈତିକ ମୂଳ୍ୟବୋଧେର ସାଥେ ଧର୍ମପଥେର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ପାଇବ
- ଧାର୍ମିକଙ୍କ ସରଜପ ବର୍ଣନା କରିବେ ପାଇବ
- ଧାର୍ମିକ ଓ ଅଧାର୍ମିକଙ୍କ ପରିପତି ସମ୍ପର୍କେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ପାଇବ
- ଧର୍ମ ଧାର୍ମିକଙ୍କ ରକ୍ତା କରେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକଙ୍କ ଜନ୍ୟ- ଏକଥାର ଜିଣିତେ ଏକଟି ଧର୍ମୀର ଉପାଖ୍ୟାନ ବର୍ଣନା କରିବେ ପାଇବ
- ଧର୍ମପଥ ଅନୁଶୀଳନେର କେତେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନେର ଭୂମିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ପାଇବ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଏକଟି ଉପାଖ୍ୟାନ ବର୍ଣନା କରିବେ ପାଇବ

- ଶିଷ୍ଟାଚାରେର ଧାରଣା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ
- ଶିଷ୍ଟାଚାରେର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହିସେବେ ପ୍ରଗାମ ଓ ନମକ୍ଷାରେର ଧାରଣା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ
- ମାଦକ ଗ୍ରହଣ ଅଥର୍ଵର ପଥ- ଏ ଧାରଣାଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ
- ଧୂମପାନ ଓ ମାଦକେର କୁଫଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ
- ମାଦକାସଙ୍କି ପ୍ରତିରୋଧେ ପାରିବାରିକ ଧର୍ମୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରତେ ପାରିବ
- ଧର୍ମପଥେ ଚଲତେ ଉଦ୍ବ୍ଲଙ୍ଜ ହବ, ଜୀବନାଚରଣେ ସତତ ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର ପ୍ରଦର୍ଶନେ ଆହୁତୀ ଏବଂ ମାଦକ ପ୍ରତିରୋଧେ ସଚେତନ ହବ ।

### ପାଠ ୧ : ଧର୍ମପଥେର ଧାରଣା

ଧର୍ମପଥ ହଜ୍ଜେ ନ୍ୟାୟେର ପଥ । ସତ୍ୟେର ପଥ, ଅହିଂସା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣେର ପଥ । ଆମରା କେନ ଧର୍ମ ପାଲନ କରି, ସେ ସମ୍ପର୍କେ ବଲା ହେଁଛେ : ‘ଆତ୍ମମୋକ୍ଷାୟ ଜ୍ଞାନିତାୟ ଚ’ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆମରା ଧର୍ମ ପାଲନ କରି ନିଜେର ମୋକ୍ଷଲାଭ ଏବଂ ଜଗତେର କଲ୍ୟାଣେର ଜନ୍ୟ । ଆମରା ଜାନି, ମୋକ୍ଷଲାଭେର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରବାର ଜନ୍ୟଗ୍ରହଣ କରେ ପୃଥିବୀତେ ଆସତେ ହବେ । ଭୋଗ କରତେ ହବେ ଜନ୍ୟ, ଜରା ଓ ମୃତ୍ୟୁର ସନ୍ତ୍ରଣା । ଆର ମୋକ୍ଷଲାଭ କରଲେ ବ୍ରକ୍ଷ ବା ପରମାତ୍ମାର ସଙ୍ଗେ ଜୀବାତ୍ମା ମିଶେ ଯାବେ । ଏକେଇ ବଲେ ବ୍ରକ୍ଷଲଙ୍ଘ ହେୟା । ଏଇଁ ଅପର ନାମ ମୋକ୍ଷଲାଭ ।

ଏ ମୋକ୍ଷଲାଭେର ଜନ୍ୟ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତଭାବେ ସାଧନା କରଲେଇ ଚଲବେ ନା । ତାତେ ମୋକ୍ଷଲାଭ ହବେ ନା । ପାଶାପାଶି ଜୀବନେର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରତେ ହବେ । କାରଣ ଜୀବେର ମଧ୍ୟେ ଆଆରମ୍ଭପେ ଈଶ୍ଵର ବା ପରମାତ୍ମା ଅବସ୍ଥାନ କରେନ । ତାଇ ଜୀବ-ଜଗତେର କଲ୍ୟାଣସାଧନଓ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମାଦର୍ଶେର ଏକଟି ପ୍ରଧାନ ଭିତ୍ତି ।

ସହଜ କଥାଯ, ଯେ ପଥେ ଚଲଲେ ନିଜେର ମୋକ୍ଷଲାଭ ଏବଂ ଜୀବ ଓ ଜଗତେର କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୟ, ସେଇ ପଥି ଧର୍ମପଥ ।

ଧର୍ମେର ଦଶଟି ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ଣଗେର ସଙ୍ଗେଥେ ଆମରା ପରିଚିତ ।

ଧର୍ମେର ଏ ଲକ୍ଷ୍ଣଗୁଲୋ ଅନୁସରଣ କରେ ଜୀବନଯାପନେର ଯେ ପଥ ତାକେଇ ବଲେ ଧର୍ମପଥ ।

### ବେଦ

କୋନଟା ଧର୍ମ ଆର କୋନଟା ଅଧର୍ମ ତା ନିର୍ଣ୍ୟ କରାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରକୃଟ ପ୍ରମାଣ ହଜ୍ଜେ ଋଗ୍ବେଦ, ସାମ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ ଓ ଅର୍ଥବେଦ ।

### ସ୍ମୃତି

ଧର୍ମାଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ୟ ବେଦେର ପରେଇ ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ରେର ସ୍ଥାନ । ବେଦେର ପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ ବା ଅଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ୟେର ଜନ୍ୟ ରାଚିତ ଗ୍ରହାବଲିକେ ବଲା ହୟ ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ର । ମନୁସଂହିତା, ପରାଶର ସଂହିତା, ଯାଜ୍ଞବକ୍ଷ୍ୟ ସଂହିତା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ରେର ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟୋଗ୍ୟ ଗ୍ରହ୍ୟ । ଧର୍ମାଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ୟେ ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ରଗୁଲୋ ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରମାଣ ।

### ସଦାଚାର

କୋନ ବିଷୟେ ବେଦ ଓ ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ବାନ୍ତବସମ୍ମତ ଉପଦେଶ ନା ପାଓଯା ଗେଲେ ମହାପୁରୁଷଦେର ଆଚରଣକେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହିସେବେ ଗ୍ରହଣ କରତେ ହବେ ଏବଂ ସେ ପଥେଇ ଚଲତେ ହବେ । ଆବହମାନ କାଳ ଧରେ ଅନୁସ୍ତ ଓ ମହାପୁରୁଷଦେର ଦ୍ୱାରା ଅନୁଶୀଳିତ ଆଚରଣଟି ସଦାଚାର । ଧର୍ମାଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ୟେ ସଦାଚାର ତୃତୀୟ ପ୍ରମାଣ ।

### বিবেক

অনেক সময় ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে না এবং অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তখন বিবেকের বাণী গ্রহণ করতে হয়। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি নিজের বিবেককেও প্রামাণ্য বলে বিবেচনা করেন। বিবেক কী বলে? যে কাজ ব্যক্তিকে বিপথগামী করে এবং সামষ্টিক অঙ্গসমূহকে আলে, বিবেক সে-কাজকে অধর্ম বলে বিবেচনা করে। কাজেই নিজেকে প্রশংসন করে নির্ণয় করতে হবে: কাজটি করলে ধর্ম হবে, না অধর্ম হবে। নৈতিক মূল্যবোধের বিচারে যা ভালো কাজ তা ধর্মসম্মত এবং যা ভালো কাজ নয়, তা করলে অধর্ম হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নৈতিক মূল্যবোধের সাথে ধর্মপথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে বিচারের মানদণ্ড। আর ধর্ম হচ্ছে সেই বিচারের সিদ্ধান্ত বা ফল।

ব্যক্তি বা সমাজের ক্ষতিকর কাজ ধর্মসম্মত নয়। বিবেক সেখানে বাধা দেবেই।

সুতরাং ধর্মপথ বলতে বোঝায় বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বিচারে ন্যায় ও সত্যের পথ এবং ধৃতি, ক্ষমা, আত্মসংঘর্ষ, অক্রেণ প্রভৃতি নৈতিক শুণাবলির প্রতিফলনমূলক পথ।

**একক কাজ : ধর্মপথ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ ।**

**নতুন শব্দ :** আত্মমোক্ষায়, জগদ্বিতায়, ব্রহ্মলগ্ন, ধর্মপথ, স্মৃতিশাস্ত্র, সদাচার।

### পাঠ ২ : নৈতিক মূল্যবোধের সাথে ধর্মপথের সম্পর্ক

আমরা জানি, কোনটা ভালো কাজ বা কল্যাণকর কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ, অকল্যাণকর কাজ, তা বিচার করার যে বোধ বা বিবেচনা শক্তি, তাকেই বলে নৈতিক মূল্যবোধ। আবার ভালো কাজ করা ধর্ম এবং মন্দ কাজ করা অধর্ম। অন্য কথায়, নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে, যে কাজকে ন্যায় আচরণীয় ও কল্যাণকর মনে করে, তা মেনে চললে ধর্ম হয় এবং যা ভালো কাজ নয়, তা করলে অধর্ম হয়। তাহলে নৈতিক মূল্যবোধের সাথে ধর্মপথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে বিচারের মানদণ্ড। আর ধর্ম হচ্ছে সেই বিচারের সিদ্ধান্ত বা ফল।

এ বিষয়ে একটা উদাহরণ :

পরের দ্রব্য অপহরণ করা বা আত্মসাং করা নৈতিক মূল্যবোধের মানদণ্ডে অন্যায় এবং তা শান্তিযোগ্য অপরাধ। আবার ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে পরের দ্রব্য অপহরণ করা অধর্ম। অধর্ম করলে পাপ হয়। পাপ করলে ইহলোকে শান্তি ভোগ করতে হয় এবং পরলোকে নরক যত্নগ্রাম ভোগ করতে হয়।

নৈতিক মূল্যবোধ আর ধর্মানুমোদিত আচরণ করার অনুশাসনের উদ্দেশ্য একই।

নৈতিক মূল্যবোধ বলে : রাগ করবে না।

ধর্মীয় অনুশাসনও বলে : রাগ করবে না।

নৈতিকতা ধার্মিকের শুণ। যাঁর নৈতিকতা নেই তিনি অধার্মিক।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ ধর্মপথের নির্দেশ দেয়। যিনি সে নির্দেশ মেনে ধর্মপথে চলেন, তিনি ধার্মিক বলে বিবেচিত হন। যিনি তা করেন না, তিনি অধার্মিক বলে গণ্য হন।

**দলীয় কাজ :** দলে আলোচনা করে মূল্যবোধের সাথে ধর্মপথের সম্পর্কের বিষয়ে দশটি  
বাক্য রচনা কর।

নতুন শব্দ : ধর্মসম্মত, মানবিক, অপহরণ, ধর্মানুমোদিত।

### পাঠ ৩ : ধার্মিকের স্বরূপ

ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণ (ধৃতি, ক্ষমা, দয়, ধী, বিদ্যা, অক্রোধ প্রভৃতি) যাঁর মধ্যে প্রকাশ পায় বা যিনি ধর্মের ঐ দশটি লক্ষণ নিজের জীবনে চলার পথে অনুসরণ করেন, তিনিই ধার্মিক। ধার্মিক ব্যক্তি বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের আহ্বানকে প্রামাণ্য বলে মনে করেন। ধার্মিক ব্যক্তি কখনো ধৈর্য হারান না। তিনি ক্ষমতা থাকলেও ক্ষমা করেন। ক্ষমতার দম্পত্তি দ্বারা তিনি পরিচালিত হন না। তিনি সর্বাবস্থায় নিজেকে সংযত করতে পারেন।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো কেবলই পরিষ্কৃত হতে চায়। কাম, ত্রোধ লোভ, মোহ, মদ ও মাত্সর্য যখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, আমরা তখন ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপথগামী হই। কিন্তু যিনি ধার্মিক, তিনি কাম ত্রোধ প্রভৃতি প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারেন। তিনি ইন্দ্রিয়ের ইচ্ছায় চলেন না। বরং ইন্দ্রিয়কেই সংযত করে নিজের ইচ্ছা অনুসারে চালাতে পারেন।

ধার্মিক ব্যক্তি ধীশক্তি সম্পন্ন। তাঁর প্রজ্ঞা তাঁকে মহান করে তোলে। সকল কিছু বিচার করার অন্য শক্তি দান করে। তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী। ধী এবং বিদ্যা তাঁকে চরিত্রে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে ধার্মিক ব্যক্তি সত্যপ্রিয়। তিনি কখনও সত্য থেকে দূরে সরে যান না। ধার্মিক ব্যক্তি সুখে-দুঃখে নিরন্দেহ থাকেন। আনন্দে অতি উদ্বেল হন না, দুঃখে ভেঙ্গে পড়েন না। দান ও দয়া ধার্মিকের দুটি প্রধান নৈতিক গুণ।

হিন্দুধর্মের একটি দার্শনিক প্রত্যয় হচ্ছে : জীবের মধ্যে আত্মার পেঁচাহ বাস করেন। 'জীবঃ প্রক্ষেপ নাপরঃ'—জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। ধার্মিক ব্যক্তি শক্তরাচার্যের এ বাণী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। তিনি গভীর জ্ঞান, নিষ্কাম কর্ম এবং অকূর্ত উন্নত ভগবদ্ভক্তিকে নৈতিক মূল্যবোধে পরিণত করেছেন। ধার্মিক ব্যক্তি বিনয়ী। তিনি নিজেকে তৃণের চেয়েও শীচু মনে করেন। তিনি বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু হন। তিনি সমদর্শী। তাঁর কাছে বর্ণভেদ নেই। জাতিভেদ নেই। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে তিনি সমান বিবেচনা করেন।

ধার্মিক ব্যক্তি ত্যাগের দ্বারা ভোগ করেন। তিনি যোগযুক্ত হয়ে জগতের হিতসাধনে আত্মনিবেদন করেন। জীবপ্রেম বা জীবসেবাকে পরম কর্তব্য বলে বিবেচনা করেন। ধার্মিক ব্যক্তি ধর্মপথ অনুসরণ করে আদর্শ জীবন-যাপন করেন। ধার্মিকের এ জীবনবোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ যাঁর নেই, তিনি অধার্মিক।

একক কাজ : ধার্মিকের পাঁচটি গুণ চিহ্নিত কর।

**নতুন শব্দ :** প্রামাণ্য, দষ্ট, পরিত্বষ্ণ, পারদশী, সমদশী।

### পাঠ ৪ : ধার্মিক ও অধার্মিকের পরিধিতি

ধার্মিক সদা সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি সদানন্দ, সদা হাস্যময়, সদা প্রফুল্ল। প্রাণি তাঁকে অহংকারী করে না, অপ্রাণি তাঁকে বিষণ্ন করে না। তিনি তাঁর কর্মকে দৈশ্বরের কর্ম বলে বিবেচনা করেন এবং সকল কর্মের ফল দৈশ্বরে সমর্পণ করেন। ধার্মিক ব্যক্তি ত্যাগ করে আনন্দ পান। সেবা করে তৃষ্ণ হন। তাঁর কর্ম জ্ঞান দ্বারা পরিস্তৃত এবং ভক্তি দ্বারা বিশোধিত।

ধর্মগ্রন্থে আছে, ধার্মিক ইহলোকে শান্তি পান এবং পরলোকে তাঁর স্বর্গ লাভ হয়। ধার্মিক ধার্মিকতার চরণ অবস্থায় ব্রক্ষ লাভ করেন, তাঁর জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায় এবং ধার্মিক মোক্ষ বা চিরমুক্তি লাভ করেন।

অন্যদিকে অধার্মিক সবসময় অভূষ্ট থাকেন বলে সর্বদাই বিষণ্ন থাকেন। কাম তাঁকে তাড়িত করে, ত্রেষুধ তাঁকে উৎসেজিত করে, লোভ তাঁকে আকর্ষণ করে তাঁর অধঃপতন ঘটায়।

ইহলোকে তিনি কু-কর্মে লিঙ্গ থাকেন। কখনও কখনও কৃত কু-কর্মের জন্য দণ্ডিত হন এবং দণ্ড ভোগ করেন। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে কু-কর্ম থেকে পাপ অর্জিত হয়। পাপ মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনে। পাপী নরকযন্ত্রণা ভোগ করেন। নরকযন্ত্রণা ভোগের পর আবার তাঁকে পৃথিবীতে এসে মানবেতর প্রাণিজনপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। জন্ম-নরকযন্ত্রণা-মৃত্যুর চক্রে তিনি কেবল আবর্তিত হতে থাকেন।

তবে অধর্মের পথ পরিহার করে ধর্মপথে চললে পাপীও পরিশুল্ক হয়ে মুক্তিলাভ করতে পারে। লাভ করতে পারে পরম কর্মণাময় ভগবানের করণ।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, ধর্ম নষ্ট হলে ধর্মহি ধর্মনষ্টকারীকে বিনাশ করে। আর ধর্ম রক্ষিত হলে ধর্মহি ধার্মিককে রক্ষা করেন। ধর্মের জয় হয়। অধর্মের ঘটে পরাজয়। ধার্মিক সাময়িকভাবে কষ্ট পেতে পারেন। কিন্তু পরিণামে ধর্মের জয় হয়। ধার্মিক শান্তি পান। ধর্মগ্রন্থ থেকে ধর্মের জয় সম্পর্কে আমরা একটি উপাখ্যান জানব।

**দলীয় কাজ :** আলোচনা করে ধার্মিক ও অধার্মিকের পরিগতি সম্পর্কে দর্শাই বাক্য রচনা কর।

**নতুন শব্দ :** লীন, সদানন্দ, পরিস্তৃত, বিশোধিত, নরকযন্ত্রণা।

## পাঠ ৫ : উপাখ্যান

### ধর্মের জয়

অনেক অনেককাল আগের কথা । যুগের হিসেবে তখন ছিল সত্যযুগ ।

তখন দৈত্যদের রাজা হিরণ্যকশিপু ।

দৈত্য আর দেবতাদের মধ্যে চিরকালের ঘগড়া । হিরণ্যকশিপুও তার ব্যতিক্রম হবেন কেন?

তিনিও ছিলেন হরিবিদ্বী । কিন্তু দৈত্যকুলে জন্ম নিয়েছিলেন এক হরিভক্ত । তিনি রাজা হিরণ্যকশিপুর পুত্র । নাম প্রহৃদ ।

প্রহৃদকে গুরুর কাছে অন্য বালকদের সাথে পাঠ গ্রহণ করতে পাঠানো হলো । কিন্তু পাঠে মন নেই প্রহৃদের । সেখানে তাঁর হরিভক্ত হৃদয় তৃষ্ণি পাচ্ছে না ।

একদিন রাজা হিরণ্যকশিপু প্রহৃদকে কোলে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন-

- বৎস প্রহৃদ, কোন বস্তু তোমার সবচেয়ে প্রিয় বল তো?

- পার্থিব কোনো জিনিসই আমার প্রিয় নয়, বাবা । নিবিড় বনে গিয়ে শান্ত হৃদয়ে শ্রীহরির আশ্রয় নেয়াতেই আমার আনন্দ ।

অবাক হয়ে গেলেন রাজা হিরণ্যকশিপু । কে তার ছেলের কানে এই হরিনাম দিয়েছে? শিশুদের বুদ্ধি এভাবেই পরের বুদ্ধিতে নষ্ট হয় ।

- প্রহৃদকে আবার গুরুগৃহে পাঠাও, তার সুশিক্ষার জন্য যত্ন নাও— বললেন রাজা ।

কিন্তু শত চেষ্টাতেও প্রহৃদের কোনো পরিবর্তন হলো না । তখন রাজা হিরণ্যকশিপু প্রহৃদকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন । রাজার আদেশ পেয়ে হৃৎকার দিয়ে এগিয়ে এল দৈত্যেরা । ভয়ংকর তাদের চেহারা । হাতে তীক্ষ্ণ শূল । ঘার অগভাগে মৃত্যুর আমন্ত্রণ । বলশালী অসুরেরা বালক প্রহৃদের কুসুমকোমল বক্ষ লক্ষ করে নিক্ষেপ করল শূল । কিন্তু হরিনামে পবিত্র বক্ষে সেই শূল বিদ্ধ হলো না ।



প্রহৃদকে দেয়া হলো বিষমিত্রিত অন্ন । দেয়া হলো হাতির পায়ের নিচে । তাঁকে নিক্ষেপ করা হলো বিষধর সর্পের প্রকোষ্ঠে । সুউচ্চ পর্বত থেকে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলা হলো কল্পলিত মহাসমুদ্রে ।

- কি হলো?- জিজ্ঞেস করলেন রাজা হিরণ্যকশিপু ।

- প্রহৃদকে কোনোভাবেই হত্যা করা যাচ্ছে না, মহারাজ । - বলল ঘাতকেরা ।

মহাত্মার আরজ্ঞচক্ষু হিরণ্যকশিপু প্রহৃদকে বধ করার জন্য ছুটে গেলেন ।

**একক কাজ :** বিষ্ণু ভক্ত প্রহৃদকে তাঁর পিতা শাস্তি দেওয়ার জন্য যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন, তার একটা তালিকা প্রস্তুত কর।

- রে দুর্বিনীত, তুই কার বলে আমার শক্রের পূজা করছিস? উপেক্ষা করছিস আমার আদেশ?
- ধর্মের বলে, বাবা। যাকে তুমি শক্র বলছ তিনি শক্র নন, বাবা। তিনি সকলের বঙ্গ, সকলের প্রাণ, সকলের আশকারী প্রভু। তিনি সর্বত্র আছেন। সর্বত্র থাকেন। সর্বত্র থেকে তিনি আমাকে রক্ষা করেন।
- সর্বত্র থাকেন? - ক্রোধে জলে উঠলেন হিরণ্যকশিপু।
- আছে? এই স্ফটিক স্তম্ভে তোর হরি আছে?
- আছেন, বাবা। - প্রহৃদের বিনীত উত্তর।
- তাই নাকি। - সিংহাসন থেকে উঠে দ্রুতবেগে স্তম্ভের দিকে ধেয়ে গেলেন হিরণ্যকশিপু। মৃষ্টির আঘাত করলেন স্তম্ভের উপরে।

তীব্রণ শব্দ হলো সেই স্তম্ভে।

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রকম্পিত হলো সেই মহাশব্দে। দেবগণ পর্যন্ত ভীত হলেন সেই শব্দ শুনে।

হিরণ্যকশিপু বর পেয়েছিলেন, কোনো দেব, নর, যক্ষ, প্রভৃতি কেউ কোনো অস্ত্র দিয়ে স্বর্গ, মর্ত্য বা পাতালে কোনো স্থানে, দিনে বা রাতে তাঁকে হত্যা করতে পারবে না।

সবাই অবাক হয়ে দেখল, স্ফটিক স্তম্ভ থেকে ভগবান শ্রীহরি বেরিয়ে এলেন নৃসিংহ মূর্তিতে। বসে আছেন তিনি ভাঙা স্তম্ভকেই আসন বানিয়ে। হিরণ্যকশিপু তাঁকে খড়গ দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলেন। তখন নৃসিংহ অবতাররূপী শ্রীহরি হংকার ছেড়ে হিরণ্যকশিপুকে ধরে কোলের উপর ফেলে নখ দিয়ে হত্যা করলেন।

শ্রীহরি প্রহৃদকে দেখা দিলেন। প্রহৃদ তাঁর কাছে থেকে চেয়ে নিল শ্রীহরির প্রতি অবিচল ভক্তি। ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে। ধর্মই প্রহৃদকে রক্ষা করেছিল। ধর্মের জয় অবশ্যস্তাবী।

**একক কাজ : ধর্মের জয় উপাখ্যান থেকে কী শিক্ষা পেলে? লেখ।**

**নতুন শব্দ :** সত্যবুঝ, হিরণ্যকশিপু, দৈত্যকুল, পার্থিব, শূল, প্রকোষ্ঠ, আরঙ্গচক্র, দুর্বিনীত, অবশ্যস্তাবী।

### পাঠ ৬ : ধর্মপথ ও পারিবারিক জীবন

মানুষ পরিবারবন্ধ হয়ে বাস করে। আর আমরা তো জানি পরিবারের সকল সদস্যের স্বার্থ একসূত্রে গাঁথা থাকে। তাই ধর্মপথ অনুসরণ তথা অনুশীলনের ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ପରିବାରେ ବଡ଼ଦେର କାହିଁ ଥେକେ ଛୋଟରା ଆଚାର-ଆଚରଣ ଶେଷେ । ପରିବାରେ ଛୋଟରା ବଡ଼ଦେର ଅନୁସରଣ ଓ ଅନୁକରଣ କରେ । ତାଇ ପରିବାରେ ଧର୍ମପଥ ଅନୁଶୀଳନ-ଅନୁସରଣେର ଚର୍ଚା ଥାକା ଚାଇ । ପରିବାରେ ଯଦି ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କଥାର ଚର୍ଚା ହୁଏ, କେଉ ଯଦି ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନା ନେଇ, ତାହଲେ ସେ ପରିବାରେର କେଉ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ନା ।

ପରିବାରେ ଯଦି ଆତ୍ମସଂସ୍ଥମ ଶେଖାନୋ ହୁଏ, ଲୋଭକେ ଦୟନ କରାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଥାକେ, ତାହଲେ ସେ ପରିବାରେର କେଉ ଲୋଭୀ ହବେ ନା । ସେ ପରିବାରେର ଧର୍ମଦର୍ଶ ‘ରେଗେ ଗେଲେନ ତୋ ହେରେ ଗେଲେନ’- ଏ ଅକ୍ରୋଧେର ଚତୁନା, ସେ ପରିବାରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜ କରବେଇ । ସହମର୍ମିତା ଓ ପରମତସହିକୃତା ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନେର ଏକଟି ଅତି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ନୈତିକ ମୂଳ୍ୟବୋଧ । ଏଇ ଅଭାବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସଂହତି ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ।

ପରିବାରେ କେଉ ଯଦି ନିଜେର ମତ ଅନ୍ୟେର ଓପର ଚାପିଯେ ଦେଇ, ତାହଲେ ପରମତସହିକୃତାର ଆଦର୍ଶ ସେ ପରିବାରେ ଥାକତେ ପାରେ ନା । ଓଇ ପରିବାରେର ସଦସ୍ୟରା ସମାଜେଓ ଗଣତାଙ୍କିକ ମନୋଭାବ ଦେଖାନ ନା । ଅତି ଆଦରେର ଶିଶୁ-କିଶୋର ସଦସ୍ୟରା ମା-ବାବାକେ ନିଜେର ମତ ଅନୁସାରେ କାଜ କରତେ ବାଧ୍ୟ କରେ । ସଖନ ଯା ଚାଇବେ, ତା ଦିତେ ହବେ । ଏ ମାନସିକତା ନିଯେ ସେ ସଖନ ସମାଜ-ଜୀବନେ ଆଚରଣ କରତେ ଯାଇ, ତଥନ ସେ ପରମତସହିକୃତା ତୋ ଦେଖାଯାଇ ନା, ବରଂ ନିଜେର ମତ ଜୋର କରେ ଅନ୍ୟେର ଉପର ଚାପିଯେ ଦେଓଯାର ଚେଷ୍ଟା କରେ । ପରିବାରେ ସଦସ୍ୟରା ସତତା, ସତ୍ୟପ୍ରିୟତା, ପରମତସହିକୃତା ଓ ମାନବତାର ମଣିତ ଧର୍ମପଥ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ପରିବାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାକବେ । ଆର ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଯଦି ଧର୍ମପଥେ ଚଲେ, ତାହଲେ ସମାଜଙ୍କ ଧର୍ମପଥେ ଚଲବେ । ସୁତରାଂ ଧର୍ମପଥ ଅନୁସରଣ-ଅନୁଶୀଳନେର କ୍ଷେତ୍ରେ ପରିବାରେର ଭୂମିକା ଖୁବଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

**ଦଶୀୟ କାଜ :** ଧର୍ମପଥ ଅନୁଶୀଳନେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନେର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କେ ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରେ ଦଶଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ ଏବଂ ଏକଟି ଉଦାହରଣ ଦାଓ ।

**ନୃତ୍ୟ ଶବ୍ଦ :** ପରିବାରବନ୍ଦ, ଏକସୂତ୍ର, ପରମତସହିକୃତା ।

### ପାଠ ୭ : ସତତାଇ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଞ୍ଚା

ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନିଲେ ତାର ଫଳ ଭାଲୋ ହୁଏ ନା । ତାଇ ବଲା ହୁଏ, ‘ସତତାଇ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଞ୍ଚା’ । ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଏକଟି ଉପାଖ୍ୟାନେର ବିବରଣ ଦେବ ।

#### ଗରିବ କାଠୁରିଯାର ସତତା

ଛାଯାସୁନିବିଡ଼ ଛୋଟ ଏକଟି ପ୍ରାମେ । ପ୍ରାମେର ପାଶେ ବନ । ବନ ଆର ପ୍ରାମେର ପାଶ ଦିଯେ ବୟେ ଚଲେଛେ ଛୋଟ ଏକଟା ନଦୀ । ଐ ପ୍ରାମେ ବାସ କରିବିଲେ ଏକ ଗରିବ କାଠୁରିଯା । ପ୍ରାମେର ପାଶେର ବନ ଥେକେ କାଠ କେଟେ ବିକ୍ରି କରେ ସଂସାର ଚାଲାତେଲେ ତିନି ।

ଏକଦିନ ତିନି ବନେ କାଠ କାଟିଲେ ଗେହେନ । ସେ ଗାହେର ଡାଲଟା ତିନି କୁଠାର ଦିଯେ କାଟିଛିଲେ, ସେଟା ନଦୀର ଓପର ଦିଯେ ନଦୀର ଦିକେ ଅନେକଟା ଏଗିଯେ ଗିଯେଛିଲେ ।

ଗାହେର ଡାଲଟା କାଟାର ସମୟ ହଠାତ୍ ଏକ ଅସ୍ଟନ ଘଟିଲ । କାଠୁରିଯାର ଅସତର୍କତାଯ ତାର କୁଠାରଟା ପଡ଼େ ଗେଲ ନଦୀତେ । ସବେ ଖାବାର ନେଇ । କାଠ କେଟେ ବିକ୍ରି କରିବେନ, ତାରପର ଚାଲ-ଡାଲ ସବ କିନିବେନ, ତବେ ପରିବାରେର ସବାଇ ମିଳେ ଥାବେନ ।

এখন যে সবাই মিলে উপোস করে থাকতে হবে! মনের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন তিনি ।

কার্তুরিয়ার দুঃখে জলদেবতার দয়া হলো । তিনি নদীর ভেতর থেকে উপরে উঠে এলেন । শরীরের অর্ধেকটা জলে, অর্ধেকটা জলের উপরে ।

- শোন কার্তুরিয়া ।

ডাক শুনে নদীর দিকে তাকাতেই কার্তুরিয়া দেখেন, জলদেবতা তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে । মিটিমিটি হাসছেন । তাঁর হাতে রয়েছে একটি সোনার কুঠার ।

জলদেবতা কার্তুরিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন,

- এ কুঠারটাই তো তোমার, তাই না?

কার্তুরিয়া জলদেবতার হাতের কুঠারের দিকে তাকালেন । রোদের আলোয় ঝকমক করছে সোনার কুঠার । এ কুঠারটি তাঁর নিজের বলে নিয়ে নিতে পারেন তিনি । তাতে তাঁর দারিদ্র্য-দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে । সোনালি সুখের আলোতে ভরে উঠবে তাঁদের জীবন, তাঁদের সংসার । কিন্তু তাতে ধর্ম নষ্ট হবে । অসৎ হয়ে যাবেন তিনি । এক মুহূর্তে সবটা ভেবে নিয়ে কার্তুরিয়া মাথা নেড়ে জলদেবতাকে জানালেন,

- ওটা আমার কুঠার নয় ।

- ‘তাই নাকি?’- হেসে বললেন জলদেবতা ।

- একটু অপেক্ষা করো আমি আসছি ।

জলদেবতা আবার ডুব দিলেন নদীর জলে । জল থেকে উঠে এসে এবার তিনি কার্তুরিয়াকে একটা রূপার কুঠার দেখালেন । এবারও কার্তুরিয়া জানালেন, এই কুঠারটিও তাঁর নয় ।

জলদেবতা কার্তুরিয়াকে অপেক্ষা করতে বলে আবার নদীর জলে ডুব দিলেন । এবার তিনি নিয়ে এলেন কার্তুরিয়ার নিজের লোহার কুঠার । কার্তুরিয়া সেই লোহার কুটারটি দেখে বলে উঠলেন,

- হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো আমার কুঠার ।

জলদেবতা মুঘ্ল হলেন দরিদ্র কার্তুরিয়ার সততায় ।

তিনি কার্তুরিয়াকে সোনা ও রূপার কুঠার দুটিও দিয়ে দিলেন ।

কার্তুরিয়ার দারিদ্র্য দূর হলো । তাঁকে আর অতো কষ্ট করে কাঠ কাটতে হয় না । কুঁড়েঘরের জায়গায় দালান উঠল । বেশ কিছু জমিও কিনলেন তিনি ।

তাই না দেখে গায়ের মোড়ল অবাক হয়ে গেলেন ।  
কেমন করে এত তাঢ়াতাঢ়ি দরিদ্র কার্তুরিয়া ধনী হয়ে গেল!

মোড়ল এলেন কার্তুরিয়ার বাড়ি ।



କାର୍ତ୍ତୁରିଆର କାହେ ସବ ଶୁଣଲେନ ।

- ‘ଓ, ତାହଲେ ଏଇ କଥା! ଜଳଦେବତାର କୃପାୟ ଧନୀ! ଆଜଛା ।’- ମନେ ମନେ ବଗଲେନ ତିନି ।

ଏଥନ ଯେ ସବାଇ ଘିଲେ ଉପୋସ କରେ ଥାକତେ ହବେ! ମନେର ଦୂଃଖେ କାନ୍ଦତେ ଲାଗଲେନ ତିନି ।

ତାରପର ଇଚ୍ଛେ କରେ ହାତେର ଲୋହାର କୁଠାର ନଦୀତେ ଫେଲେ ଦିଯେ ହାଉମ୍‌ଆଟ କରେ କାନ୍ଦତେ ଲାଗଲେନ ।

ଜଳଦେବତା ଉଠେ ଏଲେନ ଏକଟି ସୋନାର କୁଠାର ନିଯେ ।

- ଏଇ କୁଠାର କି ତୋମାର?

ଲୋଭେ ଚକଚକ କରେ ଉଠିଲ ମୋଡ଼ଲେର ଚୋଥ ।

ତିନି ବ୍ୟଥକଟେ ବଲେ ଉଠିଲେନ,

- ହଁ, ହଁ, ଏଟାଇ ଆମାର କୁଠାର ।

ଜଳଦେବତା ଧୂବ ରେଗେ ଗେଲେନ । ତିନି ସୋନାର କୁଠାର ନିଯେ ଧୂବ ଦିଲେନ ନଦୀର ଭେତରେ ।

ଅନେକକଷଣ ହୁଯେ ଗେଲ ।

ଜଳଦେବତା ଆର ଉଠିଲେନ ନା ।

ମୋଡ଼ଲ ବିରସ ବଦନେ, ବିଷଗ୍ନ ମନେ ଫିରେ ଗେଲେନ ତାଙ୍କ ଗୀଯେ ।

ମିଥ୍ୟାଚାର ନୟ । ସତତାଇ ଉଠକୁଟ୍ଟ ପଥା । ଏ-କଥା ଆମରା ମନେ ରାଖବ ଏବଂ ଜୀବନେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରେ ସତତାର ପରିଚୟ ଦେବ ।

**ଏକକ କାଜ : କାର୍ତ୍ତୁରିଆର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହଲୋ କିଭାବେ? ବୋର୍ଡ୍ ଲେଖ ।**

ନତୁନ ଶବ୍ଦ : ଛାଯାସୁନିବିଡ଼, ଉପୋସ, ଜଳଦେବତା, ବ୍ୟଥକଟେ ।

### ପାଠ ୮ : ଶିଷ୍ଟାଚାର

#### ଶିଷ୍ଟାଚାରେର ଧାରଣା

ସତତାର ମତୋ ଶିଷ୍ଟାଚାରର ଆଦର୍ଶ ଜୀବନେର ଅଞ୍ଚ । ଆମାଦେର ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅପରିହାର୍ୟ । ନ୍ତର, ଭଦ୍ର ବା ଶିଷ୍ଟ ଆଚାରକେ ବଲେ ଶିଷ୍ଟାଚାର । ଶିଷ୍ଟାଚାର ମନୁଷ୍ୟତ୍ଵର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ । ଏ ଶିଷ୍ଟାଚାରେର ଜଳ୍ୟାଓ ମାନୁଷ ପଣ୍ଡ-ପାଞ୍ଚି ଥେକେ ଆଲାଦା ।

ଧର୍ମପଥେ ଚଲାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅନ୍ୟତମ ପାଥେୟ । ପ୍ରଥମେ ପରିବାରେର କଥାଇ ଧରା ଯାକ ।

ମାତା, ପିତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁରୁଜନକେ ଆମରା ପ୍ରଣାମ ଜାନାଇ । ଏଇ ପ୍ରଣାମ ଜାନାନୋର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଯେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇ, ତାର ନାମ ଭକ୍ତି ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ।

୨୦ ଆବାର ସମ୍ବଲପୀଦୀର ଶୁଭେଜ୍ଞା ଜାନାଇ ଏବଂ ଛୋଟଦେର ମେହ କରି । ସବାଇ ଶିଷ୍ଟାଚାରେର ରକମଫେର ।

ইন্দ্র আয়াদের সৃষ্টি করেছেন। সেবদেবীরা আয়াদের নিজ নিজ শক্তি বা কণ দিয়ে সহায়তা করেন।

তাই আমরা তাঁদের জ্ঞব-শক্তি করি, প্রশামনজ্ঞ উচ্চারণ করে তাঁদের প্রশাম জানাই। তাই ধর্মীচারের মধ্য দিয়েও শিষ্টাচার প্রকাশ পায়। শিষ্টাচার একটি লৈতিক মূল্যবোধ এবং ধর্মের অঙ্গ।

শিষ্টাচার বা তত্ত্ব ব্যবহারের বারা আমরা ঘানুষের মন জয় করতে পারি। সমাজজীবনে চলার পথে শিষ্টাচার একটি প্রয়োজনীয় কণ বা লৈতিক মূল্যবোধ।

কারণ সঙ্গে দেখা হলে আমরা খড়জ্য বিনিময় করি। আমরা বড়দের প্রশাম করি বা নমস্কার জানাই। সমবয়সীদের অভ্যন্তরে জানাই এবং ছোটদের আশীর্বাদ করি। একেরে প্রথাগত শিষ্টাচার হচ্ছে, বরদে থেকে, সে প্রশাম বা নমস্কার জানাবে। বড়রা কল্পাণ হোক, দীর্ঘজীবী হও ইত্যাদি বলে আশীর্বাদ করবেন। এটাই গ্রীতি।

#### প্রশাম বা নমস্কারের ধারণা

প্রশাম বলতে বোবায় প্রকৃষ্টদৃশ্যে নমন বা নমস্কার। হরিচরণ বক্ষ্যাপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় ‘শৰ্মকোব’ অব্রে উল্লেখ করেছেন, প্রশাম চার একান্ত:

১. অতিবাদন
২. পরামৃশ দাণ্ডাম
৩. অঠার প্রশাম
৪. নমস্কার

#### অতিবাদন

বাক্য দ্বারা ‘প্রশাম করি’ বলে আনন্দ হওয়াকে অতিবাদন বলা হয়। অনেক সময় বাক্য উচ্চারণ না করে কেবল আনন্দ হওয়েও অতিবাদন জানানো হয়।

#### পরামৃশ প্রশাম

‘তত্ত্বসার’ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে—

বাহ্যবয়, জ্ঞানবয়, মনুক, বক্তৃতা ও দর্শনেন্দ্রিয় রোগে অবলম্বন করে প্রশাম করা হয় তাকে পরামৃশ প্রশাম বলে।



#### অঠার প্রশাম

জ্ঞান, পদ, হস্ত, বক্তৃতা, বুদ্ধি, শির, বাক্য ও মৃত্তি প্রশামের এ আটটি অঙ্গ। এ আটটি অঙ্গ ব্যবহার করে প্রশাম করলে তাকে অঠার বা সাঁওত প্রশাম বলে।

### ନମକାର

ନମକାର ପ୍ରଗାମେର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ । ତବେ ଏଥାଲେ ନମକାର ହଚ୍ଛେ ହାତ ଜୋଡ଼ କରେ ମାଥାଯ ଠେକାନୋ । ନମକାର ତିଳ ପ୍ରକାର । ସଥା- କାୟିକ, ବାଚିକ ଓ ମାନସିକ ।

ନମକାରେର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ନୃସିଂହ ପୁରାଣେ ବଜା ହେଯେଛେ-

‘ନମକାରଃ ଶୂତୋ ଯଜ୍ଞଃ ସର୍ବୟଜ୍ଞେସୁ ଚୋତ୍ତମଃ ।

ନମକାରେଣ ଚୈକେନ ନରଃ ପୁତୋ ହରିଂ ବ୍ରଜେ ॥’

ଅର୍ଥାତ୍ ନମକାର ସକଳ ଯଜ୍ଞର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଥାନ । ଏକମାତ୍ର ନମକାର ହାରା ମାନବ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଁ ହରିକେ ଲାଭ କରେ ।

**ଏକକ କାଙ୍ଗ :** ପ୍ରଗାମ କତ ପ୍ରକାର ଓ କୀ କୀ? ଲେଖ

ଆମରା ପୂଜା କରାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଗାମମତ୍ତ୍ଵ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଦେବ-ଦେବୀଦେର ପ୍ରଗାମ ଜାନାଇ । ଶୁରୁଜନଦେର ପ୍ରଗାମ କରି ଏବଂ ନମକାର ଜାନାଇ ।

ସାଧୁ-ସଜ୍ଜନ-ବୈଷ୍ଣବ-ଭକ୍ତରୀ ସବାଇକେ ପ୍ରଗାମ ବା ନମକାର କରେନ । ଏର ମଧ୍ୟେ ଏକଟି ଧର୍ମଦର୍ଶନ ରହେଛେ । ଆସଲେ ଆମରା ପ୍ରଗାମ ବା ନମକାର କରାଇ କାକେ?

ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଚ୍ଛେ- ଜୀବେର ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମାରୂପେ ବ୍ରଜ ବା ଦୈଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥାନ କରେନ, ସେଇ ବ୍ରଜକେ ପ୍ରଗାମ ବା ନମକାର କରାଇ ।

ଏ ଧର୍ମଦର୍ଶନେର କାରଣେ ସକଳେଇ ପ୍ରଗମ୍ୟ । ସୁତରାଂ ଶିଷ୍ଟାଚାରେର ଅଙ୍ଗରୂପେ ପ୍ରଗାମ ବା ନମକାରେର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ତାତ୍ପର୍ୟ ରହେଛେ ।

**ନୃତ୍ୟ :** ଶିଷ୍ଟାଚାର, ଅପରିହାର୍ୟ, ବାହୁ, ଜାନୁ, ଶିର, ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ନୃସିଂହପୁରାଣ ।

### ପାଠ ୯ : ମାଦକ ଗ୍ରହଣ ଅଧର୍ମେର ପଥ

ଆମରା ଜାନି ମାଦକ ଗ୍ରହଣ ବା ମାଦକାସଙ୍କି ଅନୈତିକ ଏବଂ ଅଧର୍ମେର ପଥ । କାରଣ ମାଦକାସଙ୍କି ମାଦକ ଗ୍ରହଣକାରୀର ସାଭାବିକ ଚେତନାକେ ବିମୃଢ଼ କରେ ଦେଇ । ତିନି ଆର ପ୍ରକୃତିଶ୍ଵର ଥାକେନ ନା, ସୁଷ୍ଠୁ ଥାକେନ ନା । ଆର ଅସୁଷ୍ଠ ଦେହ ଓ ମନେ ତିନି ଯେ ଆଚରଣ କରେନ, ତାତେ ଅନୈତିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ।

ଧୂମପାନ, ମଦ, ଗୋଜା, ଆଫିମ, ହେରୋଇନ, କୋଡ଼ିଲ (ଫେନ୍‌ସିଡ଼ିଲ) ଇତ୍ୟାଦି ମାଦକ । ଏଗୁଲୋ ଗ୍ରହଣ କରା ଏକବାର ଶୁରୁ ହେଲେ ତା ନେଶାଯ ପରିଣତ ହୁଏ ଆର ସହଜେ ଛାଡ଼ା ଯାଇ ନା । ମାଦକାସଙ୍କ ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ନା ପେଲେ ଅଛିର ହେଁ ଓଠେନ । ତାର ଆଚରଣ କଥନେ କଥନେ ହେଁ ଓଠେ ଧର୍ମସାମ୍ଭକ ।

### ଧୂମପାନ ଓ ମାଦକାସଙ୍କିର କୁକୁଳ

ଧୂମପାନ ଓ ମାଦକାସଙ୍କି ଦୈହିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷତି ସାଧନ କରେ । ଧୂମପାନେର ଫଳେ ନାନାବିଧ ରୋଗ ହୁଏ । ସେମନ- ନିଉମୋନିଆ, ବ୍ରଙ୍କାଇଟିସ, ଯଙ୍ଗା, ଫୁସଫୁସେର କ୍ୟାପାର, ଗ୍ୟାସିଟିକ ଆଲସାର, କ୍ଷୁଧାମାନ୍ୟ, ହୁଦରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି । ତା ଛାଡ଼ା ଧୂମପାନ ଶୁଦ୍ଧ ଧୂମପାନୀରେ କ୍ଷତି କରେ ନା, ଅନ୍ୟଦେଇରେ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୁଏ ।

মাদকগ্রহণেও নানা প্রকার অসুখ হয় এবং মাদকাসক্তি স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে দূরে সরে যান। মাদকগ্রহণে মানসিক ক্ষতি হয়। মাদকাসক্তি অবস্থায় বিবেকবৃদ্ধি লোপ পায়। মাদকাসক্তির চৈতন্য পর্যন্ত লোপ পেতে পারে। মাদকাসক্তি ব্যক্তির মনস্ত্বিক্তি পর্যন্ত ঘটতে পারে। মাদকদ্রব্য ক্রয় করার জন্য অর্থ যোগাড় করতে গিয়ে মাদকাসক্তি অসৎ উপায় অবশ্যম্ভব করতেও দ্বিধা করে না। মাদকাসক্তির কারণে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন পর্যন্ত শিথিল হয়ে যায়।



### মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতির গুরুত্ব

পরিবারই সমাজের প্রথম স্তর। পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ গোটা পরিবারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। পরিবারের সকল সদস্যকে এ বিষয়ে উদ্বৃদ্ধ করতে হবে যে আমাদের দেহে আত্মার পেত্র অবস্থান করছেন। সুতরাং এ দেহ ব্রহ্ম বা সৈক্ষণ্যের মন্দির। তাকে কোনোভাবেই অপবিত্র করা চলবে না। দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্ম অনুসারে মাদকাসক্তি ঘোরতর পাপ সমূহের অন্যতম। কেবল মাদকাসক্তি পাপী নন, ঘাঁরা তাঁর সঙ্গ করেন, তাঁরাও পাপী। কারণ মাদকাসক্তির পাপ তাঁদেরও স্পর্শ করে।

মাদকাসক্তিকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনাও একটি পারিবারিক কর্তব্য। সন্তানদের গড়ে তোলা পিতা-মাতার ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। তাই লক্ষ রাখা প্রয়োজন সন্তানেরা কেমন করে তাদের দৈনন্দিন জীবনটা অতিবাহিত করছে।

সন্তানদের কেবল শাসন নয়, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্বৃদ্ধ করতে হবে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে। আমরা ধর্মীয় কল্যাণ চেতনায় উদ্বৃদ্ধ হয়ে মহত্তর সাধনায় লিঙ্গ থাকব।

পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবন হবে পবিত্রাতার আলোকে উদ্ভাসিত। তবে পারিবারিক শিক্ষা দিতে হবে কেবল শাসনের আকারে নয়, দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে- ‘আপনি আচারি ধর্ম জীবেরে শিখায়’।

পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে আমরা এমন শিক্ষা পেতে চাই, যা পরিবারের সকল সদস্যকে ধূমপান ও মাদকগ্রহণের মতো অনৈতিক কাজ থেকে দূরে রাখে। পরিবারের সবাই যেন অঙ্গীকার করে-

‘ধূমপান মাদকগ্রহণ অধর্মের পথ।

চালাব না সে পাপপথে আমার জীবনরথ।’

**নতুন শব্দ :** অতিবাহিত, মহত্তর, উদ্ভাসিত, জীবনরথ।

**বাড়ির কাজ :**

১. নিজের জীবন থেকে শিষ্টাচার প্রদর্শনের ঘটনা লিখে এনে শিক্ষকের কাছে জমা দেবে ।
২. ‘ধূমপান ও মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা’- শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করে এনে শিক্ষকের কাছে জমা দেবে ।

**অনুশীলনী****বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :****১। হিরণ্যকশিগু রাজা ছিলেন-**

- ক. দৈত্যদের                      খ. দেবতাদের  
 গ. পশুদের                          ঘ. মানবকুলের

**২। মানুষকে কেন নরক যন্ত্রণা ভোগের পর মানবেতর আণীরূপে জন্মাফসু করতে হয় ?**

- ক. পাপ ক্ষয় হয় বলে  
 খ. পাপ নিঃশেষ হয় না বলে  
 গ. পুণ্য সংখয় করার জন্য  
 ঘ. পৃথিবীকে ভালোবাসার কারণে

**উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

রোদেলা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ছবি একে শিক্ষককে দেখাবে বলে বেঝের উপর রাখল। শিশু হাতের ধাক্কায় ‘ওয়াটার পট’ উল্টে দিলে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। পরের দিন সে আবার একে আনলে শিশু এবারও তা নষ্ট করার চেষ্টা করে। রোদেলা শিশুকে এমন আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে সে আঁকতে পারছে না। একথা শুনে রোদেলা তাকে আঁকতে সাহায্য করে।

**৩। রোদেলার প্রতি শিশুর হিংসাত্মক আচরণের কারণ হলো -**

- i. অসহায়তা
- ii. অপারগতা
- iii. ইনস্মল্যতা

**নিচের কোনটি সঠিক?**

- ক. i ও ii                              খ. ii  
 গ. ii ও iii                            ঘ. i, ii ও iii

৪। শিথার দুর্ভৰ্মের অভিবাদ না করার মধ্য দিয়ে রোদেলার কোন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে ?

- |          |                |
|----------|----------------|
| ক. ক্ষমা | খ. বিদ্যানূরাগ |
| গ. হিংসা | ঘ. অনীহা       |

**সৃজনশীল প্রশ্ন :**

১। দিব্যেন্দু ইতিহাসের অধ্যাপক। সকালে পূজাহিক করে তিনি কর্মস্থলে বের হন। তিনি প্রতিদিন পশুপাখিদের খাবার দেন এবং দরিদ্র অসহায়দের প্রচুর দান-ধ্যান করেন। দিব্যেন্দু বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা এবং গ্রন্থ রচনা করেন। সত্য ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক সময় তিনি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনও সত্য প্রচারে বিমুখ হন না এবং তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করা না হলেও ভেঙে পড়েন না। এ সকল কারণে তিনি প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হন।

- ক. যাজ্ঞবক্ষ্যসংহিতা কোন শাস্ত্রের অঙ্গরূপ ?
- খ. জীবঃ ব্রহ্মের নাপরঃ - শ্লোকটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ ।
- গ. দিব্যেন্দুর আচরণিক মূল্যবোধের মাধ্যমে সমাজ ও পরিবার কীভাবে উপকৃত হতে পারে তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর ।
- ঘ. দিব্যেন্দুর দৃষ্টান্ত প্রয়াণ করে যে, ‘সৎকর্ম কখনও বিফলে যায় না’ – পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে মূল্যায়ন কর ।

২। রিদিমা প্রতিদিন পূজা করার সময় প্রণাম মন্ত্র পাঠ করে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানায়। পূজা শেষে বাবা-মাকে প্রণাম করে দিনের কাজ শুরু করে। গুরুজনদের প্রতিও সে শ্রদ্ধাশীল। সে কখনও কারো সাথে অসদাচরণ করে না এবং ছোট ভাইবোনদেরকেও অত্যন্ত আদর-যত্ন করে। তাই সে পরিবার ও প্রতিবেশীসহ সকলের কাছেই প্রিয়। মানুষের প্রতি রিদিমার এ আচরণ সমাজের মানুষের মূল্যবোধকে প্রভাবিত করেছে।

- ক. তত্ত্বসার কী ?
- খ. আমরা দেবতাদের স্তব-স্তুতি করি কেন ?
- গ. বর্ণিত অনুচ্ছেদে রিদিমার চরিত্রে কোন শিক্ষার প্রতিফলন প্রতিভাব হয়েছে তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর ।
- ঘ. রিদিমার দৃষ্টান্তই স্মরণ করিয়ে দেয় যে সমাজে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম’- কথাটি মূল্যায়ন কর ।

## দশম অধ্যায়

### অবতার ও আদর্শ জীবনচরিত

অবতরণ করেন যিনি তিনিই অবতার। তবে ধর্মশাস্ত্র যে কাউকেই অবতার বলা হয়নি। ভগবান বিষ্ণু যখন জগতের কল্যাপের জন্য বিভিন্ন রূপে বৈকৃষ্ণ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাঁকে বলা হয় অবতার। কাজ শেষ হলে তিনি আবার স্বজ্ঞানে ফিরে যান। বিষ্ণু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সে-সবের মধ্যে মৎস্যাদি দশ অবতার বিখ্যাত। এ সম্পর্কে আমরা নিচের ক্লাসে জেনেছি। এ অধ্যায়ে আমরা অবতারের ধরন এবং শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে আবির্ভাবের কারণ জানতে পারব।

অবতার ছাড়াও যুগে-যুগে এখন কিছু শিক্ষার্থী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা আজীবন মানুষের কল্যাপ করে গেছেন। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে কোনো চাপড়া-পাপড়া ছিল না। অকাতরে তাঁরা মানব কল্যাপে জীবন উৎসর্গ করেছেন। সে-সব মহাপূরুষ ও মহীয়সী নারীদের জীবনই আমাদের নিকট আদর্শ জীবনচরিত। নিচের ক্লাসে আমরা বেশ করেকজন মহাপূরুষ ও মহীয়সী নারীর জীবনী পড়েছি। এখানে আমরা আরো করেকজনের জীবনী পড়ব এবং তাঁদের জীবনী থেকে অনেক কিছু শিখতে পারব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- শিক্ষার্থী অবতারের ধারণা ও এর ধরন (পূর্ণাবতার ও অংশাবতার) ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অবতাররূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চিকিৎসা বিজ্ঞানে চৱক ও সুস্থিতের অবদান বর্ণনা করতে পারব।
- ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবন পঠনে শ্রীশঙ্করাচার্যের মতাদর্শ ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবন পঠনে মীরাবাঈ, প্রভু নিত্যানন্দ ও শ্রীমার মতাদর্শ শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।



- ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবন গঠনে শ্রীরামকৃষ্ণের মতাদর্শ শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবন গঠনে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতাদর্শ ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ।

### পাঠ ১ : অবতার

আগেই বলা হয়েছে, ভগবান বিষ্ণু যখন বিভিন্ন রূপ ধরে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাঁকে বলা হয় অবতার । অবতাররূপে তিনি জগতের কল্যাণ করেন । পৃথিবী সব সময় এক রকম থাকে না । পৃথিবীতে নানা সময়ে নানা দুষ্ট লোকের জন্ম হয় । তারা মানুষের প্রতি অত্যাচার করে । এতে জগতে শোক, দুঃখ, কষ্ট ও অশান্তির সৃষ্টি হয় । শিষ্টদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে । এমনি সময়েই ভগবান বিষ্ণু অবতাররূপে আবির্ভূত হন । দুষ্টদের বিনাশ করেন । জগতে আবার শান্তি ফিরে আসে । ভগবানও তাঁর স্বষ্টানে ফিরে যান ।

ভগবান বিষ্ণু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জীবের রূপ ধরে অবতরণ করেন । তিনি যখন মানুষরূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি মানুষের মতোই আচরণ করেন । মানুষের মতোই মাতৃগতে জন্ম নেন । মানুষের মতোই সুখ-দুঃখ ভোগ করেন । তবে তার মধ্য দিয়েও তাঁর কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকে । যেহেতু তিনি ভগবান । ভগবান ও মানুষ কখনো এক হতে পারে না ।

#### অবতারের ধরন

অবতার দুই রকমের – পূর্ণাবতার ও অংশাবতার । ভগবান যখন পূর্ণরূপে অবতরণ করেন, তখন তাঁকে বলা হয় পূর্ণাবতার । ভগবানের সমস্ত শক্তি ও শুণ পূর্ণাবতারের মধ্যে থাকে । শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবানের পূর্ণাবতার । কারণ ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে ছিল ।

ভগবানের অপূর্ণাঙ্গের অবতারকে বলা হয় অংশাবতার । অংশাবতারে ভগবানের সমস্ত শক্তি ও শুণ থাকে না । অংশাবতার অনেক । তার মধ্যে দশটি প্রধান, যেমন- মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কঙ্কি । এঁরা বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়ে জগতের কল্যাণ সাধন করেছেন । ভগবানের অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণ কেন আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে-কথা তিনি নিজেই শ্রীমত্তগবদ্ধীতায় বলেছেন:

যদা যদা হি ধর্মস্য প্রানির্বতি ভারত ।  
অজ্ঞাথানমধর্মস্য তদাআনন্দ সৃজাম্যহম্ ॥  
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দৃক্ষতাম্ ।  
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুষ্টামি যুগে যুগে ॥ (৪/৭-৮)

হে অর্জুন, জগতে যখন ধর্মের প্লানি দেখা দেয় এবং অধর্মের উত্থান ঘটে, তখনই আমি নিজেকে সৃজন করি । সজ্জনদের রক্ষার জন্য, দুর্জনদের বিনাশের জন্য এবং ধর্মকে সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি আবির্ভূত হই । অর্থাৎ অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করি ।

শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন তখন কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুর্যোধন খুবই অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন । এদের অত্যাচারে মানুষের খুব কষ্ট হচ্ছিল । শ্রীকৃষ্ণ এদের বিনাশ করে শান্তি স্থাপন করেন ।

ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନ୍ୟାୟପରାଯଣତାର ଶିକ୍ଷା ଦିଯ়েছେନ । ଦୁଷ୍ଟେର କାହେ ତିନି ଭୟକ୍ଷର, ସଞ୍ଜନେର କାହେ ଶାନ୍ତିର ସୌମ୍ୟ କାନ୍ତିଧାରୀ, ଭକ୍ତେର କାହେ ଭଗବାନ ।

### ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଚାରିତ

#### ପାଠ ୨ : ସୁଧ୍ରତ

ସୁଧ୍ରତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତେର ଏକଜନ ମହାନ ଚିକିତ୍ସକ ଛିଲେନ । ତା'ର ପିତାର ନାମ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁଣି ।

ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏକଦିନ ଘର୍ତ୍ତବୀକେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରହିତ ଦେଖେ ଦେବବୈଦ୍ୟ ଧ୍ୟାନକୁ କଥାମତୋ କଥାମତୀ କାଶିରାଜେର ପୁତ୍ରଙ୍କାପେ ଦିବୋଦାସ ନାମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ଏ-କଥା ଜାନତେ ପେରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଶୀଘ୍ର ପୁତ୍ର ସୁଧ୍ରତକେ ତା'ର ନିକଟ ପାଠାନ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶିକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ । ସୁଧ୍ରତ ଦିବୋଦାସେର ନିକଟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶିଖେ ଚିକିତ୍ସା ସଂକ୍ରନ୍ତ ଏକଥାନା ଗ୍ରହଣ କରେନ । ତା'ର ନାମ ଅନୁମାରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନୁମାର ହେଉଥିବା ନାମ ହ୍ୟ 'ସୁଧ୍ରତ' ବା 'ସୁଧ୍ରତସଂହିତା' ।

ଆଧୁନିକ ଗବେଷକଦେର ମତେ ସୁଧ୍ରତ ଖ୍ରିଷ୍ଟପୂର୍ବ ୬୦୦ ଅବେଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଲେନ । ତିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରାଣସୀ ନଗରେ ଗଜାର ତୀରେ ବାସ କରତେନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚା କରତେନ । ତିନି ପ୍ରଧାନତ ଶଲ୍ୟବିଦ୍ୟାର ଚର୍ଚା କରତେନ । ଏଜନ୍ୟ ତା'କେ ବଲା ହ୍ୟ 'ଭାରତୀୟ ଶଲ୍ୟବିଦ୍ୟାର ଜନକ' । ତିନି ତା'ର ଗ୍ରହଣ ଶଲ୍ୟବିଦ୍ୟାର ୩୦୦ ଥକାର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ୧୨୦ଟି ଅନ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଯେଛେ । ପାଞ୍ଚାଙ୍ଗେ ଏଇ ଅନ୍ତର୍ଗୁଲୋର ଆଧୁନିକାଯନ କରା ହେଯେ ।

ସୁଧ୍ରତସଂହିତା ପ୍ରଧାନତ ଚାରଟି ଭାଗେ ବିଭକ୍ତ - ସୂତ୍ରାହାନ, ଶାରୀରାହାନ, ଚିକିତ୍ସିତାହାନ ଏବଂ କଲାହାନ । ଏତେ ଆୟୁର୍ବେଦେର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଶଲ୍ୟତତ୍ତ୍ଵ, ରସାୟନତତ୍ତ୍ଵ, ପୀଡ଼ା, ଔଷଧ, ଅଚ୍ଛି, ଚିକିତ୍ସା, ରୋଗେର ଲକ୍ଷଣ, ପଥ୍ୟାପଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ବିଭାଗିତାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଯେ । ଆୟୁର୍ବେଦମତେ ଚିକିତ୍ସା କରତେ ହେଲେ ସୁଧ୍ରତସଂହିତାଯ ବିଶେଷ ଜାନ ଥାକିତେ ହ୍ୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଜଗତେ ଏଇ ବିଶେଷ ଶୁରୁତ୍ୱ ରହେଛେ । ତାଇ ଚିକିତ୍ସାଶାସ୍ତ୍ରେ ବ୍ୟୁତ୍ୱପତ୍ତି ଲାଭ କରତେ ହେଲେ ସୁଧ୍ରତସଂହିତାଯ ବିଶେଷ ଜାନ ଲାଭ କରା ପର୍ଯ୍ୟୋଜନ । ସୁଧ୍ରତସଂହିତା ରଚନା କରେ ସୁଧ୍ରତ ମାନବ ଜାତିର ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରେଛେ ।

#### ପାଠ ୩ : ଚରକ

ଚରକ ଛିଲେନ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତେର ଏକଜନ ମହାନ ଚିକିତ୍ସକ । ତା'କେ 'ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସାଶାସ୍ତ୍ରେର ଜନକ' ବଲା ହ୍ୟ । ତା'ର ସମ୍ପର୍କେ ଶାନ୍ତରେ ବଲା ହେଯେ ଯେ, ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାବତାରଙ୍କାପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହନ, ତଥନ ଅନ୍ତଦେବ ଅର୍ଥବୈଦ୍ୟେର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଲାଭ କରେନ । ଏରପର ତିନି ମାନୁଷେର ଅବହ୍ଳାଷ ଦେଖାର ଜନ୍ୟ ପୃଥିବୀତେ ଆଗମନ କରେନ । ଦେଖେ, ଅନେକେଇ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରହିତ ହ୍ୟେ ବେଦନାୟ କାତର । ତା ଦେଖେ ତିନି ଭୀଷଣ କଟ୍ ପାନ । ତାଇ ମାନୁଷେର କଟ୍ ଦୂର କରାର ଜନ୍ୟ ତିନି ଏକଜନ ମୁନିପୁତ୍ରଙ୍କାପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ଚରକଙ୍କ ପୃଥିବୀତେ ଆବିର୍ଭୂତ ହନ ବଲେ ତା'ର ନାମ ହ୍ୟ ଚରକ । ଆଧୁନିକ ଗବେଷକଦେର ମତେ ଚରକ ଖ୍ରିଷ୍ଟପୂର୍ବ ୩୦୦ ଅବେଳା ଆବିର୍ଭୂତ ହନ ।

ଚରକ ମାନୁଷେର ଚିକିତ୍ସା ଶୁରୁ କରେନ । ଅନ୍ତଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ ତିନି ଏକଜନ ସୁଚିକିତ୍ସକ ହିସେବେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରେନ । ତା'ର ପୂର୍ବେ ଆତ୍ମ୍ୟ, ଅଧିବେଶ ପ୍ରମୁଖ ଆରୋ ଚିକିତ୍ସକ ଛିଲେନ । ତା'ର ବୈଦ୍ୟକ ବା ଚିକିତ୍ସା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏକଥାନା ନୂନ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ତା'ର

ନାମ ‘ଚରକସଂହିତା’ । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସାଶାସ୍ତ୍ରେ ଏହି ଏକଖାନା ବିଧ୍ୟାତ ଗ୍ରହ୍ୟ । ଗ୍ରହ୍ୟ ଆଟିଟି ଭାଗେ ବିଭିନ୍ନ - ସୂତ୍ରାଙ୍କାନ, ନିଦାନାଙ୍କାନ, ବିମାନାଙ୍କାନ, ଶାରୀରାଙ୍କାନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଙ୍କାନ, ଚିକିତ୍ସାଙ୍କାନ ଓ ସିଦ୍ଧିଙ୍କାନ ।

ଚରକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମାନବ ଦେହର ପରିପାକ, ବିପାକ ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କେ ବଲେନ । ତିନି ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ଜନ୍ୟ ତିନଟି ‘ଦୋଷ’ ବା ଉପାଦାନେର କଥା ବଲେଛେନ । ମେଘଲୋ ହଲୋ - ବାତ, ପିଣ୍ଡ ଓ କର୍ଷ । ଏହି ତିନଟିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହଲେ ଶରୀର ଅସୁଖ ହୁଯ । ଆର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଫିରେ ଏଲେ ଶରୀର ସୁଖ ହୁଯ । ଚରକ ଏ-ଓ ବଲେଛେନ - ରୋଗେର ଚକିତସାର ଚେଯେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କରା ବେଶି ଜରାଣି । ତିନି ରୋଗୀର ଚକିତସାର ପୂର୍ବେ ରୋଗେର କାରଣସମ୍ମହୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କେ ସଥାର୍ଥରୂପେ ଭାବତେ ବଲେଛେନ ।

ଚରକ ପ୍ରଜନନ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କେ ଜାନତେନ । ଏମନକି ଶିଶୁ ନିର୍ଗୟେର କାରଣସମ୍ମହୁ ତିନି ଜାନତେନ । ମାନବ ଦେହର ଅଙ୍ଗ-ପ୍ରତ୍ୟେଙ୍କ ସମ୍ପର୍କେ ତାଁର ଧାରଣା ଛିଲ । ତିନି ମାନବ ଦେହେ ଦାଁତସହ ୩୬୦ଟି ଅନ୍ତିର କଥା ବଲେଛେନ । ହର୍ଷପିଣ୍ଡକେ ବଲେଛେନ ଦେହର ନିୟମଗୁଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର । ୧୩ଟି ପଥେ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଶରୀରର ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେଓ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାଯ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେର ଶୁରୁତ୍ ଅନେକ । ଚରକସଂହିତା ରଚନା କରେ ଚରକ ସମ୍ପର୍କ ମାନବ ଜାତିର ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରେଛେ ।

ସୁପ୍ରତ୍ସଂହିତା ଏବଂ ଚରକସଂହିତା ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟେ ୭୫୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେ ଖଲିଫା ଆବବାସୀର ସମୟ ଆରବି ଭାଷାଯ ଅନୁଦିତ ହୁଯ ଏବଂ ଏର ମାଧ୍ୟମେ ଇଉରୋପେ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଯ । ଏର ଫଳେ ଇଉରୋପେର ଅନେକ ଚିକିତ୍ସକ ଭାରତବର୍ଷେ ଏମେ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସାବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେନ ।

#### ପାଠ ୪ ଓ ୫ : ଶ୍ରୀଶକ୍ରାଚାର୍ୟ

ଦାଙ୍ଗିଳାତ୍ୟେର କେରଳ ରାଜ୍ୟ କାଲାଡି ନାମେ ଏକ ଗ୍ରାମ । ଏହି ଗ୍ରାମେ ୭୮୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେର ବୈଶାଖୀ ଶୁକ୍ଳା ପଦ୍ମମୀ ତିଥିତେ ଶକ୍ରାଚାର୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ତାଁର ପିତାର ନାମ ଶିବଗୁରୁ ଏବଂ ମାତାର ନାମ ବିଶିଷ୍ଟା ଦେବୀ । ଶିବଗୁରୁ ଛିଲେନ ଏକଜ୍ଞ ଶାନ୍ତିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଶିବଭକ୍ତ ।

ଶକ୍ରରେର ଛିଲ ଅସାଧାରଣ ମେଧା ଓ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି । ତା ଦେଖେ ପିତା ଶିବଗୁରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ଵିତ ହନ । ତିନି ତିନ ବହୁ ବୟସ ଥେବେଇ ପୁତ୍ରକେ ପଡ଼ାତେ ଶୁରୁ କରେନ । ତାଁର ଏକାଙ୍ଗ ବାସନା, ପୁତ୍ରକେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ସୁପାପ୍ତି କରେ ତୁଳବେନ । କିନ୍ତୁ କିଛୁ ଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ ତାଁର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଯ । ତାରପର ପ୍ରାଚୀ ବହୁ ବୟସେ ବିଶିଷ୍ଟା ଦେବୀ ଛେଲେର ଉପନୟନ ଦେଲେ । ଉପନୟନରେ ପର ଶାନ୍ତିଶିକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ତାଁକେ ଶୁରୁଗୁହେ ପାଠାନେ ହୁଯ । ମେଧାନେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ବହୁରେର ମଧ୍ୟେ ଶକ୍ରର ବେଦ, ବେଦାଙ୍ଗ, ସ୍ମୃତି, ପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତି ଶାସ୍ତ୍ରେ ପାଞ୍ଚିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରେନ । ସାତ ବହୁ ବୟସେ ବାଡି ଫିରେ ଆସେନ । ବାଡି ଫିରେ ତିନି ଏକଟି ଟୋଲ ଖୁଲେ ଛାତ୍ର ପଡ଼ାତେ ଶୁରୁ କରେନ । ହାଲୀଯ ପଣ୍ଡିତରା ପ୍ରଥମେ ତୁଚ୍ଛ-ତାଚିଲ୍ୟ କରତେ ଶାଗଲେନ । ସାତ ବହୁରେର ବାଲକ କୀ ପଡ଼ାବେ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଶକ୍ରରେର ପାଞ୍ଚିତ୍ୟର ପରିଚୟ ପେଯେ ସବାଇ ତାଁର ନିକଟ ମାଥା ନତ କରେନ ।

ଶକ୍ରରେର ପାଞ୍ଚିତ୍ୟର ଖ୍ୟାତି ଚାରଦିକେ ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ । ଏକ ସମୟ କେରଳେର ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରେର କାଳେଓ ଯାଯ ଏ-କଥା । ତିନି ଅତ୍ୱାକେ ପାଠାନ ଶକ୍ରରକେ ରାଜସଭାଯ ନିଯେ ଯେତେ । କିନ୍ତୁ ଶକ୍ରର ବିନ୍ଦୟେର ସଙ୍ଗେ ବଲେନ, ତିନି ବିଦ୍ୟା ବିତରଣ କରବେନ । ବାଲକ ଶକ୍ରରେର ଏହି ତେଜୋଦୃଷ୍ଟ କଥା ଶୁଣେ ରାଜା ବିଶ୍ଵିତ ହନ । ତିନି ନିଜେ ଚଲେ ଆସେନ ଶକ୍ରରେର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରତେ । ତାଁର ସଙ୍ଗେ

কথা বলে রাজা তাঁর পাণ্ডিতের গভীরতা বুঝতে পারেন। তাই রাজা হয়েও এই অসাধারণ বালক পতিতকে প্রশংস করে তিনি সহস্র বর্ণমূল্য দান করেন। কিন্তু শকর তাঁর একটিও স্পর্শ করেন নি। সব দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দি঱্বেছেন।

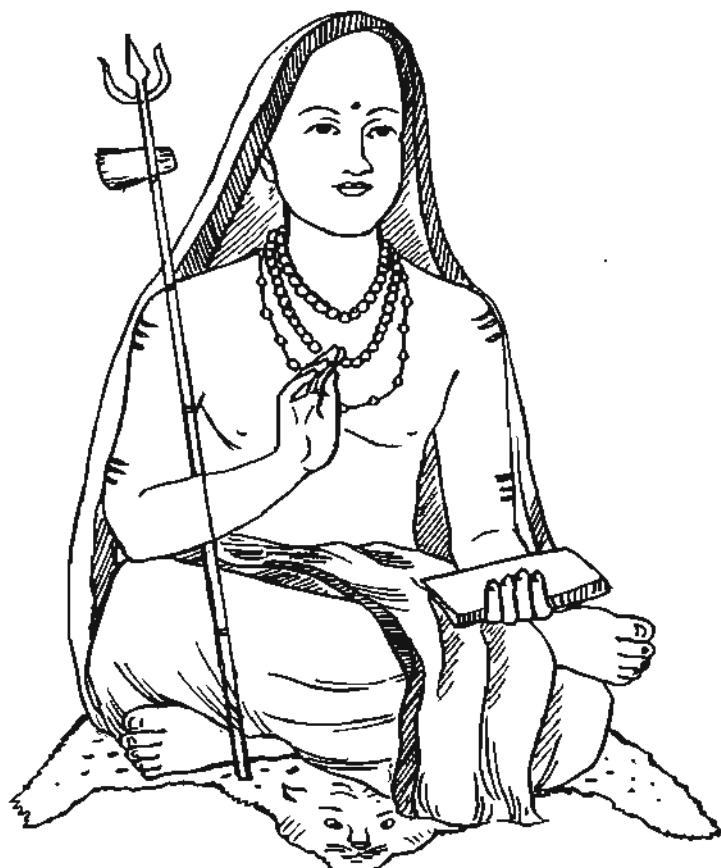
শকরের পাণ্ডিতের কথা শনে একদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণ পতিত তাঁর বাড়িতে আসেন। তাঁরা শকরের সঙ্গে বিত্তন্ধৰ্ম শাস্ত্রালাপ করে অত্যন্ত মুক্ষ হন। এক পর্যায়ে মা বিশিষ্টা দেবী পতিতদের অনুরোধ করেন শকরের কোষ্ঠী দেখতে। পতিতরা কোষ্ঠী দেখে বলেন, শকরের আয়ু খুবই কম। খোল অধিবা বত্রিশ বছরে তাঁর মৃত্যুর ঘোগ আছে। এ-কথা শনে বিশিষ্টা দেবী কানায় স্তোত্র পড়েন। তাঁর একমাত্র অবশ্যন শকরকে এত অঞ্চল বয়সে হারাতে হবে।

শকরও এ-কথা শনলেন। তিনি মাকে খুব ভালোবাসতেন। টোলের ছাত্রদের পড়ানোর অবসরে যে সময়টুকু পেতেন, তখন তিনি কেবল মায়ের সেবা করতেন। কিন্তু মৃত্যুর কথা শনে তাঁর ভেতরে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। জীবন ও অগ্রহ সম্পর্কে তিনি নতুন করে ভাবতে শাগলেন। তিনি ভাবলেন, মোক্ষলাভই মানুষের চরম লক্ষ্য। তাই ব্রহ্ম-সাধনায় তিনি বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন।

একদিন শকর মাকে তাঁর মনের কথা খুলে বলেন। কিন্তু মা কিছুতেই রাজি হন না। অবশেষে শকর অনেক বুঝিয়ে মাকে রাজি করালেন।

তিনি এ-ও বললেন, যেখানেই  
থাকেন-না-কেন, মায়ের অস্তিম  
সময়ে তিনি পাশে উপস্থিত  
থাকবেন। এই বলে শকর একদিন  
গৃহত্যাগ করেন।

শকর সন্ধ্যাস নেবেন। তাই শকর  
সক্ষান্ত করছেন। দুই শাস  
ক্রমাগত পথ চলতে চলতে তিনি  
উপস্থিত হন ওকারনাথের  
দীপশিলে। সেখানে দেখা গান  
মহাযোগী গোবিন্দগামের। তাঁর  
নিকট তিনি সন্ধ্যাস ধর্মে দীক্ষা  
নেন। তিনি বছর শকর কাছে  
থেকে তিনি যোগসিকি ও  
তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত করেন। তাঁরপর  
শকর নির্দেশে চলে যান  
হিমালয়ের নিম্নত ধার বদরিকা  
আশ্রমে। সেখানে তিনি  
বৈদান্তভাব্য প্রভৃতি শুনে রচনায়



মনোনিবেশ করেন। যোল বছর বয়সের মধ্যেই তিনি শুরুর নির্দেশিত গ্রন্থ রচনার কাজ শেষ করেন। এর পর ধর্মগুরু হিসেবে শুরু হয় শক্তরের নতুন জীবন। তাঁর অনেক শিষ্যও জুটে যায়। তিনি তখন আচার্য নামে খ্যাত। শক্তরাচার্য। বদরিকাশ্ম থেকে তিনি পুণ্যধাম বারাণসীতে আসেন। সেখানে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। তাঁর ধর্মের মূল কথা ‘অদৈতবাদ’। তিনি বলেন, ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জীব ও ব্রহ্মে কোনো পার্থক্য নেই।’

শক্তরের এই মতবাদ প্রথমে অনেকেই মানতে চান নি। কিন্তু তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও বাগীভূতার কাছে সবাই হার মানেন। তাঁর মতবাদ মেনে নেন। তিনি একে একে কুমারিল ভট্ট, মণি মিশ্র প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতদের শাস্ত্র বিচারে পরাজিত করেন।

শক্তর তাঁর মতবাদ প্রচারের জন্য সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ান। তিনি ভারতবর্ষের চার প্রান্তে চারাটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বারকায় সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্ধন মঠ, জ্যোতির্ধামে (বদরিকাশ্মে) যোশী মঠ এবং রামেশ্বরে শৃঙ্গেরী মঠ। এই মঠ পরিচালনার জন্য তাঁর চারজন শিষ্যকে দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, তোটকাচার্য ও হন্তামলকাচার্য। শক্তরাচার্য বিভিন্ন দলীয় সম্ম্যাসীদের এই সব মঠে নিয়ে আসেন এবং তাঁদের শৃঙ্গলাবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন। এটা তাঁর একটি উজ্জ্বল কৌশিকি।

শক্তরাচার্য যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবন যেমন বিপর্যস্ত ছিল, ধর্মীয় জীবনও তেমনি বিপর্যস্ত ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে নানা কুসংস্কার ঢুকে পড়েছিল। হিন্দুধর্মও স্নান হয়ে পড়েছিল। সমাজে বেদের কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞের প্রাধান্য বেড়ে গিয়েছিল। শক্তরাচার্য তাঁর অদৈতমত প্রচার করে হিন্দুধর্মের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনেন। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কেনো পার্থক্য নেই – একথা বলে তিনি মানুষের প্রতি মানুষের, এমনকি জীবের প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে জাগিয়ে তোলেন। এর ফলে জীবহিংসা কমে যায়। এটা শক্তরাচার্যের একটা বড় অবদান। শুধু তা-ই নয়, তিনি যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও বেদান্তভাষ্য রচনা করেছেন তা হিন্দু ধর্ম ও দর্শন চৰ্চার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ অবদান। এছাড়া তিনি সাধারণ মানুষের জন্য মোহম্মদগর, আনন্দলহরী, শিবস্তুব, গোল্দাটিক প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করে গেছেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে এত অসাধারণ কাজ করে আচার্য শক্তর উন্নরাখণ্ডের কেদারনাথে ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁর আগে অবশ্য তিনি মায়ের অস্তিম শয্যায় উপস্থিত ছিলেন, যেহেতু তিনি মাকে কথা দিয়েছিলেন।

শক্তরাচার্যের মোহম্মদগর কাব্য থেকে কয়েকটি শ্লোকের বাংলা অনুবাদ নিচে দেয়া হলো:

১. কে তব কান্তা আৱ কে তব কুমাৱ?

অতীব বিচিত্ৰ এই মায়াৱ সংসাৱ।

কোথা হতে আসিয়াছ, তুমি বা কাহাৱ,

ভাৱ কৰহ ভাই, এই তন্ত্ৰ সার।

২. পঞ্চপত্ৰে বারিবিন্দু যেমন চঞ্চল,

জীবন তেমন হয় অতীব চপল।

ଜାଲିଓ କରେଛେ ଗ୍ରାସ ବ୍ୟାଧି ବିଷଧର,  
ସମ୍ମତ ସଂସାର ତାହି ଶୋକେ ଜୁରାଜର ।

୩. ଦିବସ ଯାଦିନୀ ଆର ସାଯାହୁ ପ୍ରଭାତ,  
ଶିଶିର ବସନ୍ତ ପୁନଃ କରେ ଯାତାଯାତ ।  
ଏହି ରୂପେ ଖେଳେ କାଳ କ୍ଷୟ ପାଯ ଆୟ,  
ତଥାପି ଯାନବ ନାହିଁ ଛାଡ଼େ ଆଶା-ବାୟ ।

୪. ଯତଦିନ କରେ ନର ଧନ ଉପାର୍ଜନ,  
ତତଦିନ ଥାକେ ବଶେ ନିଜ ପରିଜନ ।  
ପରେ ସବେ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଯ ଦେହ,  
ଡେକେଓ ଜିଙ୍ଗାସା ସବେ ନାହିଁ କରେ କେହ ।

### ପାଠ ୬ ଓ ୭ : ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ

୧୪୭୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେ ଭାରତେର ପଞ୍ଚମବଦେର ବୀରଭୂମ ଜେଲାର ଏକଚକ୍ରା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜନ୍ମପଥ କରେନ । ତାଁର ପିତାର ନାମ ହାଡ଼ାଇ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ମାତାର ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ । ହାଡ଼ାଇ ପଣ୍ଡିତ ଛିଲେନ ଏକଜନ ସଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ପୈତୃକ ବିଷୟ-ସମ୍ପଦି ଏବଂ ଯଜନ-ସାଜନେର କାଜ ମିଳିଯେ ତାଁର ସଂସାରଟି ଛିଲ ବେଶ ସର୍ବଳ୍ଲଭ ।

ନିତ୍ୟାନନ୍ଦେର ଅକୃତ ନାମ ଛିଲ କୁବେର । ଆମେର ପାଠଶାଲାଯ ପିତା ତାଁର ବାଲ୍ୟଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେନ । ଛାତ୍ର ହିସେବେ ତିନି ମେଧାବୀ ଛିଲେନ । କିନ୍ତୁ ପଡ଼ାଶୋନାଯ ତାଁର ଏକଦମ ମନ ଛିଲ ନା । ତାର ଚେଯେ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ତାଁର ଅନୁରାଗ ଛିଲ ବେଶ । ଧର୍ମକଥା ଶୁଣିତେ ତିନି ଖୁବ ଭାଲୋବାସନ୍ତେନ । ପାଡ଼ାର ଛେଲେଦେର ମଜେ ତିନି ଖେଳାଖୁଲା କରନ୍ତେନ ବଟେ, ତବେ ଖେଳାର ପରିବର୍ତ୍ତେ କୋଳୋ  
ମନ୍ଦିରେ ଗିଯେ ବସେ ଥାକିତେ ତାଁର ବେଶ ଭାଲୋ  
ଲାଗିଥାଏ । ତାଁର ଏହି ଧର୍ମାନୁରାଗେର ମୂଳେ ଛିଲେନ  
ତଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ । କୁବେର ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେର  
କଥାଇ ଭାବନେ । କୀଭାବେ ତାଁକେ ପାଓଯା  
ଯାଏ - ଏହି ଛିଲ ତାଁର ସାରାକଷେତ୍ରର ଭାବନା ।  
କୋଳୋ ସାଧୁ- ସନ୍ଧ୍ୟାସୀକେ ଦେଖିଲେଇ ତିନି  
ତାଁକେ ଜିଜ୍ଞେସ କରନ୍ତେ କୀ କରଲେ  
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକେ ପାଓଯା ଯାବେ ।

କୁବେରେର ବୟବ ତଥବା ବାରୋ ବହର । ଏକଦି  
ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ଏଲେମ ତାଁଦେର ଗୌମେ । ଉଠିଲେନ  
ତାଁଦେଇ ବାଢ଼ି । ତିନି ବୃଦ୍ଧାବନେ ଯାବେନ ।  
କୁବେର ଶୁନେହେନ ବୃଦ୍ଧାବନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର  
ଲୀଲାକ୍ଷେତ୍ର । ତାହି ତିନି ଭାବନେନ, ବୃଦ୍ଧାବନ  
ଫର୍ମା-୧୭, ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଓ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା-୯ମ-୧୦୯



গেলে হয়তো তাঁর প্রাণের ঠাকুর কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে। কুবের সন্ন্যাসীকে তাঁর মনের কথা বললেন। সন্ন্যাসী বললেন, ‘এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস নেয়া ঠিক নয়। তাছাড়া সন্ন্যাস নিতে হলে পিতা-মাতার সম্মতি লাগে।’

কিন্তু কুবের নাছোড়বান্দা। তিনি বৃন্দাবনে যাবেনই। অগত্যা পিতা-মাতার সম্মতি নিয়ে তিনি সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করলেন। অনেক অরণ্য, পাহাড়-পর্বত, তীর্থস্থান ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বছরের পর বছর কেটে গেল। হঠাতে একদিন কুবের সন্ন্যাসীকে হারিয়ে ফেললেন। তারপর তিনি একাই বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন করতে লাগলেন। এভাবে একদিন উপস্থিত হলেন তাঁর কাঞ্চিত বৃন্দাবনে। এখানে এসে কৃষ্ণদর্শনের জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি পাগলের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

একদিন তাঁর সাক্ষাৎ হয় পরম সন্ন্যাসী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে। তাঁর কাছে তিনি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নেন। শুরুর সঙ্গে কিছুদিন বৃন্দাবনে থেকে কুবের আবার বেরিয়ে পড়েন তীর্থ পর্যটনে। একা একা বেশ কিছুদিন ঘুরে বেড়ান। এ সময় তিনি রামেশ্বর, নীলাচল, গঙ্গাসাগর প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। কিন্তু কৃষ্ণবিরহের ব্যাকুলতা তাঁর ক্রমশই বাঢ়তে থাকে। তাঁর একটাই চিন্তা – কৃষ্ণদর্শন কীভাবে হবে। তাই তিনি আবার বৃন্দাবনে ফিরে এলেন।

কুবের সর্বদা কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর থাকেন। কীভাবে কখন কৃষ্ণদর্শন হবে – এই তাঁর একমাত্র ভাবনা। এই ভাবনায় তাঁর দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিল। হঠাতে একদিন তিনি কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখেন। কৃষ্ণ তাঁকে বলছেন, ‘তুমি গৌড় দেশে নবদ্বীপে যাও। সেখানে নিমাই পঙ্কতি আচ্ছালে প্রেমভক্তি প্রচার করছেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দাও।’ উল্লেখ্য যে, এই নিমাই পঙ্কতই শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীচৈতন্য নামে পরিচিত।

এভাবে স্বপ্নে কৃষ্ণদর্শন হওয়ায় কুবেরের মন অনেকটা শাস্ত হয়। স্বপ্নে হলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেছেন। তাই তাঁর আদেশে তিনি বৃন্দাবন ছেড়ে নবদ্বীপের পথে রওনা হলেন। নবদ্বীপে নদন আচার্যের গৃহে নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দুজন দুজনকে চিনতে পারেন, বুবতে পারেন। তাঁরা দূয়ে মিলে যেন এক। জীবোন্ধারের জন্য যেন দুই দেহে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে। সেদিন থেকে কুবেরের নতুন নাম হলো নিত্যানন্দ। সংক্ষেপে নিতাই। আর গৌরাঙ্গের সংক্ষিপ্ত নাম গৌর। ভজ্জরা সংক্ষেপে বলতেন গৌর-নিতাই।

গৌর-নিতাই দুজনে নবদ্বীপে প্রেমভক্তি প্রচার করতে লাগলেন। নেচে-গেয়ে তাঁরা হরিনাম বিলাতে লাগলেন। তাঁদের প্রেমধর্মে কোনো জাতিভেদ নেই। উচু-নীচু নেই। তখন সমাজে শুক্ষ ধর্মাচরণ প্রবল হয়ে উঠেছিল। মানবপ্রেম তার নীচে চাপা পড়েছিল। তাই প্রেমভক্তি দিয়ে গৌর-নিতাই সমাজের সবাইকে কাছে টেনে নিলেন। ফলে দলে-দলে লোক তাঁদের অনুসারী হলো।

কিন্তু বৈষ্ণববিদ্বেষীরা গৌর-নিতাইয়ের এই প্রেমধর্ম প্রচারে বাধা দিতে লাগলেন। কখনো কখনো তাঁদের ওপর আক্রমণও চালান।

ତଥନ ନବଦୀପେ ଜୁଗନ୍ନାଥ ଓ ମାଧ୍ୟମ ନାମେ ଦୁଇ ଭାଇ ନଗର କୋତୋଯାଲେର କାଜ କରତେନ । ଲୋକେ ତାଁଦେର ବଳତ ଜଗାଇ-ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଭୟକ୍ଷର ପ୍ରକୃତିର । ସଖନ ଯା ଖୁଶି ତା-ଇ କରତେନ । କେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରତେ ସାହସ କରତ ନା । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଏ-କଥା ଜାନତେ ପାରିଲେନ । ତିନି ଶ୍ରୀଗୌରାଙ୍ଗକେ ବଲଲେନ, ‘ଜଗାଇ-ମାଧ୍ୟମକେ ଉନ୍ଧାର କରତେ ହବେ ।’ ପ୍ରଭୁ ମୌଳ ସମ୍ମତି ଦିଲେନ ।

ତାରପର ଏକଦିନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଓ ହରିଦାସ କୃଷ୍ଣନାମ କରତେ କରତେ ପଥ ଦିଯେ ଫିରଛେନ । ହଠାତ୍ ଜଗାଇ-ମାଧ୍ୟମରେ ସଙ୍ଗେ ତାଁଦେର ଦେଖା । ମଦ ଖେଯେ ତଥନ ତାଁରା ମାତାଲ । କୃଷ୍ଣନାମ ଶୁଣେ ତାଁରା କ୍ରୋଧେ ଫେଟେ ପଡ଼ିଲେନ । ମାଧ୍ୟମ ଏକଟା ଭାଙ୍ଗା କଲସିର କାନ୍ଦା ଛୁଡ଼େ ମାରିଲେନ ନିତାଇରେ ଦିକେ । ମାଥାଯ ଲେଗେ କେଟେ ଗେଲ । ଦରଦର କରେ ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିତେ ଲାଗଲ । କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଏକ ହାତେ କ୍ଷତକ୍ଷାନ ଚେପେ ଧରେ କୃଷ୍ଣନାମ ଗେଯେଇ ଚଲିଲେନ । ଏତେ ମାଧ୍ୟମ ଆରୋ କ୍ଷେପେ ଗିଯେ ଆବାର ନିତାଇକେ ମାରତେ ଗେଲେନ । କିନ୍ତୁ ଜଗାଇ ତାଁକେ ଆଟକାଲେନ । ଇତିମଧ୍ୟେ କରେକଜଳ ପଥଚାରୀ ସେଥାନେ ଜଡ଼ ହେଁଲେନ । ନିତାଇରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ତାଁଦେର ମାରା ହଲୋ । କିନ୍ତୁ ଜଗାଇ-ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ୟେ କେଉଁ କୋନୋ କଥା ବଲଇ ନା ।

ଘଟନାଟି ଶ୍ରୀଗୌରାଙ୍ଗର କାନେଓ ଗେଲ । ସଙ୍ଗେ-ସଙ୍ଗେ ତିନି ଦଲ-ବଲ ନିଯେ ଛୁଟେ ଏଲେନ ଘଟନାହୁଲେ । ତାଁର ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ବୀଧ ଭେଦେ ଗେଛେ । ଜଗାଇ-ମାଧ୍ୟମକେ ତିନି କଠୋର ଦଣ ଦେବେନ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତଥନ ଏଗିଯେ ଏସେ ବଲଲେନ, ‘ପ୍ରଭୁ, ଜଗାଇରେ କୋନୋ ଦୋଷ ନେଇ । ସେ ଆମାକେ ରଙ୍ଗା କରେଛେ । ମାଧ୍ୟମିର ଭୁଲ କରେ ଏ-କାଜ କରେଛେ । ତୁମ ଏଦେର କ୍ଷମା କରେ ଦାଓ ।’

ନିତ୍ୟାନନ୍ଦର କଥା ଶୁଣେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଅନେକଟା ଶାନ୍ତ ହଲେନ । ତିନି ଏଗିଯେ ଗିଯେ ଜଗାଇକେ ବୁକେ ଟେନେ ନିଲେନ । ତା ଦେଖେ ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ଅନୁଶୋଚନା ଏଳ । ତିନି ଏଗିଯେ ଏସେ ବଲଲେନ, ‘ପ୍ରଭୁ, ଆମି ଅପରାଧ କରେଛି । ଆମା କ୍ଷମା କରେ ଦାଓ ।’ ଗୌରାଙ୍ଗ ବଲଲେନ, ‘ନିତାଇ ଯଦି ତୋମାଯ କ୍ଷମା କରେ ତାହଲେ ତୁମି କ୍ଷମା ପାବେ ।’ ଏରପର ମାଧ୍ୟମ ଜୋଡ଼ିହାତେ ଏଗିଯେ ଗେଲେନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦର ଦିକେ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତାଁକେ ବୁକେ ଟେନେ ନିଲେନ । ଏଭାବେ ଗୌର-ନିତାଇ ତାଁଦେର ପ୍ରେମଭକ୍ତି ଦିଯେ ଜଗାଇ-ମାଧ୍ୟମକେ ଉନ୍ଧାର କରିଲେନ । ଉପାହିତ ଲୋକଜଳ ସବାଇ ଧନ୍ୟ-ଧନ୍ୟ କରତେ ଲାଗଲ । ଏଭାବେ ଗୌର-ନିତାଇ ନବଦୀପେ କୃଷ୍ଣନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରେମଭକ୍ତି ଦିଯେ ସବାଇକେ ଆପନ କରେ ନିତେ ଲାଗଲେନ । ମାନୁଷେ-ମାନୁଷେ ଭେଦାଭେଦ କମତେ ଲାଗଲ । ଏଥାନେ ଏକଦିନ ଶ୍ରୀଗୌରାଙ୍ଗ ସଲ୍ଲ୍ୟାସ ନିଯେ ନୀଳାଚଳେ ଗେଲେନ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଓ ସଙ୍ଗେ ଗେଲେନ । ସେଥାନେ କିଛୁଦିନ ଥାକାର ପର ଗୌରାଙ୍ଗ ଏକଦିନ ବଲଲେନ, ‘ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଗୌଡ଼େ ଏଥିନ ଏକଦିକେ ଚଲଛେ ଶକ୍ତି ବା ତଞ୍ଚ୍ବାଧନା, ଅନ୍ୟଦିକେ ଚଲଛେ ନବ୍ୟଲ୍ୟାଯେର ଯୁକ୍ତିସର୍ବତ୍ର ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ଵଚର୍ଚା । ଧର୍ମପିପାସୁ ସାଧାରଣ ମାନୁଷ କୋନୋ ପଥ ପୁଣେ ପାଛେନା । ତୁମି ସେଥାନେ ଗିଯେ ସଂସାରୀ ହୁଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାନ, ମୂର୍ଖ, ବ୍ରାଜାଣ, ଚଞ୍ଚଳ, ଧନୀ, ଦୟିତ୍ର ସକଳେ ମଧ୍ୟେ ହରିଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମଧର୍ମ ବିତରଣ କର । ସକଳକେ ଏକ କୃଷ୍ଣନାମେ ଆବନ୍ତ କର ।’

ଏକଥା ଶୁଣେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦର ମାଥାଯ ଯେନ ବଜ୍ରାଘାତ ହଲୋ । ତାକେ ପ୍ରଭୁର ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରତେ ହବେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ । ମାନତେଇ ହବେ । ତାଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼େ ଫିରେ ଏଲେନ ଏବଂ କାଳନାର ଅଧିବାସୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦାସେର ଦୁଇ କନ୍ୟା ବସୁଧା ଓ ଜାହନ୍ବୀରେ ବିବାହ କରେନ । ତାଁଦେର ନିଯେ ତିନି ଖଡଦହେ ସଂସାର ପାତେନ । ବସୁଧାର ପୁତ୍ର ବୀରଭଦ୍ର । ଜାହନ୍ବୀର କୋନୋ ସନ୍ତାନ ନା ଥାକାଯ । ତିନି ଏକ ପୋଷ୍ୟପୂତ୍ର ପ୍ରାହ୍ଲଦ କରେନ । ତାଁର ନାମ ରାମାଇ ଗୋପ୍ତାମୀ । ଖଡଦହେର ଗୋପ୍ତାମୀରା ଏନ୍ଦେରଇ ବଂଶଧର । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଧାରାର ଗୋପ୍ତାମୀରା ଗୌଡ଼ଦେଶେର ସମାଜଜୀବନେ ବେଶ କିଛୁକାଳ ଧରେ ପ୍ରେମଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଘଟାନ ।

গৌরাজের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে নিত্যানন্দ গোড়রাজে, বিশেষত নবদ্বীপে কৃষ্ণনাম ও প্রেমধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। কৃষ্ণনামের পাশাপাশি তিনি কীর্তন করতেন:

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, সহ গৌরাজের নাম।  
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাঁদ, সে হয় আমার প্রাণ।

এভাবে তিনি কৃষ্ণনামের সঙ্গে একীভূত করে দেন শ্রীগৌরাজের নাম। গৌরাঙ্গ-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের এক মহাপ্রচারকরণে গোড়দেশে আবির্ভূত হন নিত্যানন্দ। ধর্মতত্ত্বের কোনো বিচার-বিশ্লেষণ বা তর্ক-বিতর্ক নেই, আচার-অনুষ্ঠানের কোনো বাড়াবাড়ি নেই, শুধু আচ্ছালে প্রেম বিতরণ আর কৃষ্ণনামগান। এভাবে প্রেমভক্তি আর কৃষ্ণনাম প্রচারের মাধ্যমে তিনি অনেক পাপী-ভাপীকে উদ্ধার করেছেন। সকলকে কৃষ্ণভক্তরূপে ভালোবেসেছেন। তাঁর এই জীবোদ্ধারের কথা সারা গোড়ে ছড়িয়ে পড়ে। দলে-দলে লোকজন তাঁর কাছে ছুটে আসতে থাকে। এর ফলে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ জীবনে এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সকলে সমস্ত রকম ভেদাভেদ ভূলে এক সারিতে এসে দাঁড়ায়। সার্থক হয় শ্রীগৌরাজের প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণনামের আন্দোলন। নিত্যানন্দও চির অমর হয়ে থাকেন গোড়বাসীর অন্তরে। ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে এই মহাসাধক ইহলীলা সংবরণ করেন।

### পাঠ ৮ : মীরাবাঈ

ভারতের রাজস্থানে কুড়িকি নামে একটি গ্রাম। এই গ্রামে ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে রাঠোর বংশে মীরাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রঞ্জিসিংহ ছিলেন মেড়তার অধিপতি রাও দুধাজীর পুত্র। মা বীর কুঁয়রী ছিলেন ঝালাবংশীয় রাজপুত্র শূরতান সিংহের কন্যা। রঞ্জিসিংহ কুড়িকি অঞ্চলে বারোখানা গ্রামের জায়গির পেয়ে সেখানেই গড় নির্মাণ করে বাস করতেন।

মীরা ছিলেন তাঁর পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তাই খুব আদর-যত্নে তিনি লালিত-পালিত হচ্ছিলেন। কিন্তু মাত্র আট বছর বয়সে তিনি তাঁর মাকে হারান। ফলে তাঁর জীবনে একটা ছন্দপতন ঘটে। পিতা রঞ্জিসিংহ যেয়েকে নিয়ে অনেকটা বিপদে পড়েন। তখন পিতামহ রাও দুধাজী মীরাকে নিজের কাছে নিয়ে যান। পরম যত্নে তাঁকে লালন-পালন করতে থাকেন।

দুধাজী নিজে ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। মেড়তার প্রাসাদের পাশে ছিল তাঁরই প্রতিষ্ঠিত চতুর্ভুজজীর মন্দির। তিনি নিয়মিত সেখানে পূজার্চনা করতেন। মাঝে মাঝে মীরাও সেখানে যেতেন। মন্দিরের পুরোহিত গদাধর পঞ্জিত শাঙ্কালোচনা করতেন। মীরা অগ্রহভরে তা শুনতেন। পিতামহ দুধাজীও মাঝে মাঝে তাঁকে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনি শোনাতেন।

ଏଇ ଫଳେ ଛୋଟବେଳା ଥେବେଇ  
ଧର୍ମଜୀବନେର ଏକଟା ଆଦର୍ଶ  
ମୀରାର ହଦୟେ ବଜ୍ରମୂଳ ହସ୍ତେ  
ଯାଉ । ବାଲିକା ବରସେଇ ମୀରା  
ଭକ୍ତିରମାତ୍ରକ ଭଜନ ରଚନାଯ  
ଆସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ  
ଦେନ । ଚତୁର୍ଭୁଜଜୀର ମନ୍ଦିରେର  
ଦେୟାଲେ ମୀରାର କଥେକଟି  
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭଜନ ଉତ୍ସକିର୍ଣ୍ଣ ଆଛେ ।

ଏକବାର ଏକ ସାଧୁ ମୀରାକେ  
ଗିରିଧାରୀ ଗୋପାଳେର ଏକଟି  
ବିଥିହ ଦେନ । ମୀରା ସେଟି  
ଆସାଦେ ନିଯେ ନିତ୍ୟ ଭାର  
ସେବା-ପୂଜା କରାତେନ । ଏଇ  
ଫଳେ ଛୋଟବେଳା ଥେବେଇ  
କୃକ୍ଷେର ପ୍ରତି ମୀରାର ଗଭୀର  
ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭାଲୋବାସାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

ମୀରା ଘୋବନେ ପା ଦିଯେଛେନ ।  
କୁପଳାବଣ୍ୟ ତିନି ଅନନ୍ୟ ।  
ପିତାମହ ଦୁଧାଜୀ ନାତନିର

ବିବାହ ଠିକ କରାଲେନ । ପାଇଁ ଚିତ୍ତୋରେ ରାଗା ସଂଗ୍ରାମସିଂହେର ପୁନ୍ର ଭୋଜରାଜ । ୧୫୧୬ ଖ୍ରୀଟାବେ ମହାସମାରୋହେ  
ମୀରାର ବିବାହ ହୁଏ ଗେଲ । ତିନି ଚଲେ ଗେଲେନ ଶକ୍ତର ବାଡ଼ି ।

ଶକ୍ତର ବାଡ଼ିତେ କୋନୋ କିଛୁର ଅଭାବ ନେଇ । ରାଗା ସଂଗ୍ରାମସିଂହେର ମତୋ ଶକ୍ତର । ଭୋଜରାଜେର ମତୋ ସୁଯୋଗ୍ୟ  
ସ୍ଵାମୀ । ଅତୁଳ ଐଶ୍ୱର । ଅସଂଖ୍ୟ ଦାସ-ଦାସୀ । କିନ୍ତୁ ଏ-ସବେର ପ୍ରତି ମୀରାର କେନୋ ଆସନ୍ତି ନେଇ । ଜୀବନେ ତା'ର  
ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହଲୋ କୃକ୍ଷପ୍ରେମ ଆର ଗିରିଧାରୀଲାଲେର ସାକ୍ଷାତ୍ ଲାଭ । ତିନି ଶୁଦ୍ଧ ସାଧନ-ଭଜନ ନିଯେଇ  
ଥାକେନ । ଆସାଦେ କୋନୋ ସାଧୁ-ସନ୍ତ ଏଲେ ଛୁଟେ ଯେତେନ ତା'ର କାହେ । ଏକମନେ ହରିକଥା ଶୁଣିଲେ । କଥନୋ  
କଥନୋ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୁଏ ନିଜେର କଟେଇ ଶୁଙ୍କ କରାତେନ ଭଜନ ଗାନ । ତା'ର କର୍ତ୍ତ ଏତ ମଧୁର ଛିଲ ଯେ ସବାଇ ମନ ଦିଯେ  
ତା ଶୁଣିଲ ।

ଭୋଜରାଜ ଝାର ପ୍ରତି ଛିଲେନ ଉଦାର ଓ ସହନଶୀଲ । ତିନି ଝାର ମନେର କଥା ବୁଝାତେ ପାରେନ । ତାଇ ଏକଟି  
କୃକ୍ଷମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରେ ଦେଖାନେ କୃକ୍ଷେର ବିଥିହ ସ୍ଥାପନ କରେ ଦେନ । ମୀରା ଏତେ ଖୁବ ଖୁଶି ହନ । ସ୍ଵାମୀର ପ୍ରତି ତା'ର  
ଶ୍ରଦ୍ଧା-ଭକ୍ତି ବେଢ଼େ ଯାଇ । କିନ୍ତୁ ସମୟ କାଟେ ତା'ର କୃକ୍ଷଭଜନେ । ସଂସାରେର ପ୍ରତି ତା'ର କୋନୋ ଆଗ୍ରହ ନେଇ । ଏତେ  
ଆତ୍ମୀୟ-ପରିଜନ ଓ ଆସାଦେର ଲୋକଜନେର ମଧ୍ୟେ ନିନ୍ଦା ଓ ସମାଲୋଚନା ଶୁଙ୍କ ହୁଏ ଯାଇ ।



ক্রমশ মীরার মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পায়। রাজবধূর বেশে তিনি যেন এক সর্বত্যাগিনী তপস্তিনী। দিনে রাতে প্রায় সময়ই তিনি ভজন-পূজনে ব্যস্ত থাকেন। ইষ্টদেব গোপীনাথের জন্য মাঝে মাঝে কাঁদতে থাকেন। এরপ অবস্থায় ভোজরাজ একদিন স্তৰীকে ডেকে বলেন— তোমার প্রাণের বেদনা কোথায়, প্রাণের আকৃতি কী তা খুলে বল। বল, তুমি কী চাও। কী পেলে তুমি সুখী হবে, কিসে শান্তি লাভ করবে তা আমায় বল।

মীরা তখন মধুর কঠে একটি ভজন গেয়ে তার উভর দিলেন:

মেরে ত গিরিধর গোপাল, দূসরো ন কোই  
জাঁতে শির মোর মুকুট মেরে পতি সোই।

অর্থাৎ গিরিধারী গোপাল ছাড়া আমার কেউ নেই। যার মাথায় ময়ূর-মুকুট তিনিই আমার পতি।

ভোজরাজ স্তৰীর সঙ্গীত শুনে মুক্ষ হলেন। তাঁর মনের কথাও বুঝতে পারলেন। তিনি মীরার সাধন-ভজনে সার্বিক সহযোগিতা করতে লাগলেন।

এদিকে রাজবধূ মীরার কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাকুলতার কথা চিতোরের সাধারণ মানুষ এবং সাধু-সন্ন্যাসীরা জেনে গেছেন। তাঁরা মীরাকে রাজমহিলী নয়, বরং ভক্তিসাধিকা মীরাবাঈ বলে জানলেন। মীরার সুমধুর কঠের সঙ্গীত এবং প্রেম সাধনার কথা সমন্ত রাজস্থানেই প্রচারিত হলো।

এ অবস্থায় ১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে ভোজরাজ হঠাতে মারা যান। এর অল্পকাল পরে শুশুর রাগা সংগ্রামসিংহও মারা যান। তখন চিতোরের নতুন রাগা হন বিক্রমজিং সিং। তিনি মীরার ওপর নানা অভ্যাচার করতে থাকেন। তাঁকে মেরে ফেলারও চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাঁর আরাধ্য গিরিধারীর কৃপায় তিনি রক্ষা পান।

শেষপর্যন্ত মীরাবাঈ পিতৃগৃহ গোড়তায় ক্রিয়ে যান। সেখান থেকে চলে যান বৃন্দাবনে। তখন শ্রীকৃপ গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর আচার্য। মীরা তাঁর দর্শন কামনা করেন। কিন্তু আচার্য স্তৰীলোককে দর্শন দিতে রাজি নন। তখন মীরা বলেন, ‘গোস্বামীজী কি ভাগবতের কথা বিস্মৃত হয়েছেন? বৃন্দাবনের একমাত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। আর সকলেই প্রকৃতি। তবে তত্ত্বদর্শী গোস্বামীজী আমাকে দর্শন দিতে এত কুণ্ঠিত কেন?’

মীরার তত্ত্বপূর্ণ কথা শুনে শ্রীকৃপ গোস্বামী গ্রীত হন এবং মীরার সঙ্গে কৃষ্ণকথা বলেন। মীরার কৃষ্ণ-ব্যাকুলতা গোস্বামীকে মুক্ষ করে।

বৃন্দাবনে এসে মীরা তীব্রভাবে প্রেমভক্তিতে আপৃত হয়ে পড়েন। দিকে দিকে তাঁর নাম প্রচারিত হয়। রাজস্থান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে মীরার নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কৃষ্ণ ভক্তিপ্রায়ণা মীরাবাঈ ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ভগবান প্রাণির পথ প্রদর্শন করেন। তাঁর রচিত ভজন-সঙ্গীত কৃষ্ণপ্রেমের গান, কৃষ্ণের উপাসনা এবং তত্ত্ববৎ সাধনার এক নতুন পথ প্রদর্শন করে। এই সঙ্গীতধারা হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির সৃষ্টি করে। এই সম্প্রীতি যে মিলনধারায় প্রকাশ লাভ করে, তার নাম ‘ভক্তিবাদ’। হিন্দুধর্মের ভাগবতধর্ম ও ভক্তিবাদ এবং ইসলামের সুফীবাদে সকল শ্রেণির মানুষকে সমান চোখে দেখা হয়।

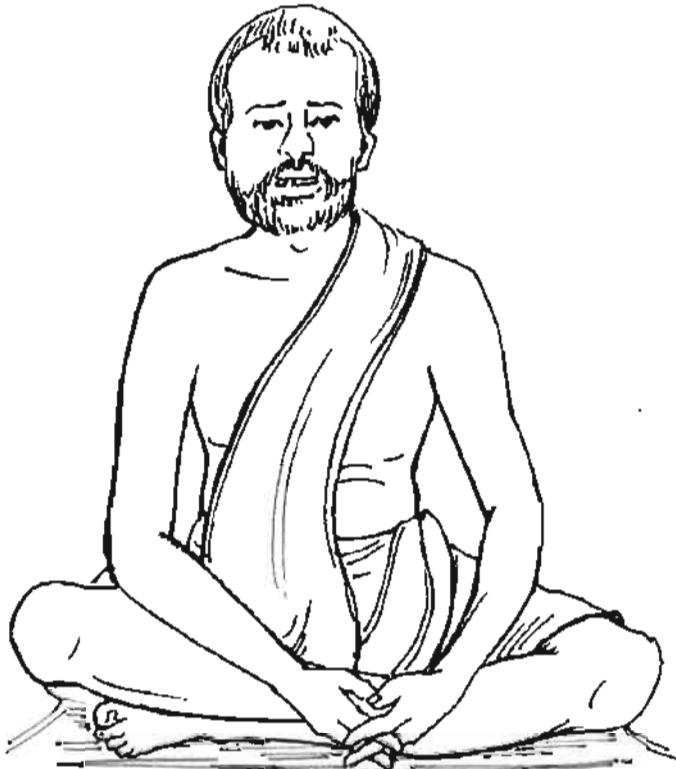
অতঃপর একদিন বৃন্দাবনের জীলা সাঙ করে মীরা কৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করেন। দ্বারকাধামে এসে রণছোড়জীর বিগ্রহের ভজন-পূজনেই জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করেন। এই দ্বারকাধামেই তাঁর দেহলীলা সংবরণ হয়।

ଶ୍ରୀରାବାଇମେର ଜୀବନୀ ଥେବେ ଆମରା ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେ, ଯାରା ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ସାଧକ ତା'ରା ଜୀଗତିକ ସବକିଛୁଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଠେ ଥାନ । ଦୈତ୍ୟିକ ଜ୍ଞାପ-ଜ୍ଞାବଣ୍ୟ, ପାର୍ଥିବ ବିବୟ-ଆଶ୍ୟ, ସୁଖ-ସାଜ୍ଜନ୍ୟ ତା'ଦେର ଚିନ୍ତକେ ଆକର୍ଷଣ କରେ ନା । ସବକିଛୁ ଛେଡ଼େ ତା'ରା କାମ୍ୟ ବନ୍ଧକେ ଲାଭ କରାର ଜଳ୍ୟ ଏକାଥିଟିତେ ସାଧନା କରେନ । ସେ ସାଧନାମ୍ବ ତା'ରା ସଫଳ ହନ ।

### ପାଠ ୯ ଓ ୧୦ : ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ

'ସକଳ ଧର୍ମହି ସତ୍ୟ, ସତ ଯତ ତତ ପଥ', ଅର୍ଦ୍ଧାଂ ଧର୍ମୀର ଯତ ଓ ପଥ ତିନି ହଙ୍ଗେତେ ସକଳ ଯାନୁଷେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପନ୍ତବ୍ୟ ଏକ - ଦୈତ୍ୟଳାଭ । ଏହି ପରମ ଜାତ୍ୟାଟି ଯିନି ଉପଲକ୍ଷ କରେଇଲେନ ତିନି ଅଧିଗତ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷିତ ହିଲେନ ନା । ତିନି ହିଲେନ ଅଧିକିତ । ସୋପାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମର ଏଇ ମୂଳତତ୍ତ୍ଵ ତିନି ଉପଲକ୍ଷ କରାତେ ଜ୍ଞାନ ଅନୁର୍ଗତ କାମାରପୁକୁର ପାଇଁ ପେରେଇଲେନ । ଭାରତେର ପଚିମବତୀର ହଙ୍ଗମୀ ତା'ର ଜନ୍ୟ - ୧୮୩୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଦେର ୧୭ ଫେବ୍ରୁଆରି । ତା'ର ପିତାର ନାମ କୁଦିରାଯ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ମାତା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦେବୀ । ପିତା-ମାତା ବିକୁଳ ଅପର ନାମନ୍ୟାରେ ଶିଶୁଗୁଡ଼େର ନାମ ରାଖେନ ଗଦାଧର । ଏହି ଗଦାଧରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ନାମେ ଜଗନ୍ମିତ୍ୟାତ ହନ ।

ବାଲକ ଗଦାଧର ଦେଖିତେ ହିଲେନ ଖୁବଇ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ । ଥାକୃତିକ ଦୂଳ୍ୟ ଦେଖିତେ ଦେଖିତେ କିମୋ ଆକାଶେ ଉଡ଼ୁଥ ବଲାକାର ବୌକ ଦେଖେ ଯାବେ ମାବେ ତିନି ଭାବାବିଟ ହେଲେ ପଡ଼ିଲେନ । ଏଠା ହିଲ ତା'ର ବଭାବଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । କିନ୍ତୁ କୁଳେର ଲେଖାଗଡ଼ାୟ ତା'ର ମନ ହିଲ ନା ଏକେବାରେଇ । ତାଇ ପ୍ରାତିଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ତା'ର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନି । ତବେ ତା'ର ଶ୍ରୁତିଶକ୍ତି ହିଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭର । ଏକବାର କିନ୍ତୁ ତଳଳେଇ ମୁଖରୁ ବଲକେ ପାରାତେନ । ଏଭାବେ ତିନି ପିତାର କାହ ଥେବେ ଶେଖେନ ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରୋକ ଓ କ୍ଷବ-କ୍ଷୋତ୍ର, ଆମେର କଥକଦେର କାହ ଥେବେ ଶେଖେନ ରାମାଯଣ-ମହାଭାରତ ଏବଂ ପୁରୀଗାୟୀ ଭୀରୁଧ୍ୟାଜୀଦେର କାହ ଥେବେ ଶେଖେନ ଧର୍ମଗୀତି । ଭଜନ-କୀର୍ତ୍ତନେର ପ୍ରତି ତା'ର ଖୁବ ଆକର୍ଷଣ ହିଲ । ଏଭାବେ ଗଦାଧର ପ୍ରାତିଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ାଇ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ପାରଦଶୀ ହେଲେ ଶୁଭେନ ।



গদাধরের অল্প বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যুর হয়। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর জীবনে এক অন্তর্ভুক্ত পরিবর্তন আসে। তিনি কখনও শুশানে গিয়ে বসে থাকেন। কখনও বা নির্জন বাগানে গিয়ে সময় কাটান। সাধু-বৈষ্ণবদের দেখলে কৌতুহল ভরে তাঁদের আচরণ লক্ষ করেন। তাঁদের নিকট ভজন শেখেন। এ অবস্থায় অঞ্জ রামকুমার তাঁকে কোলকাতা নিয়ে যান। সেখানে বামাপুরুরে অবস্থিত নিজের টোলে তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেন। কিন্তু গদাধরের মনের কোনো পরিবর্তন হয় না। আগের মতোই শেখাপড়ায় তিনি উদাসীন থাকেন।

এমন সময় রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আসেন। গদাধরও তাঁর সঙ্গে আসেন। মা-কালীর বিগ্রহ এবং পূজার্চনা দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হন। তিনি যেন এতদিন এমন একটা কিছুই চেয়েছিলেন। তাই কখনও তিনি মায়ের মন্দিরে ভাবতন্ত্রয় হয়ে থাকেন, কখনও বা আত্মঘং অবস্থায় গঙ্গার তীরে ঘুরে বেড়ান।

হঠাতে একদিন অঞ্জ রামকুমারের অকালমৃত্যু হয়। ফলে মায়ের পূজার ভার পড়ে গদাধরের ওপর। মনেগ্রামে তিনি মায়ের পূজা আরম্ভ করেন। মায়ের পূজায় ভক্তিগীতি গাওয়ার সময় প্রায়শই তিনি অচেতন হয়ে পড়তেন। কালকৃত্যে এখানেই কালীসাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটে। তিনি স্তু সারদা দেবীকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেন, যা অচিরেই তাঁকে ‘আধ্যাত্মিক জননী’ পদে উন্নীত করে। এভাবে গদাধর সর্বব্যাপিণী চৈতন্যরূপণী দেবীর দর্শন লাভ করেন।

১৮৫৫ সনে গদাধর মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হন। এতে তাঁর কালীসাধনার সুবর্ণ সুযোগ ঘটে। এর ছয় বছর পর ১৮৬১ সালে সিঙ্গা ভৈরবী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বরে আসেন। গদাধর তাঁকে শুরু মানেন এবং তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এই ভৈরবীই গদাধরকে অসামান্য যোগী এবং অবতার পুরুষ বলে আখ্যায়িত করেন।

এরপর গদাধরের সাধন জীবনে আসেন সন্ধ্যাসী তোতাপুরী। তিনি গদাধরকে বেদান্ত সাধনায় দীক্ষিত করেন এবং তাঁর নাম রাখেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। শ্রীরামকৃষ্ণ একই সঙ্গে বৈষ্ণব সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করেন।

রামকৃষ্ণ শুধু হিন্দু ধর্মতত্ত্বিক সাধনায়ই আবদ্ধ থাকেন নি। তিনি ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মতেও সাধনা করেছেন। এভাবে বিভিন্ন ধর্ম সাধনার মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরকে উপলক্ষ করেছেন। তাঁর মতে সকল ধর্মেই জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে উপলক্ষ করা। ধর্মসমূহের পথ তিনি হলোও সকলেরই উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করা। তাই তিনি উদার কর্তৃত বলেছেন, ‘সকল ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ।’ তিনি প্রথাগত সন্ধ্যাসীদের মতের সঙ্গে একমত ছিলেন না বা তাঁদের মতো পোশাকও পরতেন না। এমনকি তিনি স্তু সারদা দেবীকে সাক্ষাৎ জগদঘা জ্ঞানে পূজা করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন লোকগুরু। ধর্মের জটিল তত্ত্ব তিনি গঁথের মাধ্যমে সহজ করে বোঝাতেন। ঈশ্বর রয়েছেন সকল জীবের মধ্যে, তাই জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা – এই ছিল তাঁর দর্শন। ধর্মীয় সম্প্রীতিতে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁরই ধর্মীয় আদর্শ জগদ্বাসীকে শুনিয়ে গেছেন, যার ফলে তাঁর এই জীবসেবার আদর্শ অর্থাৎ মানবধর্ম আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। বিবেকানন্দ তাঁর শুরুদের সম্পর্কে বলেছেন, ‘তিনি যেদিন জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন থেকে সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচান্ত প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধর্মী-নির্ধনের ভেদ, ব্রাহ্মণ-চন্দল-ভেদ সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন।’

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ସାଧନ-ଦର୍ଶନେର କଥା ଚାରଦିକେ ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ । ଫଳେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ-ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରେ ଆସତେ ଥାକେନ । ତା'ର ଉଦାର ଧୟୀୟ ନୀତିର ପ୍ରଭାବେ ପାଶାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଭାବାଦର୍ଶ ମୋହଗ୍ନତ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଭାରତୀୟ ଆଦର୍ଶେ ଫିରେ ଆସେନ । ତିନି ଯେମନ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମାନୁଷେର କାହେ ଯେତେନ, ତେମନି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗଙ୍କ ତା'ର ନିକଟ ଆସନେ । ଶିବନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ସେନ, ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସରକାର, ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷନାଥ ଆରୋ ଅନେକ ସ୍ଵନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ସଂପର୍କେ ଏସେଇଲେନ । ଫରାସି ମନୀଷୀ ରମ୍ଭାରଲ୍ଲା ବିବେକାନନ୍ଦେର କାହେ ଥେକେ ଶୁଣେ ଏତଟାଇ ପ୍ରଭାବିତ ହନ ଯେ, ତିନି ରାମକୃଷ୍ଣ ସମ୍ପର୍କେ ଏକ ବୃଦ୍ଧାକାର ଗ୍ରହ୍ୟ ରଚନା କରେନ ।

ପରମପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଦ୍ଧ ମୁଖେର କଥା ନୟ, ସେଶ୍ତଳେ ତା'ର ଜୀବନଚାର୍ଯ୍ୟ ରଙ୍ଗାୟିତ ସତ୍ୟ । ତିନି ଅହଂକାରଶୂନ୍ୟ ହେଁ ଜୀବକେ ଶିବଜ୍ଞାନେ ସେବା କରେଛେନ । ଦରିଦ୍ରଦେର ଦେଖଲେ ତା'ର ମନ କାନ୍ଦତ । ଏକବାର ତିନି ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନେ ଯାଇଲେନ । ସଙ୍ଗେ ରାନି ରାମମଣିର ଜାମାତା ମଥୁରବାବୁ । ତା'ରା ତଥନ ଦେଉଘରେ । ଶ୍ରୀମତୀ ମଥୁରବାବୁଙ୍କ ବଲଲେନ ଦରିଦ୍ରନାରାୟଣେର ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରତେ । ମଥୁରବାବୁ ତାଇ କରଲେନ ।

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଛିଲେନ କାଳୀର ସାଧକ । କାଳୀମୂର୍ତ୍ତିତେ ତିନି ପୁଜୋ ଦିତେନ । ଏର ମଧ୍ୟ ଦିଯେଇ ତିନି ମାୟେର ସାଧନା କରତେନ । ତାଇ ବଲେ ମୃତ୍ତିପୂଜାର ବିରୋଧୀ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମର ସଙ୍ଗେ ତା'ର କୋନୋ ବିରୋଧ ଛିଲ ନା । ବ୍ରାହ୍ମସମାଜେର ଅନ୍ୟତମ ନେତା କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ସେନେର ସଙ୍ଗେ ଛିଲ ତା'ର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ । କେଶବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ତା ଏବଂ ତା'ର ସମ୍ପାଦିତ ପଞ୍ଜିକାର ମଧ୍ୟମେ ରାମକୃଷ୍ଣଦେବେର କଥା ପ୍ରଚାର କରେନ । ଏ ଥେକେଇ ବୋରୀ ଯାଯା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କତଟା ପରମତସହିଷ୍ଣୁ ଛିଲେନ । ତା'ର ସାଧନ-ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଧର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରେ । ଏଟା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏକଟା ବଡ଼ ଅବଦାନ ।

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାନୁଷେର ଜାତି, କୁଳ, ମାନ, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖତେନ ନା । ତିନି ଦେଖତେନ ମାନୁଷେର ଅନ୍ତର । ତାଇ ତା'ର କାହେ ଉଚ୍ଚ-ନୀଚ୍ ସବ ଶ୍ରେଣିର ମାନୁଷ ଆସତ । ତାଇତୋ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଛିଲ ସବାର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ୟନ୍ତ ।

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସକଳ ନାରୀର ମଧ୍ୟେ ଜଗନ୍ନାତାକେ ଦର୍ଶନ କରତେନ । ନାରୀମାତ୍ରି ତା'ର କାହେ ଛିଲ ମାତ୍ରସଙ୍ଗପା । ତାଇତୋ ନିଜେର ଦ୍ୱାରକେ ତିନି ମାତ୍ରଜ୍ଞାନେ ପୁଜୋ କରେଇଲେନ । ଜଗତେ ଏକପ ଘଟନା ହିତୀଯାଟି ଆର ନେଇ ।

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବଲତେନ, ‘ଯଥନ ବାଇରେ ଲୋକେର ସଙ୍ଗେ ଯିଶବେ, ତଥନ ସକଳକେ ଭାଲୋବାସବେ । ଯିଶେ ଯେନ ଏକ ହେଁ ଯାବେ । ବିଦେଶଭାବ ବାଖବେ ନା । ଓ ସାକାର ମାନେ, ନିରାକାର ମାନେ ନା; ଓ ନିରାକାର ମାନେ, ସାକାର ମାନେ ନା; ଓ ହିନ୍ଦୁ, ଓ ମୁଲମାନ, ଓ ଖିଣ୍ଡାନ – ଏହି ବଲେ କାଉକେ ଘୃଣା କରବେ ନା ।’

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଯେ ଉଦାର ମନୋଭାବ, ଏର ଦ୍ୱାରା ଭାରତେର ଲୋକଜଳ ଦାର୍ଶନଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଁଥେନ । ଧର୍ମ-ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷେ ତା'ର କାହେ ଏସେଇନ । ତା'ର ଅମୃତ ବାଣୀ ଶ୍ରୀଵଣ କରେଇଲେ । ଅନ୍ୟତମ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ହିସେବେ ପରିଗଣିତ ।

୧୮୮୬ ଖିଣ୍ଡାନରେ ୧୫ଇ ଆଗସ୍ଟ ଏହି ମହାପୁରୁଷ ପରଲୋକ ଗମନ କରେନ । ତା'ର ସାଧନାହୁନ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଏଥିନ ଅନ୍ୟତମ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ହିସେବେ ପରିଗଣିତ ।

### শ্রীরামকৃষ্ণের কথোকটি উপদেশ

১. পিতাকে ভক্তি কর, পিতার সঙ্গে প্রীতি কর। জগৎজনপে যিনি সর্বব্যাপী হয়ে আছেন, তিনিই মা। জননী, জন্মস্থান, বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে, তার ধর্ম ছাই হয়ে যাবে।
২. মা শুরুজন, ব্রহ্মময়ী-স্বরূপা। যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখতে হবে।
৩. ঈশ্বরের নামে মানুষ পবিত্র হয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাকলে শুন্দ হয়, পবিত্র হয়। একমাত্র ভক্তির দ্বারা জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। ভজের জাতি নেই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা সব শুন্দ হয়। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। ভক্তি থাকলে চঙ্গাল চঙ্গাল নয়। ভক্তি হলে চঙ্গালের অল্পও খাওয়া যায়।
৪. ছাদের উপর উঠতে হলে মই, বাঁশ, সিঁড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন ওঠা যায়, তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক একটি উপায়। প্রত্যেক ধর্মই সত্য।
৫. আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভেতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌছানো যায়। ‘যত যত তত পথ’।
৬. পিংপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য-অনিত্য মিশে আছে। বালিতে-চিনিতে মেশানো। পিংপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
৭. জলে নৌকা থাকে ক্ষতি নেই। কিন্তু নৌকার ভেতরে যেন জল না ঢোকে। তাহলে নৌকা ডুবে যাবে।
৮. ঈশ্বর এক, তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যার যে নামে ও যে ভাবে ডাকতে ভালো লাগে, সে সেই নামে ও সেই ভাবে ডাকলে দেখা যায়।
৯. ভজেরা তাঁকেই নানা নামে ডাকছে; এক ব্যক্তিকেই ডাকছে। এক পুরুরের চারাটি ঘাট। হিন্দুরা জল নিচ্ছে একঘাটে, বলছে জল; মুসলমানরা আর একঘাটে নিচ্ছে, বলছে পানি; ইংরেজরা আর একঘাটে নিচ্ছে, বলছে ওয়াটার; আবার অন্য লোক একঘাটে নিচ্ছে, বলছে Aqua। এক ঈশ্বর তাঁর নানা নাম।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, ঈশ্বরজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। পিতা, মাতা এবং জন্মভূমিকে শ্রদ্ধা করতে হবে। সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু হতে হবে। ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। তাহলে আর ধর্মীয় সংঘাত দেখা দেবে না। সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক – ঈশ্বরলাভ। এক জাতিভেদ থাকবে না। ভজের কোনো জাতি নেই। ঈশ্বরের বহু নাম। ভক্তিভরে যে-কোনো নামে ডাকলেই তাঁকে পাওয়া যায়। সকল ধর্মে ভক্তি থাকলে ভক্তিতে দেহ, মন, আত্মা শুন্দ হয়। দরিদ্র নারায়ণ, তার সেবা করতে হবে। এতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।

আমরা সকলে শ্রীরামকৃষ্ণের এই নীতিশিক্ষা অনুসরণ করব। তাহলে আমরা যথার্থ মানুষ হতে পারব।

### পাঠ ১১ : শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোপ্যামী

বাংলা ১২৪৮ সালের (১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দ) শ্রাবণ মাস। তখন ছিল পূর্ণিমা তিথি। নববীপের শান্তিপুরে প্রতি বৈশ্বণ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের বুলন যাত্রা উৎসব পালিত হচ্ছে। সেই উৎসবমুখর পুণ্য তিথিতে ভোর বেলায় বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আনন্দকিশোর গোপ্যামী ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান ভক্ত। মা সুর্ণময়ী দেবীও ছিলেন একজন ধর্মনিষ্ঠ দয়াবক্তী রমণী।

বিজ্ঞানের প্রামাণ্য পাঠ্যশালার শিক্ষার্থীদের করেন। তারপর অর্তি হয় শান্তিগুর টোলে। সেখানের পড়া  
শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য অর্তি হয় কোলকাতার সংকৃত কলেজে। এ-সময় তাঁর বিদ্যে হয়। শ্রী যোগমাত্রা  
হিসেন শিকারগুরুর রামচন্দ্র ভাদ্যুলীর কল্প।

সংকৃত কলেজে বিজ্ঞান পড়ার পর  
বিজ্ঞানের মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন।  
সেখানে করেকজন বক্তৃকে নিয়ে  
‘হিতসকারিনী’ শাখে এক সভা হালন  
করেন। সভার সিঙ্গার হিল: যিনি যা সত্য  
বলে বুঝবেন, তিনি তা ধারণে কার্য  
পরিপন্থ করবেন। এই সভার বিজ্ঞানকে  
এক মুগাড়কারী সিঙ্গার দেন। তিনি বলেন,  
‘গৈতা আজিজেসের টিক। তাই আমাদের  
গৈতা জ্যাপ করা উচিত।’ এ-কথা অনে  
কোরা ত্রাপ্ত হিসেন তাঁরা সবাই গৈতা কেলে  
দেন। সেই সবজে ত্রাপ্ত হয়ে গৈতা কেলে  
দেনা এক সুসাহসিক কাজ হিল।

এই সবজে ত্রাপ্তসমাজের সঙে বিজ্ঞানকের  
বোধান্বোধ ঘটে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর  
ও কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা অনে তাঁর মনে  
পরিবর্তন আসে। তিনি ত্রাপ্তবর্মের ধৃতি  
অনুরক্ত হন এবং ত্রাপ্তবর্ম এহণ করেন।



বিজ্ঞানকের এই গৈতা বর্জন ও ত্রাপ্তবর্ম এহন তাঁর আর্টীম-শক্তিমান ভালো চোখে দেখেন নি। বিজ্ঞানকে  
এ-সময় শান্তিগুরে এলে তাঁর ধৃতি তাঁরা কিন্তু হয়ে গঠন। বিজ্ঞানকে তাঁর মত ও বিশ্বাসের ব্যাপারে  
আলোচ করেন নি। তিনি কোলকাতা ছেলে আসেন।

তখন বিজ্ঞানকের মেডিকেলের মূল্য পর্যাপ্ত সাময়ে। তিনি ধৃতি হয়েছে। যিনি ত্রাপ্তসমাজ থেকে স্বাক  
ঝল ধর্ম প্রচারের। চিকিৎসক জীবনের উচ্চল ভবিষ্যতের কথা তিনি না করে বিজ্ঞানক ত্রাপ্তবর্ম প্রচারের  
দায়িত্ব এহণ করেন। তিনি হিসেন ত্রাপ্তসমাজের আচার্য বিজ্ঞানক। চাকা, বরিশাল, রশোর, খুলনা এবং  
ভাবাকের বিকির্ণ অঞ্চলে তিনি ত্রাপ্তবর্ম প্রচার করেন। অনেককে তিনি ত্রাপ্তবর্মে সীকৰণ দেন।

বিজ্ঞানক এক সময় উত্তরাঞ্চলে অবস্থান করছিসেন। তখন তিনি এক কঠিন অসুখে পড়েন। সেবার  
২৫ বামলীর শ্রীলোকনাথ প্রস্তাবিনীর ফুলাম তিনি সুন্ধ হন। এ ঘটনা তাঁর জীবনে এক গভীর অভ্যাস হয়ে।

বাবা লোকনাথ এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রভাবে তাঁর মধ্যে আবার বৈষ্ণব ভাব জেগে উঠে। এ-সময় গয়ার আকাশ গঙ্গা পাহাড়ে তাঁর সাক্ষাৎ হয় যোগী ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সঙ্গে। তিনি তাঁকে দীক্ষা দিয়ে পুনরায় হিন্দু যোগীতে পরিণত করেন। এরপর বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম ছেড়ে দেন।

এ-সময় বিজয়কৃষ্ণ জ্ঞানী, পুত্র-কন্যা এবং শিষ্যদের নিয়ে ভীষণ অর্থকষ্টে পড়েন। তখন লোকনাথ বাবার নির্দেশে তিনি ঢাকার গেড়ারিয়ায় আশ্রম স্থাপন করে নামগান ও হরিসংকীর্তন করতে থাকেন। এতে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং ঢাকায় তাঁর যশ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় আশ্রম স্থাপন করলেও মাঝে মাঝেই তিনি কোলকাতা যেতেন। একবার জ্ঞানীকে নিয়ে তিনি বৃন্দাবনে যান। সেখানে কলেরা রোগে জ্ঞানীর মৃত্যু হয়। তারপর ১৩০৪ সালের (১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ) ফাল্গুন মাসে বিজয়কৃষ্ণ জ্ঞানীকে পুরী চলে যান। সেখানে অতি অল্প সময়েই তিনি পরিচিত হয়ে উঠেন। উড়িষ্যা প্রদেশেও তাঁর প্রভাব ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এতে ঈর্ষাষ্ঠিত হয়ে স্থানীয় ধর্মব্যবসায়ীরা একদিন তাঁকে বিষ মিশ্রিত লাঙ্ডু খেতে দেয়। তাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৩০৬ সালের (১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) ২২এ জৈষ্ঠ রবিবার ইহলোক ত্যাগ করেন।

### বিজয়কৃষ্ণের কর্যকৃতি উপদেশ

#### ১. হরিনামে প্রেম লাভের আটটি ক্রম -

- |                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| ক. পাপবোধ           | খ. পাপকর্মে অনুভাপ                 |
| গ. পাপে অপ্রবৃত্তি  | ঘ. কুসঙ্গে ঘৃণা                    |
| ঙ. সাধুসঙ্গে অনুরাগ | চ. নামে রূচি ও গ্রাম্য কথায় অরূচি |
| ছ. ভাবোদয়          | জ. প্রেম।                          |

২. অন্তরে হিংসা থাকলে ঈশ্বরের লীলা দর্শন হয় না। যদি কিছু সময়ের জন্যও হৃদয় হিংসাশূন্য হয়, তখন লীলা দর্শন হতে পারে।

৩। কখনো পরিনিদ্রা করবে না।

৪। সত্য কথা বলবে ও সর্বদা ব্রহ্মচর্য রক্ষা করবে।

৫। সর্বদা নিষ্ঠাসহকারে ভগবানের নাম করবে।

৬। সর্বজীবে দয়া করবে।

৭। বৃথা অহংকার করবে না।

৮। শান্ত ও মহাজনদের বিশ্বাস করবে।

### পাঠ ১২, ১৩ ও ১৪ : স্বামী বিবেকানন্দ

বহুক্রপে সমুখে তোমার, ছাড়ি কোথা পুঁজিছ ঈশ্বর?  
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

ଜୀବେର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ-ଭାଲୋବାସା, ଈଶ୍ଵରଙ୍ଗାନେ ଜୀବସେବାର ଏମନ କଥା ଆର କେ କବେ ବଲେଛେ? ବଲେଛେ ଏକଜଳଇ । ଏହି ଅମର ବାଚୀର ଦେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ହଜେନ ଶାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ । ୧୮୬୩ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେର ୧୨ ଜାନୁଆରୀ କୋଲକାତାଯ ତୀର ଜନ୍ମ । ଗିର୍ଭ ବିଶ୍ଵନାଥ ଦନ୍ତ ଛିଲେନ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟେର ଏକଜଳ ବିଖ୍ୟାତ ଉକଳ ଏବଂ ମାତା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଛିଲେନ ଏକଜଳ ସୁଗୃହିଣୀ ।

ବିବେକାନନ୍ଦେର ପ୍ରକୃତ ନାମ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦନ୍ତ । ତିନି ଛିଲେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ । ବିଶେଷ କରେ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରେ ତୀର ଅଗାଧ ପାଞ୍ଚିତ୍ୟ ଛିଲ । ତିନି ସାଧନ ଜେନାରେଲ ଏୟାସେଚଲି କଲେଜେର ଛାତ୍ର, ତଥାନ କଲେଜେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେତି ଏକ ବିତର୍କର୍ମଭାବୀ ନରେନ୍ଦ୍ରେର ପ୍ରତିଭାଯ ମୁହଁ ହେଁୟ ବଲେଛିଲେନ, ଜ୍ଞାନୀନ ବା ଇଂଲିଡେର କୋନୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟେ ତୀର ମତୋ କୋନୋ ଛାତ୍ର ଖୁଜେ ପାଉଯା ଯାବେ ନା ।



ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ୧୮୮୪ ମେ ବିଏ ପାଶ କରେନ । ତାର ଆଗେଇ ତୀର ମଧ୍ୟେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇ । ତିନି କେବଳ ଈଶ୍ଵର ସମ୍ପର୍କେ ଚିନ୍ତା କରେନ । ଈଶ୍ଵର କି ଆହେ? ତୀକେ କି ଦେଖା ଯାଯା? ଏ ଧରନେର ପ୍ରଶ୍ନ ତୀର ମନକେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ । ତିନି ଅନେକକେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରେଛେ । କିନ୍ତୁ କାଠୋ ଉତ୍ତର ତୀର ମନ୍ତପୁତ୍ର ହୟାନି । ଏମନ ସମୟ ଏକଦିନ ତୀର ଦେଖା ହସି କାଳୀର ସାଧକ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣର ସଙ୍ଗେ । ରାମକୃଷ୍ଣ ତଥା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀବାତିତେ ଥାକେନ । ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏକଦିନ ଚଲେ ଯାନ ସେବାନେ । ରାମକୃଷ୍ଣକେ ତିନି ସରାସରି ଜିଜ୍ଞେସ କରେନ, ‘ଆପଣି କି ଈଶ୍ଵର ଦେଖେଛେ?’ ରାମକୃଷ୍ଣ ହାସତେ ହାସତେ ବଲେନ, ‘ହଁ, ଦେଖେଛି; ସେମନ ତୋକେ ଦେଖେଛି । ଚାଇଲେ ତୋକେଓ ଦେଖାତେ ପାରି ।’

ଏହି ସାଦାଶିଥେ ସାଧକ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣକେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥେର ଭାଲୋ ଲାଗେ । ତୀର ପ୍ରତି ଏକଟା ଭକ୍ତିର ଭାବ ଜେଗେ ଓଠେ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥକେ ପେଇୟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁଶି ହନ । ତିନି ସେମ ଏତଦିନ ତୀରଇ ଅପେକ୍ଷାର ଛିଲେନ । ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନିୟମିତ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରାଯାତ ଶୁରୁ କରେନ । ଏକ ସମୟ ତିନି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣର ନିକଟ ତ୍ୟାଗେର ଘରେ ଦୀଙ୍କା ଲେନ । ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ହନ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ସମ୍ମାନୀ । ତଥାନ ତୀର ନାମ ହୟ ବିବେକାନନ୍ଦ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ଭକ୍ତରା ତୀକେ ଶାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଶାମୀଜୀ ବଲେଇ ଡାକତେନ ।

বিবেকানন্দ গৃহত্যাগ করে সারা ভারতবর্ষ ঘূরলেন। নিজের চোখে ভারতবাসীর দুরবস্থা দেখলেন। কীভাবে এ থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করা যায়, সে-কথাও চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর এক সময় কন্যাকুমারীকায় ভারতের শেষ শিলাধণে বসে তিনি ধ্যানস্থ হলেন। ঐ শিলাধণের নাম এখন ‘বিবেকানন্দ শিলা।’ ধ্যানের মাধ্যমে তিনি বুঝতে পারলেন, ভারতের জীবনীশক্তির উৎস হচ্ছে ধর্ম। এই ধর্ম হচ্ছে দেবতাঙ্গানে মানবসেবা। এই ধর্মমন্ত্রে ভারতবাসীদের জাগিয়ে তুলতে হবে। তিনি আরো বুঝতে পারলেন, বৈরাগ্য ও সেবাধর্ম হচ্ছে ভারতীয়দের জাতীয় আদর্শ এবং এ পথেই তাদের জাতীয় শক্তিকে পরিচালিত করতে হবে। তবেই ভারতের উন্নতি হবে।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকা যান এবং শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ‘হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে। সব ধর্মেরই লক্ষ্য এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক—ঈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরম্পরার ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমগ্র ও শান্তি।’ তিনি আরো বলেন, ‘খ্রিষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না; অথবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রিষ্টান হতে হবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করবে এবং নিজস্ব বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজ প্রকৃতি অনুসারে বিকাশলাভ করবে।’ বিবেকানন্দের এই বক্তৃতায় সবাই মুক্ত হন। ধর্মসভার বিচারে তিনি হন শ্রেষ্ঠ বক্তা। আমেরিকার ‘নিউইয়র্ক হেরার্ড’ পত্রিকা মন্তব্য করে, ‘স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনবার পর মনে হবে ভারতের মত জ্ঞানেশ্বর্যমণ্ডিত দেশে আমাদের দেশের ধর্মপ্রচারক পাঠানো নির্বুদ্ধিতার কাজ।’

ধর্মসভায় বক্তৃতার পর সারা আমেরিকায় বিবেকানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসে বক্তৃতার জন্য। তিনিও হিন্দু ধর্ম-দর্শন, বিশেষত বেদান্ত দর্শন ও মানবধর্ম সম্পর্কে একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকা জয় করেন। সেখানকার সংবাদপত্রগুলিতে তাঁকে ‘সাইক্লোনিক হিন্দু’ নামে অভিহিত করা হয়। বিবেকানন্দ তাঁর মতাদর্শ প্রচারের জন্য নিউইয়র্কে ‘বেদান্ত সমিতি’ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি যান ইউরোপ। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে একের পর এক বক্তৃতা দেন। তিনি বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত সত্য তুলে ধরেন। বেদান্তের মূল কথা হলো—‘জীব ও ব্রহ্মে কোনো পার্থক্য নেই; জীবই ব্রহ্ম।’ তাই ব্রহ্মজ্ঞানে জীবসেবা করতে হবে। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে এ সত্যও প্রতিষ্ঠিত করেন যে, হিন্দুধর্ম কেবল মূর্তির পূজা করে না, সকল দেবতার পূজার মধ্য দিয়ে এক ঈশ্বরেরই আরাধনা করে। তাঁর বক্তৃতা থেকে পাক্ষাত্যের মানুষ হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে নতুন করে জানতে পারেন। অনেকে তাঁর পরম ভক্ত হয়ে যান। তাঁদের মধ্যে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিবেকানন্দের আদর্শে এতটাই উন্মুক্ত হন যে, নিজের জন্মভূমি আয়ার্ল্যান্ড ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। বিবেকানন্দের কাছে তিনি দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় ভগিনী নিবেদিতা।

প্রায় চার বছর পর বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। দেশের মানুষ তাঁকে বিশাল সম্র্দ্ধনা দেয়। তার উত্তরে তিনি সবাইকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে বলেন। সমস্ত কুসংস্কার পরিত্যাগ করতে বলেন। সবাইকে বিভেদ ভূলে এক হতে বলেন। তিনি বলেন, ‘শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও

କାପୁରୁଷତାଇ ପାପ । ସ୍ଵାଧୀତାଇ ଧର୍ମ, ପରାଧୀନତାଇ ପାପ । ପରୋପକାରଇ ଧର୍ମ, ପରପୀଡ଼ନଇ ପାପ । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଈଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ – ଏ-ଦୁଟି ଜିନିସଇ ଉଲ୍ଲତି ଲାଭେର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ।

ବିବେକାନନ୍ଦ ବଲତେନ, ସତ୍ୟଇ ସକଳ ଧର୍ମର ଭିତ୍ତି । ସଂ ହୁଯା ଆର ସଂ କର୍ମ କରା ଧର୍ମର ଅଙ୍ଗ । ତିନି ଅଥର୍ବବେଦେର ଉଲ୍ଲତି ଦିଯେ ବଲେଛେ, ‘ଅସତ୍ୟ ନୟ, ସତ୍ୟେରଇ ଜୟ ହୟ; ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଦିଯେଇ ଈଶ୍ୱର ଲାଭେର ପଥ ପ୍ରସାରିତ ହୟ ।’ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତେର ଜନ୍ୟ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ‘ଆମିକେ’ ତ୍ୟାଗ କରତେ ପାରେ, ସେ ଦେଖେ ସମ୍ମତ ଜଗଂ ତାର । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଏବଂ ସାହସୀ, ସେଇ ସବ କିଛୁ କରତେ ପାରେ ।

ବିବେକାନନ୍ଦେର କାହେ କୋନୋ ଜାତିଭେଦ ଛିଲ ନା । ତିନି ବଲତେନ – ନୀଚ ଜାତି, ମୂର୍ଖ, ଦାରିଦ୍ର, ଅଞ୍ଜ, ମୁଢି, ମେଥର ସକଳେଇ ଆମାଦେର ଭାଇ । ଏଦେର ସେବାଇ ପରମ ଧର୍ମ । ତୀର ଏହି ଆଦର୍ଶେ ଉତ୍ସୁଦ୍ଧ ହେଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେରାପୀଡ଼ିତ ଚଞ୍ଚଳଦେର ପାଶେ ବସେ ତାଦେର ସେବା କରେଛେ । ବିବେକାନନ୍ଦେର ମୃତ୍ୟୁର ଦଶ ବହୁ ପରେ ସୁଭାଷଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ ତୀର ରଚନାବଳି ପଡ଼େ ଅନୁଭବ କରତେ ପାରେନ ଯେ, ମାନବସେବାଇ ହଚେ ମୁକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ପଥ । ତାଇ ନିଃସ୍ଵାର୍ଥ ସେବାକେଇ ତିନି ତୀର ଜୀବନେର ମୂଳମତ୍ତ୍ଵ କରେନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ‘ନେତାଜି’ ଭୂଷଣେ ଭୂଷିତ ହନ ।

ବିବେକାନନ୍ଦ ନାରୀ-ସ୍ଵାଧୀନତାଯ ବିଶ୍ୱାସୀ ଛିଲେନ । ନାରୀଶିକ୍ଷାକେ ତିନି ସର୍ବାଙ୍ଗକରଣେ ସମର୍ଥନ କରତେନ । ବୈଦିକ ଯୁଗେର ମୈତ୍ରୀ, ଗାର୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖ ବିଦୁଷୀ ନାରୀର ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ତିନି ବଲେଛେ – ସେଇ ଯୁଗେ ନାରୀରା ଯଦି ଏତ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରତେ ପାରେ, ତାହଲେ ଏଯୁଗେର ନାରୀରା ପାରବେ ନା କେନ୍? ତୀର ଘରେ ଯେ-ଜାତି ନାରୀଦେର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନା, ସେ-ଜାତି କଥନୋ ବଡ଼ ହତେ ପାରେ ନା । ‘ନାରୀଦେର ଅବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲତି ନା କରେ ବିଶ୍ୱେର ମଙ୍ଗଳସାଧନ କରା ସମ୍ଭବ ନୟ । କୋନ ପାରି ଏକଟି ଡାନା ନିଯେ ଉଡ଼ିତେ ପାରେ ନା ।’ ଏମନକି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନାୟ ନାରୀରା ଯାତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଏବଂ ଏଗିଯେ ଆସେ ତାର ଜନ୍ୟ ତିନି ସାରଦାଦେବୀର ପରିଚାଳନାୟ ନାରୀଦେର ଜନ୍ୟ ଏକଟି ଗଠ ପ୍ରତିଠାରୀ ପରିକଳ୍ପନା କରେଛିଲେନ ।

ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଶେର ଉଲ୍ଲତିର ଜନ୍ୟ ସମାଜ ସଂକ୍ଷାରେର କଥାଓ ଭାବତେନ । ତିନି ବଲତେନ – ଦେଶେର ଉଲ୍ଲତି କରତେ ହଲେ ସବ ଭୂରେର ମାନୁଷେର ଉତ୍ସୁକ ପ୍ରୟୋଜନ । ତିନି ସମାଜେର ନୀଚ ଭୂରେର ମାନୁଷଦେର ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ ଭୂରେର ମାନୁଷେର ଅତ୍ୟାଚାରେର ପ୍ରତିବାଦ କରେଛେ । ସାରା ଦେଶ ଘୁରେ ତିନି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣିର ମାନୁଷେର ଅବସ୍ଥା ଦେଖେଛେ । ତାଦେର ପ୍ରାଣଶ୍ରମ କରାର କ୍ଷମତା ଦେଖେ ତିନି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଧାଗୀ କରେଛେ ଯେ, ଏକ ସମୟ ଏହାଇ ଭାରତବର୍ଷ ଶାସନ କରବେନ । ତାଇ ତିନି ବଲେଛେ, ‘... ନୂତନ ଭାରତ ବେଳକ । ବେଳକ ଲାଙ୍ଗଳ ଧରେ, ଚାଷାର କୁଟିର ଭେଦ କରେ, ଜେଲେ ମାଳା ମୁଢି ମେଥରେର ଝୁପଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ହତେ । ବେଳକ ମୁଦିର ଦୋକାନ ଥେକେ, ଭୁନାଓୟାଲାର ଉନୁନେର ପାଶ ଥେକେ । ବେଳକ କାରଖାନା ଥେକେ, ହାଟ ଥେକେ, ବାଜାର ଥେକେ । ବେଳକ ବୋପ ଜଙ୍ଗଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଥେକେ ।’

ବିବେକାନନ୍ଦ ଅନ୍ତର ଦିଯେ ଅନୁଭବ କରତେ ପେରେଛିଲେନ ଯେ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ କୋନୋ ଜାତିର ଉତ୍ସୁକ ସମ୍ଭବ ନୟ ।  
୧୫ ତାଇ ତିନି ବଲତେନ – ଦେଶେର ଜନଗଣକେ ଶିକ୍ଷିତ କରେ ତୁଳତେ ହବେ, ତବେଇ ଏକଟି ଉଲ୍ଲତ ଜାତି ଗଢ଼ ତୋଳା

সম্ভব হবে। শিক্ষার ব্যাপারে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সবাই যাতে সমান শিক্ষা পায়। তাই তিনি বলতেন—  
ত্রাঙ্কণের ছেলের যদি একজন শিক্ষকের দরকার হয়, তাহলে শুন্দের ছেলের দুজন বা তার চেয়ে বেশি  
শিক্ষকের প্রয়োজন। তিনি চাইতেন— ত্রাঙ্কণ ত্রাঙ্কণই থাকুক, তবে ত্রাঙ্কণ যেন চেষ্টা করেন শুন্দকেও তাঁর  
নিজের পর্যায়ে তুলে আনতে। নিজে মানুষ হওয়া এবং অন্যকেও প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করা— এটিই  
হওয়া উচিত মানব জীবনের উদ্দেশ্য।

সমাজের দরিদ্রদের মধ্যে শিক্ষা বিভাবের জন্য বিবেকানন্দ অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।  
তিনি তাঁর অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন— দরিদ্ররা যদি স্কুলে না আসতে পারে তাহলে শিক্ষাকেই  
তাদের কাছে পৌছে দিতে হবে, কলে-কারখানায়, ক্ষেত্র-থামারে যেখানে তারা কাজ করে সেখানে। তিনি  
আরো বলেছেন, ‘সামর্থ্য না থাকলে একটি কুঁড়ে ঘর বানাও। সেখানে গরিব লোকেরা সাহায্য নিতে ও  
উপাসনা করতে আসবে। সেই মন্দিরে সকাল-সন্ধ্যা ধর্মকথা ও পুরাণকথা পাঠ হবে। এর মধ্য দিয়ে তাদের  
শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিক্ষা দেবে।’

স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন যে, খালি পেটে ধর্ম হয় না। তাই তিনি বলেছেন, ‘অন্ন চাই! অন্ন চাই! দরিদ্রের  
মুখে অন্ন জোগাতে হবে। আগে অন্ন, তারপর ধর্ম। যারা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে তাদের আমরা ধর্মোপদেশ  
শুনিয়ে যাচ্ছি। ধর্মত্বাদে কি পেট ভরে? সব কিছুরই প্রথম অংশ পাবে দরিদ্র। আমাদের অধিকার  
শুধু অবশিষ্টাংশে। দরিদ্ররা ঈশ্বরের প্রতিভূত; যেই লাজ্জনা ভোগ করে সেই ঈশ্বরের প্রতিভূত। দরিদ্রকে না  
দিয়ে যে আহারে আনন্দ পায় সে পাপে আনন্দ পায়।’

১৮৯৭ সনে বাংলার কোথাও কোথাও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। বিবেকানন্দ তাঁর অনুসারীদের নিয়ে  
দুর্ভিক্ষপীড়িতদের পাশেও দাঁড়িয়েছিলেন। আলমোড়া থেকে তগিনী নিবেদিতাকে এক পত্রে তিনি লিখেছেন,  
'আমি আমার কিছু ছেলেকে দুর্ভিক্ষপীড়িত জেলাগুলিতে কাজ করার জন্য পাঠিয়েছি। এটা ইন্দ্রজালের মত  
কাজ করছে। আমি যা ভেবেছিলাম তাই দেখছি। দেখছি একমাত্র হৃদয়ের মধ্য দিয়ে জগতের কাছে পৌছানো  
যায়।'

বিবেকানন্দ সতীদাহ প্রথা বিলোপের জন্য রাজা রামমোহন রায়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।  
বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য বিদ্যাসাগরকে মহাবীর বলে আখ্যায়িত করেন। তবে বিধবাদের পুনর্বিবাহের  
পাশাপাশি তাদের যথাযথ শিক্ষা দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার কথাও বলেন। বাল্যবিবাহকে তিনি ঘৃণা  
করতেন। তিনি বলেছেন, ‘বাল্যবিবাহে মেয়েরা অকালে সন্তান প্রসব করে অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়,  
তাদের সন্তানসন্ততি ক্ষীণজীবী হয়ে দেশে ভিধারির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ... লেখাপড়া শিখিয়ে একটু বয়স  
হলে বে দিলে সেই মেয়েদের যে সন্তানসন্ততি জন্মাবে, তাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ হবে।’ শুধু তা-ই  
নয়, তিনি বলেছেন, ‘ইচ্ছা না থাকলে বিবাহ না করার স্বাধীনতা সকল জীলোকের সাভাবিক অধিকার  
বলে গণ্য হওয়া উচিত।’

এভাবে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি সমাজ সংস্কার এবং দেশের উন্নয়নের কথাও ভেবেছেন। তিনি অন্য সন্ন্যাসীদের মতো কেবল ঈশ্বর-সাধনা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন নি। তাঁর শুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এমনটাই চেয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ তাঁর শুরুদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য ১৮৯৭ সনে ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বছর একটি মঠও প্রতিষ্ঠা করেন। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্তো জেলার বেলুড়ে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে এটি অবস্থিত। সাধারণভাবে এটি ‘বেলুড় মঠ’ নামে পরিচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা রয়েছে। এসবের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ। বাংলাদেশে যেসব মঠ ও মিশন রয়েছে, সেসবের প্রধান কেন্দ্র ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন। পৃথিবী ব্যাপী এই মঠ ও মিশনের মাধ্যমে ধর্ম চর্চার পাশাপাশি অসংখ্য মানুষকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, চিকিৎসা, আপত্তিকালীন সাহায্য প্রদান ইত্যাদি।

বিবেকানন্দের বিপুল অধ্যাত্মিক ও কর্মব্রতের মধ্য দিয়ে ভারতের আত্মা সেদিন জেগে উঠেছিল। দেশের ধর্মস্ক্ষেত্রে ও সমাজজীবনে জেগেছিল এক নতুন প্রাণস্পন্দন। আত্মবিস্মৃত জাতি সেদিন দেশের সনাতন ধর্মজীবন থেকে প্রাণরস আহরণে প্রবৃত্ত হয়ে উঠেছিল। ভারতের অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধ জাতীয় জীবনে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বিবেকানন্দ ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। কাজ ছাড়া তিনি কিছুই বুবতেন না। তাই বিশ্রামের অভাবে অল্পদিনেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। ফলে ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জুলাই বেলুড় মঠে এই মহামনীষী দেহ ত্যাগ করেন।

#### বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণী

- ১। ধর্ম এমন একটি ভাব যা পশ্চকে মানুষে এবং মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।
- ২। ওঠ, জাগো, আর ঘুমিয়ো না; সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজেদের ভেতর রয়েছে – এ- কথা বিশ্বাস কর, তাহলেই শক্তি জেগে উঠবে।
- ৩। অপরকে ভালোবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ।
- ৪। যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারা যায়, সে-ই হচ্ছে শিক্ষা।
- ৫। হৃদয় ও মস্তিষ্ক দ্বারাই চিরকাল যা কিছু বড় কাজ হয়েছে, টাকার দ্বারা নয়।
- ৬। ভেবো না তোমরা দরিদ্র, ভেবো না তোমরা বন্ধুহীন; কে কোথায় দেখেছে – টাকায় মানুষ করেছে! মানুষই চিরকাল টাকা করে থাকে। জগতের যা কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হয়েছে, উৎসাহের শক্তিতে হয়েছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হয়েছে। প্রাচীন ধর্ম বলত, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে সে নাস্তিক। নতুন ধর্ম বলছে, যে আপনাতে বিশ্বাস না করে সে-ই নাস্তিক।
- ৭। বিশ্বাসই হলো মানবসমাজ ও সব ধর্মের সবচেয়ে বড় শক্তি।
- ৮। জীবসেবার চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই। ‘জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।’

বিবেকানন্দের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, পৃথিবীর সকল মানুষ এক জাতি। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। ধর্ম তাদের পৃথক পৃথক হতে পারে। তবে সব ধর্মেরই ভিত্তি এক এবং তা হলো সত্য। সত্যই ধর্ম। জীবসেবা মানেই ঈশ্বরসেবা। মানুষকে ধর্মের কথা বলার আগে তার দারিদ্র্য দূর করতে হবে। কারণ ধালি গেটে কেউ ধর্মের কথা জ্ঞানতে চায় না। ধনী-দরিদ্র, যুচি-মেখেরে কোনো পার্থক্য নেই। সবাই ভাই-ভাই। কোনো মানুষই অস্পৃশ্য নয়, পেশা তার যা-ই হোক। নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র সকলকেই শিক্ষিত করে তুলতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত জাগতিক বা পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরে বিশ্বাস উন্নতির প্রথম শর্ত।

বিবেকানন্দের এই শিক্ষা আমরা সর্বদা হৃদয়ে ধারণ করব। প্রতিটি কাজে-কর্মে এর প্রতিফলন ঘটাব। তাহলে আমরাও জীবনে সকল হতে পারব।

### পাঠ ১৫ ও ১৬ : শ্রীমা

১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ২১এ ফেব্রুয়ারি ক্রালের প্যারিস শহরে শ্রীমা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মীরা। ভারতের পঞ্জিচৌতে অরবিন্দ আশ্রমে এসে তাঁর নাম হয় শ্রীমা। ভঙ্গরা তাঁকে এ নামেই ডাকতেন। ভারতবাসীর কাছে তিনি এই নামেই পরিচিত।

শৈশবকাল থেকেই শ্রীমার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব জেগে উঠে। তাঁর বয়স ষাণ্ম মাত্র চার, তখনই তিনি মাঝে মাঝে ধ্যানমঞ্চ হয়ে পড়তেন। আর পাঁচজন শিশুর মতো শৈশবেই তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পড়াশোনার প্রতি  
 তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল  
 না। এতে তাঁর বাবা-মা  
 নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। শুধু  
 পড়াশোনা নয়, পার্থিব কোনো  
 কিছুর প্রতিই শ্রীমার কোনো  
 আসঙ্গ ছিল না। তিনি শুধু  
 ঈশ্বর চিন্তা করতেন।  
 আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনায় অঘ  
 থাকতেন।

প্যারিস শহরের বাইরে ছিল  
 এক প্রকাণ্ড বন। শ্রীমা সময়  
 পেলেই সেখানে গিয়ে  
 গাছতলায় ধ্যানে বসতেন।



তখন পাখিরা নির্ভয়ে এসে তাঁর শরীরে বসত। কাঠবিড়ালীরা ছুটোছুটি করত তাঁর ওপর দিয়ে। এমনিভাবে বনের গাছপালা ও পশুপাখির সঙ্গে তাঁর এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে।

মায়ের বয়স যখন উনিশ বছর, তখন তিনি আলজিরিয়ার ক্লেমসেন শহরে যান। সেখানে তেওঁও নামে এক বিখ্যাত শুণীন থাকতেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি হঠযোগ ও অনেক শুঙ্গবিদ্যা শিক্ষা করেন।

দেশে ফিরে শ্রীমা আরো গভীর সাধনায় মগ্ন হন। তিনি উপলক্ষ্মি করেন যে, ঈশ্বর আছেন। তাঁর সঙ্গে মানুষের আত্মিক মিলন সম্ভব। ঈশ্বরকে তিনি সব সময় জ্যোতির্ময়রূপে দেখতে চান। একবার তিনি এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি যেন তাঁকে বলছেন: ওঠ, আরো ওপরে ওঠ। সকলকে ছাড়িয়ে ওপরে ওঠ, কিন্তু সকলের মধ্যে ব্যাঞ্চ করে দাও নিজের আত্মাকে।

শ্রীমা এবার ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব পড়তে শুরু করেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, নিরাকার নির্গুণ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই রূপ পরিগ্রহ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব স্থান ভারতবর্ষে আসার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শ্বামী মিসিয়ে পল রিশারকে নিয়ে চলে আসেন ভারতবর্ষে। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা ২৯শে মার্চ পশ্চিমের অরবিন্দ আশ্রমে উপস্থিত হন। সেখানে ঋষি অরবিন্দকে দেখে শ্রীমার স্বপ্নে দেখা সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর মনে হলো, তিনি যেন বিধিনির্দিষ্ট এক বিশেষ দিব্যকর্ম করার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছেন এবং মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের সহযোগিতা ছাড়া তা সম্ভব নয়। তিনি উপলক্ষ্মি করলেন, অরবিন্দের সঙ্গে মিলিত হওয়ার মধ্যেই আছে তাঁর আত্মার মুক্তি। সারা পৃথিবীর মধ্যে পশ্চিমের আশ্রমকেই তাঁর কাছে স্বর্গ মনে হলো। এই শান্ত তপোবনের মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর সকল সাধনার সিদ্ধি, তাঁর আত্মার চূড়ান্ত সার্থকতা। তাই তাঁরা দুজনেই অশ্রমে থেকে গেলেন। শ্রীঅরবিন্দের নিকট দীক্ষা নিলেন। তাঁর সাধন কর্মের সহযোগী হয়ে উঠলেন। তখন আশ্রম থেকে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় ‘আর্য’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। তাঁরা দুজনেই এই পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে অরবিন্দকে সাহায্য করতে লাগলেন।

কিন্তু এ যাত্রায় শ্রীমা বেশিদিন ভারতে থাকতে পারেন নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই তাঁদের প্যারিসে ফিরে যেতে হলো। এতে মা-র মন খুব আকুল হয়ে উঠে। শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে বিচ্ছেদ তাঁর কাছে পরমাত্মা ও জীবাত্মার বিচ্ছেদের মতো মনে হতে লাগল। তিনি আকুল নয়নে পূর্ব দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

এভাবে কেটে গেল প্রায় পাঁচ বছর। ইতিমধ্যে যুদ্ধ থেমে গেছে। হঠাৎ অরবিন্দের কাছ থেকে তিনি আহ্বান পেলেন ভারতবর্ষে আসার। তাঁর মন উঠেল হয়ে উঠল। আর বিলম্ব নয়। তিনি যাত্রা করলেন ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৪এ এপ্রিল তিনি পশ্চিমের পৌছান। তাঁর মন শান্ত হলো। এবার শুরুদেবের নির্দেশমতো তিনি নিয়মিত যোগ সাধনা শুরু করে দিলেন। ইউরোপীয় বেশভূষা ভ্যাগ করে ভারতীয় যোগিনীর বেশ ধারণ করলেন। তাঁর পরনে তখন দেশী শাড়ি ও ব্লাউজ। খাদ্যব্র্যও দেশীয়।

আশিষের পরিবর্তে নিরামিষ । পরে অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে মা ইউরোপীয় পোশাকও পরতেন । কারণ অরবিন্দ বলতেন, ইন্দ্রিয় ও মনকে জয় করতে পারলে বাইরের পোশাক-পরিচ্ছদে কিছু যায়-আসে না ।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪এ নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণ সিঙ্গি লাভ করেন । সেদিন থেকেই একটি ঘরে তিনি নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেন । ফলে আশ্রমের সমস্ত ভার পড়ে শ্রীমার ওপর । শ্রীমাও সর্বান্তকরণে সে ভার গ্রহণ করেন । তিনি পৈতৃক সুত্রে অনেক সম্পদ ও অর্থ পেয়েছিলেন । তা দিয়ে তিনি আশ্রমের খরচ চালাতে লাগলেন । দিনদিন আশ্রমে লোকজন বাড়তে লাগল । শ্রীমাও অতিশয় যোগ্যতার সঙ্গে সকলের ভরণ-পোষণ করে যেতে লাগলেন । কর্মফলের প্রতি সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করে তিনি পরের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যেতে লাগলেন । খাদ্য, কৃষি, শিল্প, গো-পালন প্রভৃতি বিভাগ খুলে শ্রীমা আশ্রমটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুললেন ।

শ্রীমা বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধ্যাত্মিক সাধনা করতে হলে শরীরকে সুস্থ রাখতে হয় । এজন্য যোগব্যায়াম প্রয়োজন । তাই আশ্রমে তিনি একটি ব্যায়ামাগার গড়ে তোলেন ।

শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রীমা আশ্রমে একটি ছোট পাঠশালা খোলেন । সেখানে ছেলে-মেয়েরা মনের অনন্দে লেখাপড়া করত । ক্রমে পাঠশালা থেকে বিদ্যালয় ও পরে তা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় । তার নাম হয় ‘আন্তর্জ্ঞাতিক শিল্পকেন্দ্র’ । এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেয়া হয় । তবে সবাইকে আধ্যাত্মিক ভাবে সমৃদ্ধ করে তোলা হয় । শ্রীমা এখানে ধর্ম ও কলাবিদ্যার এক সার্থক সমষ্টয় সাধন করেছিলেন । এখানে বিশ্বের যে-কোনো শিক্ষার্থী পড়াশোনা করতে পারে ।

আশ্রমবাসীদের চিকিৎসার জন্য শ্রীমা একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন । এ হাসপাতালে সকলকে বিমানে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয় ।

আশ্রমে যাঁরা থাকেন, তাঁদের থাকা-থাওয়ার সমস্ত ব্যায়ভার আশ্রমই বহন করে । আশ্রমের নিজস্ব জমি, বাগান ও দুর্ঘ খামার আছে । সেসব থেকে চাল, ফলমূল, দুধ ইত্যাদি পাওয়া যায় । অর্থাৎ শ্রীমা সত্যিকার অর্থেই আশ্রমটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন ।

আশ্রমের একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হলো সমস্তরকম ভেদভানের বিলোপ । আশ্রমে যাঁরা থাকেন তাঁদের সকলকেই কাজ করতে হয় । ছোট-বড় কাজে কোনো পার্থক্য নেই । যে-কেউ যে-কোনো কাজ করেন । ধর্মীয় গৌড়ামি বলতে কিছু নেই । মা চাইতেন আশ্রমবাসীরা ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে সকল ধর্ম সম্পর্কে উদার ও শ্রদ্ধাশীল হোক । বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এই শিক্ষা নিয়ে আশ্রমের আদর্শ সর্বত্র ছড়িয়ে দিক ।

আশ্রমের সকলকে মা সন্তানের ন্যায় ভালোবাসতেন । নিজের মায়ের মতোই তিনি সকলের সুখ-সুবিধার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন । শুধু তা-ই নয়, আশ্রমের বৃক্ষ-লতা ও পশু-পাখির প্রতিও মায়ের গভীর ভালোবাসা ছিল । আশ্রমে নতুন অতিথি এলে মা তাদের বুবিয়ে দিতেন, কেউ যেন এদের প্রতি অসমান না করেন । কেউ যেন গাছের পাতা বা ফুল না ছেঁড়েন । অকারণে গাছের ডাল না ভাঙ্গেন ।

ମା ସବ ସମୟ କାଜ ନିଯେ ଥାକତେ ଭାଲୋବାସତେନ । ଦିନରାତ ଶୁଦ୍ଧ କାଜ ଆର କାଜ । କାଜଇ ଯେଣ ଛିଲ ତାର ଜୀବନ । ଆଜୀବନ ତିନି କାମନାହୀନ କର୍ମଯଜ୍ଞ କରେ ଗେଛେନ ।

ମା ଶୁଦ୍ଧ ଏକଜଳ ଜ୍ଞାନତପଶିଳୀ ବା କୁଳ ଯୋଗିନୀଇ ଛିଲେନ ନା । ତାର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଚ୍ଛେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧି ଛିଲ । ଏକ ନିବିଡ଼ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧିର ଦ୍ୱାରା ତିନି ବହିଷ୍ପର୍କତି ଓ ଅନ୍ତଃପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟେ ଚମଞ୍କାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସାଧନ କରେ ଚଲତେନ । ତିନି ଚାଇତେନ ମାନୁମେର ଅନ୍ତଃପ୍ରକୃତିଓ ଏମନି ବାଇରେ ପ୍ରକୃତିର ମତୋ ସୁନ୍ଦର ହୁଯେ ଉଠୁକ । ଏଭାବେ ତିନି ଆଶ୍ରମଟିକେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ୟର ଏକ ଶୀଳାଭୂମିକାପେ ଗଡ଼େ ତୁଳେଛିଲେନ ।

ମାଯେର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିକଲ୍ପନା ଛିଲ ଶ୍ରୀଅରବିଦ୍ଦେର ନାମେ ଅରୋଭିଲ ନଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା । ୧୯୫୪ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେ ତିନି ଏ ପରିକଲ୍ପନା କରେଛିଲେନ । ଏର ଜନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତେରୀର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିକେ ଥାଇ ହୁଏ ମାଇଲ ଦୂରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳେ ୧୫ ବର୍ଗମାଇଲ ଭୂମି ସଂଗ୍ରହ କରା ହୁଯ । ୧୯୬୮ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେର ୨୮୬ ଫେବ୍ରୁଆରି ଏର ଭିତ୍ତିଶାପନ କରା ହୁଯ । ଭିତ୍ତିମୂଳେ ପୃଥିବୀର ୧୨୬୩ ଦେଶେର ମାଟି ଏନେ ଜଡ଼ କରା ହୁଯ । ଐସବ ଦେଶେର ତରଣ-ତରଣୀରା ଏ ମାଟି ନିଯେ ଆସେନ । ୧୯୭୨ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେର ୨୧୩୬ ଫେବ୍ରୁଆରି ମାଯେର ଶୁଭ ଜାମାଦିନେ ଏର ନିର୍ମାଣ କାଜ ଶୁରୁ ହୁଯ ।

ମାଯେର ପରିକଲ୍ପନା ଛିଲ, ଅରୋଭିଲ ହବେ ଏକଟି ଆଧୁନିକ ନଗର । ଏଥାନେ ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚଶଶ ହାଜାର ଲୋକ ବାସ କରବେ । ସବାଇ ହବେ ଏକ ପରିବାରେର ସଦୟ । ଏଥାନେ ଆଧୁନିକ ନଗରେର ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ-ସୁବିଧା ଥାକବେ । ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ-ବିଜ୍ଞାନ, ଶିଳ୍ପକଳା, ଦର୍ଶନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ସବ କିଛିର ଚର୍ଚା ହବେ ଏଥାନେ । ଅରୋଭିଲ ହବେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱମାନବେର । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନ୍ୟ-ଏକ୍ୟେର ଜୀବନ୍ତ ଲ୍ୟାବରେଟରି । ଏହି ହବେ ଏକଟି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଜନପଦ । ଏଥାନକାର ସକଳେଇ ହବେ ଏର ଜୀବନ୍ୟାତ୍ମା ଓ ଉତ୍ସତିର ଅଂଶୀଦାର । ତାରାଇ ନାନାଭାବେ ଏର ସକଳ କାଜ କରବେ । କାଉକେ ଖାଜନା ଦିତେ ହବେ ନା । କାଉକେ ଖାବାର ଭାବନା ଭାବତେ କବେ ନା । ସକଳକେ ଖାଓୟାବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରବେ । ସକଳ ଦେଶେରଇ ଆଚାର-ବ୍ୟବହାର ଓ ଖାଦ୍ୟରୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣି ବଜାୟ ରାଖା ହବେ । ଅରୋଭିଲ ହବେ ସକଳ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସେର ଉତ୍ତର୍ବେ ଉଠେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟର ସେବା ।

ମାଯେର ଏହି ପରିକଲ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ଅରୋଭିଲ ନଗର ସିତିଇ ଗଡ଼େ ଉଠେଇଛେ । ୨୦୦୬ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେ ଏର ନିର୍ମାଣ କାଜ ଶେଷ ହୁଯେଛେ । ସେଥାନକାର ଅଧିବାସୀରୀ ମାଯେର ଆଦର୍ଶକେ ଶିରୋଧାର୍ୟ କରେ ସମ୍ପ୍ରୀତିର ସଙ୍ଗେ ବସବାସ କରଛେନ ।

ଶ୍ରୀମା ସୁନ୍ଦର ଛବି ଆଁକତେ ପାରତେନ । ଗାନ୍ଧୀ ଜାନତେନ । ଭାଲୋ ଅର୍ଗାନ ବାଜାତେ ପାରତେନ । ପ୍ରତି ବହରେର ଶେଷ ଦିନ ରାତ ବାରୋଟାର ପର ତିନି ଅର୍ଗାନ ବାଜିଯେ ନତୁନ ବହରକେ ଘାଗତ ଜାନାତେନ । ବିଭିନ୍ନ ରଚନାଯ ତାର ସାହିତ୍ୟ-ପ୍ରତିଭା ଓ କବିତ୍ୱ-ଭିତରେ ପରିଚୟ ପାଓଯା ଯାଯ ।

ମାଯେର ଅବ୍ୟାକ୍ଷମ ପଣ୍ଡିତେରୀର ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ସାରା ଭାରତେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ହୁଏ ହିସେବେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରେ । ଏର ଆଦର୍ଶ ଭାରତବର୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ହାଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଗଡ଼େ ଉଠେ । ବାଂଗାଦେଶେ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ରଥେଇ । ଏହି ଆଶ୍ରମେ ଆଦର୍ଶ ଭାରତବାସୀଦେର ଜୀବନେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଫେଲେଛେ ।

୧୯୭୩ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେର ୧୭୫ ନଭେମ୍ବର ପଣ୍ଡିତେରୀର ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମେ ଏହି ମହୀୟସୀ ନାରୀର ଜୀବନାବସାନ ଘଟେ ।

ଶ୍ରୀମାର ଜୀବନାଦର୍ଶ ଥେକେ ଆମରା ଯେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ତା ହଲୋ: ସ୍ୟାଙ୍କଜୀବନେ ପରିତ୍ରାତା, ଦୈଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସେବାକେ ଜୀବନେର ବ୍ରତ ହିସେବେ ଗ୍ରହଣ କରା । ସାମହିକଭାବେ ନୈତିକ ଉତ୍ସତି ଓ ମନ୍ଦିର ସାଧନ କରା ।

### অনুশীলনী

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :**

১। ভগবানের পূর্ণাবতার কে ?

- |           |              |
|-----------|--------------|
| ক. মৎস্য  | খ. বরাহ      |
| গ. নৃসিংহ | ঘ. শ্রীকৃষ্ণ |

২। চন্দক সংহিতা কয়টি ভাগে বিভক্ত ?

- |         |        |
|---------|--------|
| ক. পাঁচ | খ. ছয় |
| গ. সাত  | ঘ. আট  |

৩। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে অবতরণের কারণ হচ্ছে -

- i. ধর্মকে সংস্থাপন
- ii. দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন
- iii. সজ্জনদের বিনাশ

**নিচের কোনটি সঠিক ?**

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. i ও ii      |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪। 'আ শুরুজন, ব্রহ্মময়ী-স্বরূপা'- এটি কার বাণী ?

- |                |               |
|----------------|---------------|
| ক. শঙ্করাচার্য | খ. বিজয়কৃষ্ণ |
| গ. নৃসিংহ      | ঘ. বিবেকানন্দ |

৫। লোকনাথ বাবার নির্দেশে বিজয়কৃষ্ণ গোপালী কোথায় আশ্রম স্থাপন করেন ?

- |         |           |
|---------|-----------|
| ক. ঢাকা | খ. বরিশাল |
| গ. যশোর | ঘ. খুলনা  |

৬। আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে কাকে 'সাইক্লোনিক হিন্দু' নামে অভিহিত করা হয় ?

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| ক. প্রতু নিত্যানন্দ | খ. স্মার্তি বিবেকানন্দ |
| গ. শ্রীরামকৃষ্ণ     | ঘ. শ্রীঅরবিন্দ         |

### সংজ্ঞনশীল প্রশ্ন :

- ১। তমা লেখাপড়ার পাশাপাশি প্রতিদিন সকালে বাড়ির উঠানের একপাশে পাখিদের জন্য খাবার দিয়ে রাখে। পাখিরাও নিয়মিত এসে খেয়ে যায়। এতে সে পরম আনন্দ লাভ করে। হঠাৎ তমার বাবা তমার লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করলে তমা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। অবশ্যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের হস্তক্ষেপে তমার অধিকার রক্ষা পায়।  
 ক. বিবেকানন্দ ‘বেদান্ত সমিতি’ নামে একটি সংগঠন কোথায় স্থাপন করেন?  
 খ. শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিবেকানন্দের ভক্তিভাব গড়ে উঠার কারণ ব্যাখ্যা কর।  
 গ. অনুচ্ছেদে তমার পাখিপ্রীতি স্বামী বিবেকানন্দের কোন মতাদর্শের অন্তর্ভুক্ত? তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. স্বামী বিবেকানন্দের কোন আদর্শ তমার শিক্ষকের চরিত্রে এবং কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে তা মূল্যায়ন কর।
- ২। ধর্মবিষয়ক শিক্ষক দীনেশচন্দ্র নবম শ্রেণিতে আদর্শ জীবনচরিত অধ্যায়ের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে এমন একজনের কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন, যিনি ইউরোপীয় বেশভূষা ত্যাগ করে একজন জ্ঞান তপস্বীর বেশ ধারণ করেন এবং একটি আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আশ্রমাটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠে। এমনকি তার সৌন্দর্যবোধ ও অভাবনীয় পরিকল্পনায় একটি নগরও গড়ে উঠে।  
 ক. শ্রীবিজয় কৃষ্ণের পিতার নাম কী?  
 খ. বিজয়কৃষ্ণ কেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন?  
 গ. অনুচ্ছেদে ধর্মীয় শিক্ষক যে সাধক-সাধিকার কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন তাঁর সাধনজীবন তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. নগর প্রতিষ্ঠায় উক্ত সাধক-সাধিকার অবদান মূল্যায়ন কর।

### সমাপ্ত

২০১৮  
শিক্ষাবর্ষ  
৯-১০ হিন্দুধর্ম

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ  
-শ্রী রামকৃষ্ণ

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে  
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে  
১০৯ নম্বর-এ (টেল ফ্রি, ২৪ ঘটা সার্ভিস) ফোন করুন



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য